S. O. S.

By

Agatha Christie

Bengali Version

Nirmal Kanti Ghosh

প্রথম প্রকাশ ঃ

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬৬

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ

প্রদোষকান্তি বর্মন

প্রগতি প্রকাশনী ২৮-এ, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯ শ্রীমতী আলোরানী পাত্র কর্তৃক প্রকাশিত ও জয়তারা হইতে মুদ্রিত।

এক

ডিনসমেডকে ক'দিন ধরেই একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে। সে কি করবে ভেবে চলেছে। ভেবে যেন সঠিক পথের সন্ধান পাচ্ছে না। ফলে সে মনের মধ্যে একটা চাপা অস্বস্তি বোধ করছে।

ডিনসমেড ভাবছে, ক'দিনের মধ্যেই একটা সিদ্ধান্তে আসা উচিত। এ ভাবে ঠিক ভালো লাগে না। অথচ আগে ভাগে কথাটা আবার সুশানকে বলতে চায় না। তবে সে ব্যাপারটা স্থির ক'রেই তবে স্ত্রীকে জানাবে।

বেশ চিন্তা নিয়েই ডিনসমেড বাড়ি ফিরলো। তবে এর মধ্যে যে এক রাশ দুচিন্তা, যা রাতের ঘুম বা মেজাজ খারাপ করে দেবে তা নয়। তবুও এক ধরণের একটা মানসিকতায় সে ভুগছে।

ডিনসমেড যখন বাড়ি ফিরলো তখন প্রায় সাতটা বাজে। এমন কিছু রাত নয়। তবে ক'দিন ধরে একটু একটু করে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। অবশ্য শীতের প্রথম ঠাণ্ডা। বেশ উপাদেয়। শীতের শুরুটা সত্যি মনোরম। তারপর বাড়ি ফিরে যদি ফায়ার প্লেসের সামনে এক কাপ গরম কফি নিয়ে বসা যায় তাহলে তো কথাই নেই।

অন্যদিন অবশ্য এত তাড়াতাড়ি ডিনসমেড বাড়ি ফেরে না। তার ফিরতে একটু রাত হয়ে যায়। আটটা সাড়ে আটটা হয়ে তো যায়ই।

ডিনসমেড সিঁড়ি বেয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের কাছে এসে দাঁড়ায়। তার অ্যাপার্টমেন্টটা দোতলায়। বাড়িটা তিন তলা।

বাড়িটা খুব একটু পুরনো নয়। আবার নতুনও বলা চলে না। কম করে বাড়ির বয়স ত্রিশ বছর হবে।

ডিনসমেড এ অঞ্চলে আছেও অনেক বছর। তা কম করে বছর দশেক তো নিশ্চয়ই। এ অ্যাপার্টমেন্টটা তার দেখেই পছন্দ হইয়াছিল। আশেপাশে সব কিছু পাওয়া যায় এবং শহরের একবারে কাছে। তবে ভাড়া একটু বেশী চেয়েছিল। তাতেও সে রাজি হয়ে গেছিল। তখন তার ব্যবসাও জোর কদমে চলছিল। আর সংসারও ছোট ছিল। তারপর···।

ডিনসমেডের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। সংসার বাড়লো, কিন্তু তার ব্যবসায় সহসা ভাঁটা নেমে এলো। এবং তা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ব্যবসায়ে জোয়ার ভাঁটা আছে। হয়তো আবার একদিন ডিনসমেড সেই আশায় সে রয়েছে।

হঠাৎ একটা গাড়ির ব্রেক কষার শব্দে ডিনসমেড সম্বিৎ ফিরে পায়। সে অনেকক্ষণ ধরে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সে একটু চমকে উঠে কলিং বেল পুশ করে।

সুশান ডিনারের তদারক করছিল। কলিং বেলের আওয়াজ পেয়ে সে ন্যাপকিনে হাত মুছে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

দরজা খুলে সুশান কিছুটা অবাক।

সে স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরলে?

—হ্যাঁ, চলে এলাম, ডিনসমেড কথার মাঝে একটু সুর টেনে বলে। অফিসে বসে থাকতে আর ভালো লাগছিল না।

—এসে ভালোই করেছো। শুধু শুধু বসে থাকাটা আমি ঠিক পছন্দ করি না।

—একটু কফি করতো।

—করছি।

তারপর কফির কাপ হাত নিয়ে সুশান বলে, রজার আবার এসেছিল।

—কখন ?

—এই তো ঘণ্টা খানেক আগে।

—এসে কি বললো ?

—বললো, তুমি দয়া করে তার সঙ্গে একটু কথা বললে সে খুশী হবে।

—খুশী হবে ? ডিনসমেডের ভেতরটা যেন জ্বলে উঠে।

—হ্যাঁ, আর ও তো তাই বললো।

—বিনয়ের অবতার। বোঝ না কথার সব মার প্যাঁচ।

—ভাবটা অনন্ত তাই দেখাচ্ছে।

—দেখবে এখুনি আমায় ও ফোন করবে।

—তুমি কিসে বুঝলে ? স্বামীর হাতে সুশান কফির কাপটা এগিয়ে দেয়।

—দেখেছি ইদানীং ও আমার আসা যাওয়ার উপর ঠিক খেয়াল রাখে, ডিনসমেড কফিতে চুমুক দিয়ে বলে।

কফিটা তখনো ডিনসমেড শেষ করেনি ঠিক তখনি টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দ করে বেজে উঠলো।

ডিনসমেড একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নেয়, হ্যালো !

—হ্যালো মিঃ ডিনসমেড ?

—হ্যাঁ।

—এখন আপনাকে ফোন করে বিরক্ত করছি নাতো ?

—আদৌ নয়।

—ধন্যবাদ ! রজার এবার আসল কথায় আসে। আমার ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখলেন ?

—হ্যাঁ। অন্য বাড়ির চেষ্টায় আছি।

সুশান স্বামীর দিকে তাকিয়ে আকারে ইঙ্গিতে বলতে যায়, তুমি এ কথা বলতে গেল কেন! এখানে যে ভাড়ায় আছি অন্য কোথাও সে ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া যাবে।

কথাটা ঠিকই। সুশানকে মাথা নেড়ে থামতে বলে ডিনসমেড জানায়, ইদানীং তো সহজে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না। আর যাও বা পাওয়া যায় তার ভাড়া অনেক।

—তা অবশ্য ঠিক। তবু আমার কথাটা ভেবে দেখবেন।

—নিশ্চয়ই। ভেবে দেখতে হবে বই কি!

—কবে নাগাদ আমি জানতে পারবো?

—তা এখন আপনাকে কি করে বলবো! আমার নিজের হাতে তো কিছু নেই।

—তবে চেষ্টায় অনেক কিছু হয়।

—আমার চেষ্টায় কোন ত্রুটি নেই।

—কিন্তু তেমন তো কোন গরজ দেখছি না।

—দেখছেন না? ডিনসমেড যেন ফোঁস করে ওঠে!

—না।

—আমি দালালকে পর্যন্ত বলেছি। সে আমায় অপেক্ষা করতে বলেছে। আমাদের সঙ্গে এই পর্যন্ত কথা হয়েছে।

—ও। তা আপনি কার সঙ্গে কথা বলেছেন?

—পিটারের সঙ্গে। তাকে আপনি চেনেন নাকি?

—চিনি বই কি! ঠিক আছে। ওকে আমিও বলবোখন। অবশ্য আমি ঠিক আবার ওকে বলতে চাই না।

—কেন? আমার তো মনে হয় বললে ভালোই হবে।

—ভালো? বললে আবার আমার কাছেও দালালি চাইবে। তবু আমি তাকে বলবো।

—ওদের তো ঐ সবই কাজ, আর এই করেই তো ওদের চলে।

—আমার মনে হয়, আমার ছেলে মাস চারেকের মধ্যেই এসে পড়বে।

—হ্যাঁ, তা আপনি আমায় বেশ কয়েক বার বলেছেন।

—তাই আপনাকে এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, আর আপনি ভালো লোক বলেই আপনাকে কিছুটা নিরুপায় হয়ে এ কথা বলা। এবং এ কথা বলতেও আমার লজ্জা করছে।

একটু থেমে রজার আবার বলে, এক তলায় সব দোকান। তাদের তোলার সাধ্য আমার মত লোকের নেই। তবু একবার ভয়ে ভয়ে বলেছিলামও। তার ফল হাতে নাতেই পেয়েছি। বলার সঙ্গে সঙ্গে মেই মেই করে উঠেছে। ওদিকে আমার ছেলের আসার দিন যত এগিয়ে আসছে তত চিন্তা বাড়ছে। যদিও এ বাড়িতে পুরোপুরি থাকবে না। কিন্তু পাঁচ সাত মাস তো থাকবেই। এই ক'মাসের অন্য ব্যবস্থা করতে পারছি না। অ্যাপার্টমেণ্ট পাওয়া এক সমস্যার ব্যাপার।

—আমার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা।

—বুঝি।

—ঠিক আছে, আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

—গুড নাইট।

—গুড নাই।

দুই

ডিনসমেড সকালের দিকে বেরিয়ে পড়লো। তাকে এখন যেতে হবে বন্ধু রবার্টের বাড়িতে। এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়, আবার ঠিক কাছেও বলা চলে না। দু'বার বাস বদল করতে হয়। অবশ্য ট্যাক্সিতে গেলে অন্য কথা।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ডিনসমেড রবার্টের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। দোতলা বাড়ি। এরই একটা অ্যাপার্টমেন্টে রবার্ট থাকে। আর এটা সে কিনে নিয়েছে।

রবার্ট আর ডিনসমেড এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছে। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে দু'জনের লাইন আলাদা হয়ে যায়। একজন যায় সাহিত্যের দিকে এবং অপর জন ঝোঁকে গিয়ে বিজ্ঞানের দিকে।

রবার্ট বরাবরই পড়াশুনোয় ভালো। সে নিয়ে দু' বন্ধুর মধ্যে বেশ একটা রেষারেষি ছিল। থাকলেও ডিনসমেড রবার্ট থেকে পিছিয়ে পড়তো।

আর চাকরির দিক দিয়েও রবার্টের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সে একটা ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছে। এখন সে একজন উচ্চপদস্থ অফিসার।

যখন রবার্টের ত্রিশ বছর বয়স তখন সে বিয়ে করলো। বেশ সুখেই কিছুদিন কাটলো। তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটলো সে হলো একটি মেয়ে। তাদের শিশুকন্যা।

স্বামী-স্ত্রীতে খুশীতে ডগমগ। ফুলের মত সুন্দর মিষ্টি মেয়ে। ছুটি ছাটায় মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু এ সুখ তাদের বেশী দিন রইলো না। হঠাৎ একদিন স্ত্রী মারা গেল স্ট্রোকে।

যখন ব্যাপারটা ঘটে তখন রবার্ট অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে জোন্স সাহেবকে ফোন করেছিল। তারপর রবার্ট যখন হন্ত দন্ত হয়ে এলো তখন সব শেষ। তার আর কিছুই করণীয় নেই।

প্রথমটা রবার্ট শুনে বিশ্বাস করতে পারেনি, আর ঘটনাটি আচমকা ঘটলো বলে সে দিশেহারা হয়ে পড়লো। তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে।

তখন ডিনসমেড খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। এসে সে শুধু বন্ধুকে শান্ত্বনা দেয়নি, তার স্ত্রীর শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করেছে। তেমনি শিশুকন্যার দেখাশুনোর জন্য তাকে সুশানের হাতে তুলে দিয়েছে।

তার মাস খানেক পরে মেয়েকে ডিনসমেড আবার বাড়ি নিয়ে এসেছে। ওখানে মেয়ে বেশ ভালোই ছিল।

এখন বাবা মেয়েকে পেয়ে যেন ততটা খুশী হতে পারলো না। তার ধারণা, মেয়েই বোধ হয় মাকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি যেন তার জীবনে কাল হয়ে এসেছে।

তবে এ কথাটা রবার্ট আবার বিশ্বাসও করে না। মেয়েকে তখন বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে আদর করে। তারপর কিছু সময় কেটে যায়। আবার কি খেয়াল হতে মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে দেয়। মেয়ে কাঁদলেও আর ফিরে তাকায় না। তখন জোন্স এসে মেয়েকে সামলায়। সাহেবের হাব ভাব সে আদৌ বুঝতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে যায়। ওদিকে মেয়ে আবার বাবার কাছে যাবে বলে বায়না ধরে। তখন জোন্স এক মহা সমস্যায় পড়ে। তারপর অনেক কষ্টে মেয়েকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে। আর তাতেও যখন কাজ না হয় তখন সে মিঃ ডিনসমেডকে ফোন করে। বলে, সাহেব, মেয়েকে আর সামলাতে পারছি না।

দয়া করে একটি বার মিসেস ডিনসমেডকে পাঠিয়ে দেন, অথবা আপনি আসেন তাহলে খুব ভালো হয়।

এখন যেমন ডিনসমেড যাচ্ছে তখনো সে ঠিক এই ভাবে আসতো। এসে মেয়েকে আদর করতো। তার জন্য নানা রকম খেলনা খাবার ইত্যাদি নিয়ে আসতো।

আর ডিনসমেড যেতো আরো একটা কারণে। সে হলো মিস জুলিয়েট, তার প্রতি তার একটা দুর্বলতা ছিল। আর রবার্টের স্ত্রী লিজা……। তবে সেটা হয়তো বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি আনুগত্যও বলা চলে।

এখন মেয়ে আর জোন্সের মধ্যে একটা দারুণ ভালো ভাব হয়ে গেছে। জোন্সই তাকে দেখা শুনো করে। একে অপরকে ছাড়া যেন চলেই না।

দরজার বেল বেজে উঠতে জোন্স এসে দরজা খুলে দিয়ে মিঃ ডিনসমেডকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলে। গুড মর্নিং স্যার

—মর্নিং, ডিনসমেড জোন্সের দিকে তাকায়।

জোন্সের বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। মজবুত স্বাস্থ্য উচ্চতায় মাঝারি ধরণের।

জোন্স এ বাড়িতে বছর দুয়েক হয় কাজ করছে। এর আগে নাকি কোথাও কাজ করতো না। এখানেই প্রথম।

জোন্স ফিস ফিস করে মিঃ ডিনসমেডকে বলে, স্যার আপনি একটু ভালো করে সাহেবকে বলবেন?

—নিশ্চয়ই।

—সাহেবকে যে করে হোক রাজি করাতেই হবে।

—আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না।

—তাহলেই হবে। আমার কথা যেন আবার বলবেন না।

—না, না, ঠিক আছে।

—আমি তাহলে যাই।

—শোন, ডিনসমেড আবার জোন্সকে কিছু বলতে চায়।

—বলুন, জোন্স ফিরে তাকায়।

—মিস জুলিয়েটের খবর কি

—উনি নিয়মিত পড়াতে আসছেন।

—ভালো, কথাটা শুনে ডিনসমেডের বেশ পছন্দ হলো।

—সেটাই একটা আশার কথা, জোন্সের কথার মধ্যে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত।

—এবার তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

—বলুন স্যার।

—দু'জনে কেমন গল্প গুজব করছে? কথাটা বলেই ডিনসমেড অধীর আগ্রহে জোন্সের দিকে তাকায়।

—বেশী নয়। জোন্স কিছুটা মনমরা ভাবে জানায়।

—বেশী নয়? এটা তো ঠিক ভালো কথা নয়। আমি অনেক কিছু আশা করছিলাম।

—স্যার, আমি···আমি তাই। তবে বেশ নিরাশ হয়ে পড়েছি।

—কেন? অবশ্য তোমার কথার মধ্যে যে একবারে যুক্তি নেই তা বলছি না। যাক্ তুমি কি বলবে বলো।

—সাহেব যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। একটু যে হেসে কথা বলবে তা নয়। মেম সাহেব চলে গিয়েই যত বিপদ বাঁধিয়েছে।

—তা তো ঠিকই, আর মিস জুলিয়েট?

—সে কিছুটা সহজ, জোন্সে বেশ হাসি মুখে কথাটা জানায়।

—এটা একটা ভালো খবর, ডিনসমেডের মুখটা উজ্জ্বল দেখায়।

—কিন্তু স্যার, আমি···। জোন্স কথাটা শেষ করতে পারে না। সে ইতস্তত করতে থাকে। ফলে সে কথার মাঝে থেমে যায়।

—কিন্তু কি আবার? ডিনসমেডের হাসি খুশী ভাবটা আর রইলো না। মিলিয়ে গেল।

—আমি আপনার উপরই…। জোন্স স্যারের উপর সম্পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে।

—সে তো আমি আছিই, আর জানো তো, মেয়েদের হাতে অনেক গোপন অস্ত্র থাকে।

—হয়তো আছে। জোন্স মাথা নেড়ে সায় জানায়।

—হয়তো নয়। আছে, ডিনসমেড কথায় বেশ জোর দিয়ে বলে।

—তবু স্যার, আপনাকেই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

—দেখা যাক কি করা যায়।

ওদিকে গুটি গুটি পায়ে মেয়ে এসে হাজির। তাকে নিয়ে চলে যাবার আগে জোন্স বলে, স্যার, আপনি এগিয়ে যান।

অ্যাপার্টমেন্টের প্রথমেই কিছুটা ফাঁকা জায়গা। সেখানটা মোটা কার্পেট দিয়ে ঘেরা। সম্ভবত ইজিপসিয়ান।

তারপর বৈঠকখানা। সেখানে বেশ কিছু আদর দায়ক চেয়ার পাতা রয়েছে। দু'একটা ল্যাবজস্কপ, যা দৃষ্টি কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট।

এখানে বসার একটু পরেই রবার্ট এলো। পুরুষালী চেহারা। উচ্চতায় প্রায় ছ'ফুটের কাছে। বয়স চল্লিশের নিচে।

—তা ডিনসমেড, খবর কি? রবার্ট ডিনাসমেডের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

—ভালো। তা তুমি কেমন আছো? ডিনসমেড রবার্টকে লক্ষ্য করতে থাকে।

—ভালোই আছি, রবার্ট কথাটা বললো বটে কিন্তু তার কথার মধ্যে যেন কেমন একটা উদাস ভাব।

—ভালো? কথাটা বলে ডিনসমেড বোঝাতে চাইলো যে, সে মোটেই ভালো নেই।

—হ্যাঁ। কথাটা বরার্ট বললো বটে, তবে সম্পূর্ণ জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

—আমার তো তা মনে হয় না, ডিনসমেড আর নিজেকে চেপে রাখতে পারে না। কথাটা সে বলেই ফেলে।

—হয় না। রবার্ট ডিনসমেডের দিকে তাকাতে গিয়েই যেন তাকাতে পারে না। সে দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নেয়।

—না, এবার ডিনসমেড স্পষ্ট ভাবে জানায়।

—তা না হবার কারণ কি? রবার্ট নিজের কথায় অটল থাকতে চায়।

—কারণ কি একবারে নেই?

—আমার তো মনে হয় নেই।

—আছে বন্ধু, ডিনসমেড মৃদু হেসে মাথা নাড়ে।

—কি? রবার্ট কথায় তেমন জোর দিতে পারে না।

—ভালো আছি তো বলতে পারলে না। কথাটার মাঝে যেন একটা······।

উঁহু। ঠিক ভাবেই বলেছি। রবার্ট ডিনসমেডের কাছে ধরা দিতে চায় না।

—কখন বললে। ডিনসমেডও ছাড়বার পাত্র নয়।

—এই মাত্র, রবার্ট সমানে লড়ে চলে।

—আবার বলছি না।

—তুমি তো বেশ···, রবার্ট ঠিক বোঝাতে পারে না।

—মিথ্যে আমি বলছি না, ডিনসমেড হাসে। ভালো আছো বলেছো ঠিকই, তবে সেই কথার মাঝে যেন একটা বিষাদের সুর ঝরে পড়েছে।

—বিষাদের? রবার্ট যেন মহা ফাঁপড়ে পড়েছে।

—হ্যাঁ, ডিনসমেড মাথা দোলাতে থাকে।

—কিসে বুঝলে? রবার্ট ভাবে, ডিনসমেড নিশ্চয় কোন মতলবে আছে। কিন্তু সে মতলবটা কি।

—ফ্যামিলিম্যানের চোখে অনেক কিছুই ধরা পড়ে যায়।

—ও, রবার্ট এর বেশী আর কিছু বলতে পারে না, আর তার মুখেও যোগায় না।

—হ্যাঁ, ভালো কথা, হঠাৎই ডিনসমেডের একটা কথা মনে পড়ে যায়।

—বলো, রবার্ট প্রসঙ্গ চাপা পড়ায় কিছুটা খুশী।

—মেয়ে তো একটু একটু করে বড় হচ্ছে।

—হ্যাঁ, অস্বীকার করার উপায় নেই, সহসা রবার্টকে যেন অতি মাত্রায় বিষণ্ণ দেখাতে থাকে।

—ওর পড়া শুনার কি ব্যবস্থা করছো?

—ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি।

—ভালো, আর তুমিই বুঝি ওকে দেখছো?

—না।

—তবে কে?

—জোন্স তো আছেই, আর একজন টিচার রেখেছি।

—টিচার? ডিনসমেড জেনেও না জানার ভান করে। আসলে সে কথাটা রবার্টের মুখ দিয়ে শুনতে চায়।

—হ্যাঁ, রবার্ট সায় জানায়।

—ছেলে না মেয়ে? আবার ডিনসমেডের প্রশ্ন।

—মেয়ে, তারপর রবার্ট ভাবে। এবার সে হয়তো একটু বিপদে পড়তে পারে। কারণ ডিনসমেড তাকে আক্রমণ করতে পারে।

—ভালো। তা থাকে কোথায়?

—কাছেই।

—এ রকম একজন রেখে ভালোই করেছো। আমার ছেলে মেয়েদের জন্যও রাখতে হবে।

—হ্যাঁ, রাখতে পারলে কিছুটা নিশ্চিন্ত।

—যোগাড় করলে কোত্থেকে ?

—আমার অফিসের এক কলিগ দিয়েছে, রবার্ট যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ডিনসমেড হুল ফুটিয়ে বসলো।

—কলিগ ? ডিনসমেড যেন চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বলে।

—হ্যাঁ, রবার্ট যা ভয় করেছিল ঠিক তাই।

—বয়স কত ?

—জানি না।

—বেরসিকের মত কথা বলো নাতো ! ডিনসমেড মৃদু ধমক দেয়।

—এতে আবার বেরসিকের মত কথা কি হলো !

—হয়েছে বই কি ! ডিনসমেড তার কথায় বেশ জোর দিয়ে বলে।

—মেয়েদের বয়স কি চট করে বোঝা যায় ! রবার্ট অন্য ভাবে কথাটা বলে ডিনসমেডকে বোঝাতে চায়।

—না গেলেও অন্তত কিছুটা তো আন্দাজ করা যায়।

—তা হয়তো যায়।

—সেই আন্দাজেই বলো ওর কত বয়স হতে পারে, ডিনসমেড যেন নাছোড়বান্দা।

—চব্বিশ পঁচিশ, অগত্যা রবার্টকে বলতে হলো। ভেবেছিল, চেপে যাবে।

—মিস না মিসেস ? আবার ডিনসমেড রবার্টের দিকে এক মোক্ষম প্রশ্ন ছুড়ে দেয়।

—মিস, রবার্ট কতটা নিরুপায় ভাবে কথাটা জানায় এবং সে স্পষ্ট বুঝতে এরপর ডিনসমেডের কথা টা কোন দিকে মোড় নেবে

—এ মাস থেকে ?

—হ্যাঁ।

তারপর রবার্ট ডিনসমেডের দিকে তাকিয়ে বলে, এবার তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

—নিশ্চয়ই।

—হঠাৎ মিসট্রেসের ব্যাপারে এতটা আগ্রহী হয়ে উঠলে কেন ?

—দেখার জন্য।

—দেখে কি করবে ?

—আলাপ করতাম।

—আমার জন্য নয় ? তোমার জন্য।

—আমার জন্য ? রবার্ট নিজেকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ।

—সে উপকার তোমার না করলেও চলবে, রবার্ট বন্ধুর কথার ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারে।

—মেয়েকে নিয়ে রাখার সময় এ কথা তো তুমি বলোনি !

—আরে না, না, কথাটা তুমি অন্য ভাবে নিও না ! রবার্ট একটু লজ্জিত হয়ে বলে।

—আমি কিছুই মনে করিনি। তবে আমি বলছিলাম, বিয়ে করো।

—এ বয়সে আর বিয়ে নয়।

—তোমার কি এমন বয়স হয়েছে !

—চল্লিশের কাছে যাচ্ছি।

—আজকালকার দিনে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ আবার একটা বয়স কি ! অনেকে এ বয়সে প্রথম জীবন শুরু করে।

—তোমার কথাটা যে একবারে অযৌক্তিক তা বলছি না।

—তবে ? তাহলে আর আপত্তি করছো কেন ?

—আপত্তি আছে বই কি !

—কিসের ?

—আমার বিবেকের কাছে।

—তুমি তো অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছো না।

—তবুও আমার পক্ষে আর বিয়ে করা সম্ভব নয়।

—কিন্তু কেন সেটাই আমি জানতে চাই।

—লিজাকে আমি সহজে ভুলতে পারছি না।

—হুট করে যে ভোলা যায় তা আমি বলছি না। কিন্তু রবার্ট, লিজা তো আর ফিরবে না ?

—তা ঠিকই।

—অনুতাপ হয় ঠিকই, কিন্তু তোমার নিজের তো কামনা বাসনা বলে একটা জিনিস আছে।

—আমার কথা ভাবি না।

—ভাবোনা বললে তো হয় না।

—সত্যি, বিশ্বাস করো, ও সব ভাবি না।

—কিন্তু মেয়েটার ভবিষ্যত বলেও তো একটা জিনিস আছে।

—ওর ব্যাপারে আমার আর কোন চিন্তা নেই।

—কেন ? ডিনসমেড সহজে হারবার পাত্র নয়। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় যেন সেই রকম পণ করে বেরিয়েছে।

—ও দিব্যি জোন্সের সঙ্গে মেতে উঠেছে।

—সেটাই কি সব হলো! ওর বাবা-মায়ের স্নেহ ভালোবাসা প্রয়োজন, যা শিশুকালে সবাই চায়।

—ও আমার কাছে সেটা পায়।

—মোটেই নয়, ডিনসমেড সজোরে মাথা নাড়ে।

রবার্ট একটু থতমত খেয়ে যায়। ডিনসমেডের কথার সে জবাব দিতে পারে না। চুপ করে থাকে।

—তুমি সকালে অফিসে বেরিয়ে যাও। ফেরো সেই রাতে। তখন মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এবং জেগে থাকলেও তখন তোমার পক্ষে

তার সঙ্গে খেলা করার ইচ্ছে থাকে না। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত ভাবে বাড়ি ফেরো। তখন নিজে একটু বিশ্রাম করবে, না মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বোলাবে।

—কথাটা যে একবারে বেঠিক তা আমি বলছি না।

—তাই আমার কথাটা একটু ভেবে দেখো।

ইতিমধ্যে জোন্স কফি আর খাবার নিয়ে হাজির। তারপর খাবার সেণ্টারিং টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে মিঃ ডিনসমেডের দিকে তাকিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করে গেল।

ইঙ্গিতের অর্থ ডিনসমেডের কাছে খুবই স্পষ্ট। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে সে বলল, তখন তুমি বিবেকের কথা বলছিলে না?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তুমি তো লিজাকে ডির্ভোস করে আবার নতুন করে বিয়ে করতে যাচ্ছো না। লিজা আমাদের অকালে ছেড়ে চলে গেছে। তাই বলে তোমার সন্ন্যাসী হয়ে থাকা কিছুতেই চলে না। তার উপর তোমার মেয়ে আছে এবং সে শিশু।

—আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু……।

—কিন্তু কিন্তু করো না তো। ডিনসমেড রবার্টকে কথার মাঝে থামিয়ে দেয়।

রবার্ট কফিতে ঠোঁট ডোবায়, এবং বেশ চিন্তিত মুখে বলে, আমায় একটু ভাববার সময় দাও।

—ভাববে? এ নিয়ে ক'বার এ কথা বললে?

—এবার ভেবে ঠিকই বলবো।

—বলবে না, অভিজ্ঞ ডিনসমেড মাথা দোলায় নায়ের ভঙ্গিতে।

—ঠিকই বললো, রবার্ট ডিনসমেডকে কথার মাঝে জোর দিয়ে বোঝাতে চায়।

—কিন্তু আমার মন অন্য কথা বলছে।

—কি আবার বলছে! অসহায় রবার্ট কথার মাঝে জোর দিতে চায়।

—পরে বলবে তোমার কথা একেবারে ভুলে গেছি।

—এবার তা হবে না, রবার্টের কথার মাঝে যেন দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

—না হলেই খুশী হবো। ঠিক আছে, উঠি। পরের বারের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে রইলাম।

রবার্ট এ কথার কোন উত্তর দিল না। তাকে দারুণভাবে গম্ভীর দেখাতে থাকে।

তিন

তারপর ঘটনাটা একবারে আচমকা ঘটলো। ফলে ডিনসমেড একবারে হকচকিয়ে যায়। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে।

তখন বেলা ফুরিয়ে এসেছে। শীতের ছোট বেলা। ডিনসমেড আফসে।

ফোনটা সহসা বেজে উঠতে ডিনসমেড ফাইলের উপর থেকে চোখ তুলে অভ্যস্থ হাতে রিসিভারটা তুলে নেয়, হ্যালো।

—হ্যালো, মিঃ ডিনসমেড, কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ।

—আমি জোন্স।

—বলো, কি খবর ? তোমার সাহেবকে রাজি করাতে পারলে ?

—আর রাজি ! জোন্স অসহায় ভাবে বলে।

—কেন ?

—সাহেব এখন সব কিছুর বাইরে।

—মানে ? ডিনসমেড ফাইল রেখে রিসিভারটা কানের উপর জোরে চেপে ধরে।

—সাহেব আজ দুপুরে ট্রেন থেকে পড়ে গেছেন।

—তুমি বলছো কি !

—আমি ঠিকই বলছি স্যার ! জোন্সের গলা ভারি হয়ে ওঠে।

—তুমি কি করে জানলে ?

—এই তো মিনিট পাঁচেক আগে পুলিশ এসেছে। তারাই ঘটনাটা জানিয়ে গেছে।

—তারা তোমার সাহেবকে চিনলো কি করে যে, রবার্টই সেই মানুষ।

—সাহেবের পকেটে আইডেনটিটি কার্ড ছিল। তাই দেখেই তারা সাহেবকে সনাক্ত করেছে। উঃ, ভগবান আমি আর ভাবতে পারছি না যে, সাহেব আর নেই।

—জোন্স! প্লীজ ও কথা বলো না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

—সাহেবকে ওরা মর্গে নিয়ে গেছে।

—জোন্স। দয়া করে চুপ করো।

—স্যার, এসব কথা এখন আপনাকে না জানিয়ে থাকতে পারছি না। আপনাকে একটিবার দয়া করে মর্গে যেতে হবে। আমার একা যেতে পা সরছে না।

—জোন্স, আমায় মর্গে যেয়ে রবার্টের মৃতদেহ দেখতে অনুরোধ করো না।

—স্যার, আপনি না এলে আমি মনে বল পাচ্ছি না।

—অগত্যা। এ ভাবে দেখবে আমিও একদিন পুট করে চলে গেছি।

—স্যার, ও কথা বলবেন না।

—বলতে তো চাই না। তবু তো ঘটনাগুলো আমাদের ভরসায় বসে থাকে না। নিষ্ঠুর ভাবে হয়ে চলে।

—যাক স্যার, আপনি আসছেন তো?

—হ্যাঁ, না এসে উপায় কি। তুমি একবার মিস জুলিয়েটকে ফোন করো।

—করছি, জোন্স কোন আর কথা বলতে পারছে না।

—হ্যাঁ, তাই করো, তারপর ডিনসমেডের রবার্টের মেয়ের কথা মনে পড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, বাচ্চা কি করছে?

—ও টি. ভি. দেখছে।

—অবোধ শিশু। তাই দেখুক। অথচ জানতে পারলো না, ওর জীবনের শেষ অবলম্বন আজ হারিয়ে গেল।

—আপনি তো আছেন।

—আর আমি! ডিনসমেডের চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। তা ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে তা পুলিশ বলেছে?

—বলেছিল। আমার ঠিক মনে নেই।

—কখন ঘটেছে তা কিছু বলেছে?

—বলেছে দুপুরের দিকে।

—ঠিক আছে, আমি আসছি।

—তাহলে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

—আচ্ছা, আর তুমি ততক্ষণে মিস জুলিয়েটকে খবরটা দাও।

—ঠিক আছে।

—হ্যালো!

—হ্যালো, আমি ডিনসমেড কথা বলছি।

—বলো, আমি সুশান।

—খুব একটা বাজে খবর আছে।

—কিসের বাজে খবর?

—রবার্ট মারা গেছে।

—মিঃ রবার্ট? সুশান যেন কিছুতেই কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না।

—হ্যাঁ।

—আমি তো তোমার কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আজ দুপুরে অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছে।

—ওমা সে কি!

—হ্যাঁ সুশান। খবরটা শুনে অবধি আমার হাত পা কাঁপছে।

—তা তো হবারই কথা! এমন একটা জলজ্যান্ত মানুষ……। তা তোমায় খবরটা দিল কে?

—জোন্স।

—আমার মনে কিন্তু অন্য একটা কথা আসছে।

—অন্য কথাটা আবার কি? সুশান ভাবতে থাকে।

—সত্যি, এটা একটা দুর্ঘটনা, না অন্য কিছু?

—আমি তোমার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না।

—মানে আমি বলছি, এর পিছনে কোন চক্রান্ত নেই তো?

—হঠাৎ তোমার মনে এ রকম একটা কথা মনে হলো কেন।

—এমন একটা সবল সুস্থ মানুষ এভাবে হট করে……।

—রবার্ট তো অসুখে মারা যায়নি। গেছে ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে অ্যাকসিডেন্টের উপর তো কারুর হাত নেই।

—তা হোক। কি ভাবে মারা গেছে তা কি কিছু বলেছে?

—না।

—আমার মনে কিন্তু খটকা লাগছে, সুশান একটু ইতস্তত করে বলে।

—এতে খটকার কি আছে তা তো আমি বুঝতে পারছি না। হয়তো ট্রেনে ট্রেনে ধাক্কা মেরেছে।

—তা হলে অবশ্য……। কিন্তু নিউজে তো কিন্তু বললো না।

—সব ঘটনা কি আর নিউজ বলে।

—তা অবশ্য ঠিক। তবু তুমি একটু ভালো করে খোঁজ খবর নাও। সুশান ঠিক নিশ্চিত হতে পারছে না।

—আচ্ছা, জানো সুশান, আমার মনে কিন্তু অন্য একটা কথা মনে হচ্ছে, ডিনসমেডের হঠাৎই একটা কথা মনে হয়।

—কি কথা?

—আত্মহত্যা করলো নাতো?

—না, না, তা সে করতে যাবে কেন!

—যাবে যে একবারে না তা বলতে পারছি না।

—কেন ?

—ওর মনের অবস্থা ভালো ছিল না।

—মানছি, কিন্তু গেলে ওর মেয়েকে কে দেখবে ? .

—জোন্সই দেখছে, আর মেয়েও ওর খুব নেওটা হয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, মেয়ে ওর বাপকে কতক্ষণ পেতো। বাপ সকাল আটটার মধ্যে বেরিয়ে যেত, আর ফিরতো সেই রাতে। বাচ্চা মেয়ে বেশীর ভাগ দিনই ঘুমিয়ে পড়তো।

—তা অবশ্য ঠিক।

—তাই জোন্সকে ও আঁকড়ে ধরেছে। যত খেলা, গল্প সব ওর সঙ্গে। আর জোন্সও মেয়েটার জন্য পাগল। ওর জন্য করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই।

—এটা এক দিক দিয়ে কিন্তু ভালোই হয়েছে। ও হ্যাঁ, তুমি আত্মহত্যার কথা তখন কেন বলছিলে ?

—রবার্ট লিজাকে ভুলতে পারছিল না। ওর মৃত্যুতে দারুণ আঘাত পেয়েছে। হয়তো সেই কারণেই……।

—তাই বলে একবারে আত্মহত্যা করতে যাবে এটা কি ঠিক…।

—আমার মনে হলো তাই বললাম, আর এটাও যে একটা অমূলক ধারণা তাও আবার বলতে পারছি না।

—কেন ?

—আমি ওর বিয়ের জন্য বহু চেষ্টা করেছি। ওর সেই একই কথা, এখন আর বিয়ে নয়। তারপর ও গম্ভীর হয়ে যেত। কথার মাঝে থেমে যেত। কি সব যেন অনমনা মনে ভাবতে থাকতো।

—আসলে লিজাকে ও দারুণ ভালোবাসতো। ছুটির দিনে দুটিকে সব সময় এক জায়গায় দেখা যেত।

—তাই আমার মনে হয় স্ত্রীর শোক সামলাতে না পেরে এমন একটা কাণ্ড হয়তো করে বসেছে।

—তোমার কথাটাও একবারে ফেলনা নয়, সুশান জানায়।

—শোন, আমার একটু ফিরতে রাত হবে।

—কোথায় আবার যাবে?

—মর্গে যেতে হবে।

—ঠিক আছে, হয়ে গেলেই তাড়াতাড়ি চলে আসবে।

—আচ্ছা।

—হ্যালো!

হ্যালো! আমি একটু মিস জুলিয়েটের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—আপনি কে কথা বলছেন।

—আমি মিঃ রবার্টের বাড়ি থেকে জোন্স বলছেন।

—ও। একটু ধরো।

হ্যালো।

—হ্যালো মিস জুলিয়েট?

হ্যাঁ।

—আমি জোন্স কথা বলছি।

—আজ সকালে যেতে পারিনি বলে লজ্জিত, বাড়িতে কয়েকজন গেস্ট এসেছিল, আমি কাল সকালে ঠিক যাবো।

—না, না, আমি তার জন্য আপনাকে ফোন করিনি।

—ও বুঝেছি। ছোট্ট সোনা বুঝি ফোনে আমার সঙ্গে কথা বললে না বলে অভিমান করেছে।

—না, তা নয়।

সাহেব……জোন্স কথাটা শেষ করতে পারে না। কথাটা যেন গলার কাছে ঢেলার মত আটকে যায়।

—সাহেব কি? জোন্স কথাটা শেষ না করায় জুলিয়েট অধৈর্য বোধ করে।

—উনি নেই।

—কি সব আজে বাজে কথা বলছো।

—আজে বাজে কথা নয় মেমসাহেব! জোন্সের গলাটা করুন শোনাতে থাকে।

—আমি কথাটা আদৌ বিশ্বাস করতে পারছি না, জুলিয়েট ভেঙ্গে পড়ে।

—আমিও কি প্রথমটা বিশ্বাস করতে পেরেছিলাম।

—তা উনি মারা গেলেন কিসে?

—ট্রেনের অ্যাকসিডেণ্টে।

—তারপর জোন্স বলে, মেমসাহেব, আপনি কি দয়া করে মর্গে যেতে পারবেন।

—যাবো।

—তাহবে এখুনি চলে আসুন।

—আচ্ছা আর তুমি কি মিঃ ডিনেসমেডকে খবর দিয়েছো।

—দিয়েছি।

—খবরটা শুনে উনি কি বললেন?

—দারুণ ভাবে মুষড়ে পড়লেন।

—পড়াই তো স্বাভাবিক। দু বন্ধুতে খুব ভাব ছিল।

—আপনার মত উনিও প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেননি।

—পারবেনই বা কি করে। আমি তো তোমার কথাটা এখনো যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—সবই আমাদের কপাল মেমসাহেব।

—নইলে উনি কখনো এভাবে চলে যান।

—এখন ভাবছি, মেমসাহেব চলে গিয়ে ভালই করেছেন, নইলে উনি ও শোক সামলাতে পারতেন না। তার উপর উনি একটু নরম স্বভাবের মেয়ে ছিলেন।

—ঠিকই বলেছো, তা বাচ্চা এখন কি করছে।

—এতক্ষণ টি. ভি. দেখছিল, এখন খেলা করছে।

—এখন তুমি আর মিঃ ডিনসমেড ছাড়া ওর আর কেউ রইলো না। হতভাগ্য এক শিশু!

—হ্যাঁ, জোন্সের মুখ দিয়ে একটা শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আপনি তাহলে তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছি, আর মিঃ ডিনসমেডও চলে এলেন বলে।

—ঠিক আছে।

চার

রবার্টের অন্তেষ্টিক্রিয়া হয়ে গেছে, তারপর বিমর্ষ জুলিয়েটকে ডিনসমেড বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তার গাড়ি এখন রবার্টের বাড়ির উদ্দেশ্যে চলেছে, এখন তার সঙ্গে জোন্স রয়েছে।

ডিনসমেড রবার্টের অ্যাপোর্টমেণ্টে পৌঁছে গেছে। তাকে খুব বিমর্ষ দেখাতে লাগলো। একরাশ নিঃসঙ্গতা যেন তাকে কুড়ে কুড়ে খেতে থাকে।

ইতিমধ্যে জোন্স একবার মিঃ ডিনসমেডকে ডেকে গেছে। কোন সাড়াশব্দ পায়নি, সে সোফায় মুখ গুঁজে বসে আছে।

এরই মাঝে গিয়ে জোন্স বাচ্চাকে পাশের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে, বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

রাত এখন ন'টা। বাড়ি ফেরার জন্য ডিনসমেড ততটা আগ্রহ প্রকাশ করছে না। অথচ সুশান তাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে, দেরি করলে চিন্তা করবে, তবু সে বসে আছে। তার বুকটা যেন শূন্য হয়ে গেছে।

—স্যার! জোন্স আবার পানীয় এবং কিছু স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এসে ডিনসমেডের সামনে দাঁড়াল।

অ্যাঁ। ডিনসমেড ঘাড়ের কাছে গোঁজা মাথাটা কিছুটা সোজা করে জোন্সের দিকে তাকায়।

—আপনার জন্য একটু হুইস্কী, আর…।

—হ্যাঁ তাই দাও।

—আপনাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

—আর ক্লান্ত! ডিনসমেড সোজা হয়ে বসে, শরীরের আর দোষ

কি। রবার্ট এইভাবে আমায় নিসঃঙ্গ করে চলে গেল।

—সাহেব যে নেই তা যেন আমি এখনো ভাবতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে একটু পরেই ফিরবেন।

—আর ফিরবেন, ডিনসমেড পরম বন্ধুর মত হুবস্কীর গ্লাসটা কাছে টেনে নেয়। তোমার সঙ্গে সাহেবের পরিচয় প্রায় তিন বছরের, আর আর আমার সঙ্গে ?

—কবে থেকে ?

—সেই স্কুল জীবন থেকে, তারপর কলেজে গিয়ে আলাদা, তবু আমাদের বন্ধুত্বে এতটুকু চিড় ধরেনি, যা আজ ধরিয়ে দিল।

—হ্যাঁ।

—বাচ্চা এখন কি করছে ?

—ঘুমোচ্ছে।

—ভালো।

—এরপর ওকে নিয়ে বোধ হয় মুশকিলে পড়তে হবে।

—হ্যাঁ কিছুটা তো পড়তেই হবে।

—ও নাকি বার বার সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করেছে।

—সে তো করবেই। শিশুমন বিপদ ঠিক বুঝতে পারে। ওরা যে পরম করুনাময় ঈশ্বরের……। ও হ্যাঁ, তা ওরা কি বলেছে ?

—বলেছে বাবা বাইরে গেছে।

—বাইরে ? চিরতরের জন্য বাইরে। তারপর ?

—আমি বলেছি, অনেক দূর গেছে।

ডিনসমেডের মুখ দিয়ে শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। সে শান্তভাবে পানীয়তে চুমুক দিতে থাকে।

—এরপর বললো, চলো, তুমি আর আমি গিয়ে বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি।

—এরকম কতদিন মিথ্যে বলে কাটাবো।

—তাই ভাবছি, আর এ বাড়িটা আমার কাছে এখনই অসহ্য হয়ে উঠেছে।

—সে তো উঠবেই। কি আর করবে।

—আমায় কিছু করতে হবে, জোন্সের কথার মাঝে দৃঢ়তা ফটে উঠে।

—কি করবে? ডিনসমেড স্যাণ্ডউইচটিতে কামড় বসায়।

—এখান থেকে চলে যাবো।

—কিন্তু কোথায়?

—যে কোন জায়গায়।

—সে বললে তো হয় না।

—এ ছাড়া আমি আর এখন কিছু ভাবতে পারছি না।

—শান্ত হও জোন্স।

—শান্ত কি করে হবো বলুন স্যার।

—আমি তোমার মনের অবস্থার কথা বুঝতে পারছি।

—স্যার, এ বাড়িটা যেন আমায় গিলতে আসছে। ভীষণ নির্জন লাগছে। সাহেব ছিলেন তখন এমন করে বুঝতে পারিনি। আজ তার অভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। আর..., জোন্সের চোখ সজল হয়ে উঠে।

—আর কি?

—মেয়েটার দিকে আমি তাকাতে পারি না। এই বয়সেই বাবা মাকে হারালো। উঃ, কি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল।

—সবই ভবিতব্য। ভেবে আর কি করবে।

—ভাবনা আসে, ভাবনার হাত থেকে কারও রেহাই নেই। যত ভুলতে চেষ্টা করছি তবু ভুলতে পারছি কোথায়। আমি ঠিক এখান থেকে চলে যাবো।

—চলে যাবো বললেই কি হুট করে চলে যেতে পারবে।

—স্যার, তবু আমায় চলে যেতেই হবে।

—কিন্তু আমি আবার বলি, যাবে কোথায় ? একটা জায়গা তো ঠিক করতে হবে।

—আমার মাথায় এখন কিছুই আসছে না। তবে আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি, আমায় এখান থেকে চলে যেতেই হবে। তারপর একটু ভেবে জোন্স বলে, আমার গ্রামে চলে যাবো।

—এখানকার অ্যাপার্টমেণ্ট ?

—এ কথা তো মনে হয়নি।

তাই বলছি ওসব যাবার চিন্তা মাথা থেকে একেবারে ঝেড়ে বিদায় করো।

—সম্ভব নয়, জোন্স বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নাড়ে।

তারপর জোন্স হট করে বলে, অ্যাপার্টমেন্ট বেচে দেবো। সেই সঙ্গে ফার্ণিচার গুলোও।

—তা নয় দিলে, কিন্তু মেয়েকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে কি করবে। ?

—ওখানে ওকে মানুষ করবো।

—হয় না, ডিনসমেড জোন্সকে বোঝাতে চায়।

—গ্রামে তা কি সম্ভব নয় ?

ওখানে ভালো করে লেখা পড়া হবে না।

—কেন হবে না ! ওখানে কত ছেলে-মেয়ে গ্রামের স্কুল কলেজে পড়ছে না !

—তা পড়বে না কেন ! জোন্স, একটা কথা ভুলে যেওনা। ও হলো রবার্টের মেয়ে। এক উচ্চ বংশের সন্তান।

—সেটাও আমি ভেবে রেখেছি।

—কি ভেবেছে ? ডিনসমেড পাল্টা প্রশ্ন করে বসে।

—ওর জন্য আমি ভালো মাস্টার রেখে দেবো।

—তা নয় দিলে, কিন্তু বাড়িতে দেখাশুনো করবে কে ?

—আবার কে, আমি ! জোন্স নিজের বুকে চাপড় মেরে বলে।

—আমি সে দেখাশুনোর কথা বলছি না।

—তবে ?

—বাড়িতেও ওকে পড়াশুনোয় সাহায্য করা দরকার।

—এটা তো আদৌ ভেবে দেখিনি, জোন্স অসহায় ভাবে মাথা নাড়ে।

—তাই বলছি, শহরের মেয়ে গ্রামে নিয়ে যাবার পরিকল্পনার মাথা থেকে চিরতরের জন্য নামিয়ে দাও।

—ঠিক আছে, আমি নয় একজন গভরনেস রেখে দেবো।

—তাকে কত মাইনে দিতে হবে জানো ?

—না।

—অনেক টাকা।

—আমি উদয় অস্ত খেটে সেই টাকা যোগাড় করবো।

—বাস্তবে তা সম্ভব নয়।

—দেখিই না। ওকে আমি সেরা স্কুলে পড়াবো। মানে, আমার কোন দিক দিয়ে চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না।

—মানি। তাছাড়া, তুমি সত্যি বাচ্চাকে ভালোবাসো। কিন্তু আমি একটা কথা বলছিলাম।

—বলুন স্যার।

—মেয়ের ভার বরং আমার উপর ছেড়ে দাও।

—না, না, তা কখনো সম্ভব নয় ?

—কিন্তু কেন ?

—ও আপনার কাছে থাকতে পারবে না।

—ঠিক পারবে। এর আগে বেশ কিছুদিন তো ও আমার ওখানে ছিল যখন লিজা মারা যায়।

—তা ছিল।

—তবে ?

—তখন ও শিশু ছিল। এখন ওর বোধ শক্তি হয়েছে। এই যে কিছুক্ষণের জন্য পাশের বাড়িতে ওকে রেখে গেছিলাম, তাতে ও

বার বার আমার কথা জিজ্ঞেস করেছে। কয়েক বার তো কেঁদেও ফেলেছে।

—বাচ্চারা ও রকম করে। ক'দিন যেতে না যেতেই আবার সব ভুলে যায় এবং সহজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

—না স্যার, ও কখনোই আমায় ভুলতে পারবে না।

—আমার কাছে ওকে রেখেই দেখো না! পরে দেখবে আমার কাথাই ঠিক। তাছাড়া, আমার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ও খুব ভালো ভাবে মানুষ হতে পারবে। ও কখনোই নিঃসঙ্গ বোধ করবে না।

—তা ঠিকই।

—কিন্তু ও তোমার কাছে কি পারে! তার উপর তুমি আবার বিয়ে থা করোনি। সংসারের বালাই নেই।

—সংসার করার ভাগ্য কি সবার কপালে থাকে।

—তা অবশ্য ঠিক। তাই আমি সব দিক বিবেচনা করে বলছিলাম, বাচ্চা আমার কাছেই থাকুক।

—না স্যার, দয়া করে এ হুকুম আমার উপর করবেন না।

—হুকুম নয় জোন্স, বন্ধুর প্রতি আমারও তো কিছু কর্তব্য আছে!

—তা নিশ্চয়ই আছে।

—আমি কিছুটা বাধ্য হয়ে এ কথা তোমায় বলছি। আমি মেয়ের দিক দিয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকলে লোকই বা আমায় কি বলবে! তাছাড়া, আমার মিসেসই ওকে নিতে আসতো। আমার সঙ্গে আসতে চাইছিল, কিন্তু বাচ্চাদের জন্য তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। আর এ ব্যাপারে আমি মিস জুলিয়েটের সঙ্গেও কথা বলেছি।

—তিনি কি বলেছেন?

—বলেছেন, বাচ্চা আমার কাছে রাখাই সব দিক দিয়ে ভালো। এবং এ ব্যাপারে সে হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা করে একই কথা বলবেন।

—ও।

—জোন্স, আমার কথার কিছু জবাব দিলে না।

—আমায় একটু ভাববার সময় দিন।

—ঠিক আছে, কয়েক দিন নাও। তারপর মনস্থির করে রেখো।

—আপনি আবার কবে আসবেন?

—এ সপ্তাহে আর হবে না। সামনের সপ্তাহের গোড়ার দিকেও পারবো না। কাজ রয়েছে। যত সম্ভব হয় উইক এণ্ডে আসবো।

—ঠিক আছে।

—অর্থাৎ তোমার ভাববার জন্য দশ দিন সময় দিচ্ছি।

—আপনার অসীম করুণা স্যার।

—তাহলে আজ উঠি।

—আসুন স্যার।

পাঁচ

ডিনসমেড যখন বাড়ি পৌঁছলো তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর সে পোশাক বদলে রবার্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিবরণ দেবার পর সুশানকে বললো, সব কাজ বেশ ভালোভাবে হয়ে গেছে।

—তোমারও খুব ধকল গেছে।

—তা একটু গেছে বই কি। আর আমি একটা কথা ভাবছি।

—কি কথা। সুশান কিছুটা অবাক হয়।

—তোমার হয়তো তাতে অমত হবে না।

—কোনটায়? সুশান জানতে চায়।

—রবার্টের মেয়েকে আমাদের কাছে এনে রাখতে চাই।

—পরের মেয়ের ভার নেবে? সুশান কিছুটা ইতস্তত করে বলে।

—রবার্টের মেয়ে আমাদের পর হবে কেন। তাছাড়া, আমরা মেয়েকে না দেখলে কে দেখবে বলো।

—তোমার মতই আমার মত।

হ্যালো।

—হ্যালো। আমি একটু মিস জুলিয়েটের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—বলছি।

—গুড মর্নিং। আমি ডিনসমেড।

—গুড মর্নিং মিঃ ডিনসমেড। কাল ফিউনারাল থেকে কখন ফিরলেন?

—প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে গেছিল।

—শরীর ভালো আছে তো?

—শরীর ভালো আছে। তবে মন ভালো নেই। তারপরই ডিনসমেডের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

—ভালো না থাকারই কথা। মিঃ রবার্ট শুধু আপনার বন্ধুই ছিলেন না। আপনি তার যথেষ্ট হিতাকাঙ্খিও ছিলেন।

হ্যাঁ, রবার্ট আমার নিজের ভাইয়ের মতই আমায় ভালোবাসতো। আর সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, কোন ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমার মতের অমিল কখনো হয়নি। ওর চিন্তাধারা বরাবার আমার সঙ্গে মিলে যেত।

—হ্যাঁ, মিঃ রবার্টও আমায় মাঝে মধ্যে কথা প্রসঙ্গে সে কথা বলতেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

মিস জুলিয়েট, কাল যে কথাটা আপনাকে বলেছিলাম। সে কথাটা কাল রাতে জোন্সকে বলেছি।

—মানে ঐ বাচ্চার ব্যাপারটা তো?

—হ্যাঁ।

—আপনার কাছে ওকে রাখতে পারলে সব চেয়ে ভালো হবে। ও প্রকৃত মানুষ হতে পারবে।

—আর আমিও সেই ভেবে……।

—ঠিকই করেছেন। তা জোন্স রাজি তো?

—বোধ হয় না। ভাবতে ক'দিন সময় নিয়েছে।

—এতে এত ভাবাভাবির কি আছে।

—তা ওই জানে। তবে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে তো, সেই জন্যই......।

—মায়ের স্নেহ ভালোবাসা বলতে গেলে ওর কাছ থেকেই পেয়েছে। তাই...।

তারপর জুলিয়েট আবার বলে, তবু মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ওকে আপনার কাছে রাখতে দেওয়া উচিত। ও নয় প্রতি উইক-এণ্ডে গিয়ে বাচ্চাকে দেখে আসবে।

—আপনি ভালো কথা বলেছেন।

—ঠিক আছে। আমি নয় ওকে বুঝিয়ে বলবো।

—তাহলে তো খুব ভালো হয়। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

—না। না। এতে ধন্যবাদের কি আছে! শিক্ষায়ত্রী হিসেবে আমার ও তো ছাত্রীর প্রতি কিছু কর্তব্য আছে।

—তাতো ঠিকই, কিন্তু অনেকে তো......।

—আমি সে দলে নেই।

—তাই আপনাকে আর একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—বার বার ধন্যবাদের কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না।

—ওটা আপনার প্রাপ্য।

—কি যে বলেন।

—এবার আপনাকে একটা অনুরোধ করবো।

—বলুন।

—মানে বাচ্চা আমার কাছে থাকলে আপনাকে কিন্তু কষ্ট করে আমার ওখানে যেতে হবে।

তারপর ডিনসমেড আবার বলে, আমি আপনার অসুবিধের কথা বুঝতে পারছি। আমার বাড়ি থেকে আপনার বাড়ি কিছুট দূরে। তবে সেটা আমি পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।

—তাহলে আপনার উপর কিছুটা বাড়তি চাপ পড়বে।

—তা অবশ্য ঠিক। তবু মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে এ কষ্ট

আমায় স্বীকার করতে হবে কি। আর মেয়ে হলো বরার্টের।

—এবার আর আমার কিছুই বলার নেই, আর আপনার বন্ধুপ্রীতি দেখে আমি মুগ্ধ। এবং সত্যি কথা বলতে কি, ওকে পড়াতে আমিও চাই।

—এতেই বোঝা যাচ্ছে, আপনি বাচ্চাকে সত্যি ভালোবাসেন।

—শিশু। তার উপর বাবা-মা নেই।

—সত্যি, মেয়েটার বড় দুর্ভাগ্য।

—তবে আর একদিক দিয়ে আবার সৌভাগ্যও বলতে হবে। যে, মিঃ রবার্ট আপনার মত বন্ধু পেয়েছিলেন বলে, আর মেয়েও তা থেকে বঞ্চিত হবে না।

পরের সপ্তাহে ডিনসমেড জোন্সের কাছে যাবার জন্য সময় করে উঠতে পারলো না। এ ক'দিন সে একবারে কাজের মাঝে ডুবে ছিল। কাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেনি।

সুশান ডিনসমেডকে তাড়া দিয়েছে, বলেছে, কই, জোন্সে কাছে গেলে না।

—হ্যাঁ, এ সপ্তাহে যাবো। আর গেলেই কি মেয়ে দে আমার তো তা মনে হয় না।

—একবার চেষ্টা করে দেখো। না দিলে আর কি করবে। পরের মেয়ে তো জোর করে নিজের কাছে নিয়ে আসা যায় না।

—তা তো ঠিকই।

—তা তুমি কবে যাবে?

—বললাম তো এ সপ্তাহে যাবো, তারপর ডিনসমেড একটু ভেবে বলে। তাইলে তো আজই যেতে হয়। এর মাঝে তো, দশ দিন পার হয়ে গেছে।

—তোমায় আমি তিন চার দিন মনে করিয়ে দিয়েছি। তুমি

তেমন গা করোনি।

—সত্যি, এ সপ্তাহে আজ যে শুক্রবার তা খেয়ালই ছিল না। তা তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

—যাবার ইচ্ছে তো আছে, কিন্তু গেলে বাচ্চা সামলাবে কে?

—তা অবশ্য ঠিক।

—তুমি একাই যাও।

—অগত্যা।

তারপর ডিনসমেড গাড়ি নিয়ে রবার্টের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এরপর পথে একটা খেলনার দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কয়েকটা খেলনা কিনে নিয়ে পাশের স্টেশনারী দোকান থেকে কিছু চকোলেট ও ক্রিম বিস্কুট কিনে নিয়ে আবার গাড়ি স্টার্ট দেয়। এবং মিনিটে দশেকের মধ্যে রবার্টের বাড়ি পৌঁছে যায়।

তারপর ডিনসমেডের জন্য যে এক বিস্ময় অপেক্ষা করছে, তা সে ভাবতেই পারেনি, আর ভাববেই বা কেমন করে।

নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়ায় ডিনসমেড। দেখে দরজা বন্ধ। দরজায় তাল ঝুলছে।

ডিনসমেড ভাবলো, হয়তো বাচ্চা নিয়ে জোন্স কোথাও বেড়াতে গেছে। একটু পরেই হয়তো ফিরে আসবে। তাই কাউকে আর জিজ্ঞেস না করে সে অপেক্ষা করতে থাকে।

মিনিট দশেক পার হয়ে গেছে। ডিনসমেড হাত ঘড়ির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সিগারেট ধরায়। এই ভাবে সে তিনটে সিগারেট শেষ করলো। তবু জোন্সের দেখা নেই।

ইতিমধ্যে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। তবুও জোন্সের ফেরার কোন লক্ষণ নেই।

ডিনসমেডের যেন কি রকম সন্দেহ হতে থাকে। তবে সবার আগে মনে হয়, বাচ্চা ভালো আছে তো। না, তার আবার শরীর খারাপ। তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে।

এই রকম নানা আবোল তাবোল চিন্তা ডিনসমেডকে উত্তেজিত করে তোলে। তবে বাচ্চার কিছু হলে তার আফসোসের অন্ত থাকবে না। লোকে বলতে ছাড়বে না যে, মা-বাপ মরা সন্তানটা এ ভাবে চলে গেল! বাবা-মা মারা গেলে সবাই পর হয়ে যায়।

আরো আধ ঘণ্টা পার হয়ে যেতে ডিনসমেড অধৈর্য হয়ে পড়ে। শেষে আর থাকতে না পেরে নিচে নেমে আসে।

এক তলায় মিঃ হেনেস থাকে। অবসরপ্রাপ্ত একজন সরকারী অফিসার! এই হেনেস পরিবারের সঙ্গে রবার্টই ডিনসমেডের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

কলিং বেলের আওয়াজ হতে মিসেস হেনেস বেরিয়ে আসে। হাতে জলের দাগ। সম্ভবত কিচেনে কাজ করছিল।

—গুড মর্নিং মিসেস হেনেস।

—গুড মর্নিং মিঃ ডিনসমেড।

—আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।

—নট আট অল। বলুন কেমন আছেন?

—ভালো। আপনি?

—চলে যাচ্ছে আর কি!

—জোন্স কোথায় গেছে জানেন? অ্যাপার্টমেণ্টে তালা দেওয়া দেখছি। ডিনসমেডকে বেশ চিন্তিত দেখাতে থাকে।

—জোন্সের কোন খবর জানেন না?

—না।

—সে কি!

—কেন?

—আমি তো জানি আপনি সব জানেন। অন্তত জোন্স আমায় সেই কথাই বলেছে। এবং মিঃ হেনেসকে ও তাই।

—ও কি বলেছে।

—চলে যাচ্ছে।

—কোথায়? ডিনসমেড বিস্ময় হতবাক।

—কি যেন একটা নাম বললো।

—মিঃ হেনেস জানেন?

—না আর জোন্স অ্যাপার্টমেন্ট বেচে চলে গেছে।

—কবে? কথাটা যেন ডিনসমেড বিশ্বাস করতে পারে না।

—দিন পাঁচেক আগে।

—কাকে বেচেছে জানেন?

—হ্যাঁ।

—কাকে?

—মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে।

—তিনি, কোথায় থাকেন?

—শুনেছি, এই শহরের উত্তর দিকে থাকেন।

—তিনি কি এখানে থাকতে আরম্ভ করে দিয়েছেন?

—না তার ফ্যামিলি কাল আসবে। তবে মাল-পত্তর সব এসে গেছে। আর সামান্য কিছুই বাকি।

—কততে বেচেছে জানেনা?

—আমায় তো বলেছে, চল্লিশ হাজার টাকায়।

—মাত্র?

—আমায় তো তাই বলেছে, কিন্তু……।

—কিন্তু কি?

—আমি ভাবছি ও এসব বেচে দিল, অথচ আপনি কিছুই জানতে পারলেন না।

—মনে পাপ থাকলে কি আর অপরকে জানায়।

—তা অবশ্য ঠিক।

—বাচ্চাকে কি করেছে জানেন?

—দেখলাম তো সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

—কিন্তু কোথায় যেতে পারে। দেশের বাড়ি গেছে?

—তা আমি জানি না।

—আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেনে ?

—বলেছে, আমি গেলাম, আর জায়গাটার নাম, করতে পারছি না। এবং বাচ্চাকে ওখানে একটা কনভেন্টে ভর্তি করিয়ে দেবে তারপর ওর কপালে যা থাকে।

—ঠিক আছে, চলি।

—আসুন।

ছয়

ডিনসমেড এখান থেকে বেরিয়ে শহরের যে ক'টা কনভেন্ট স্কুল আছে তার সব ক'টাতেই খোঁজ নেয়, কিন্তু তার খোঁজাই সার হলো। এর একটাতেও বাচ্চার হদিস মিললো না। তারপর এক সময় সে ব্যর্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এবং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে।

হঠাৎ ফোন আসতে ডিনসমেড সোজা হয়ে বসে রিসিভারটা তুলে নেয়। রঙ নাম্বার, তারপর সে বিরক্ত ভাবে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

তারপর অবশ হাতে ডিনসমেড রিসিভারটা তুলে নিয়ে মিস জুলিয়েটের উদ্দেশে ডায়াল করতে থাকে। এরপর এক সময় লাইন পেয়ে যায়।

—হ্যালো।

—হ্যালো মিস জুলিয়েট, কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

—আমি ডিনসমেড।

—বলুন মিঃ ডিনসমেড, খবর কি? বাচ্চা কেমন আছে?

—বাচ্চার কোন খবর জানি না।

—মানে এখনো বাচ্চা নিজের কাছে আনেননি বুঝি?

—হ্যাঁ

—আর আপনার কথা শুনে আমি রীতিমতন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

—আমার পরের কথা শুনে আপনি ঘাবড়ে যাবেন।

—ঘাবড়ে যাবো ?

—হ্যাঁ।

—তা কথাটা কি ?

জোন্স অ্যাপার্টমেন্ট সহ ফার্ণিচার বেচে দিয়ে মেয়ে নিয়ে উধাও হয়েছে।

—পালিয়েছে ? জুলিয়েটের গলায় বিস্ময়ের সুর বেজে ওঠে।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমার কথা শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন।

—বলুন।

—এই মাত্র ওর ওখান থেকে অফিসে ফিরে এসে আপনাকে ফোন করছি।

—কোথায় গেছে তা কেউ বলতে পারছে ?

—না।

—মিসেস হেনেসকেও কিছু বলেনি ?

—সে বলতে পারছে না, আর তাকে বলেছে, বাচ্চাকে শহরের একটা কনভেন্ট দেবে।

—তাহলে দেখা মিলতে পারে।

—সে গুড়েও বালি।

—কেন ?

—আমি আশেপাশের সমস্ত কনভেন্টগুলোতে খোঁজ খবর নিয়েছি। ও মিথ্যে কথা বলেছে।

—অথচ বাচ্চাকে আপনার কাছে দেবে বললো।

—আর আমি তো সেই ভেবে বাচ্চাকে আনতে গেয়েছিলাম।

—কিন্তু, বাচ্চাকে মানুষ করবে কি করে।

—আমিও ঠিক একই কথা ভাবছি।

—একটু ভালোভাবে মানুষ করতে গেলে টাকা চাই, সে-ও পারে কোথায়। তাছাড়া, গাইডেন্স ?

—টাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

—মানে।

—অ্যাপার্টমেণ্ট বেচে চল্লিশ হাজার টাকা পেয়েছে।

—কাকে বেচেছে তা কিছু আপনি জানতে পেরেছেন ?

—হ্যাঁ কি ম্যাগডোনাল্ড নামে এক ভদ্রলোকের কাছে।

—কবে

—তাও দিন পাঁচেক হয়ে গেছে।

—ও।

—আমি এখন কি করবো ভাবছি। স্ত্রী শুনলে আপসেট হয়ে পড়বে।

—পড়ারই তো কথা। নেহাৎ আপনি বন্ধুর মেয়ে বলে দেখা-শুনোর ভার নিতে গেয়েছিলেন, অথচ……।

—জানেন, আমি এখনো ভাবতে পারছিনা যে, জোন্স বাচ্চা নিয়ে পালিয়েছে।

—আমারও ঠিক আপনার মত একই অবস্থা।

—আমি কি থানায় যাবো ?

—থানায় গিয়ে কোন ফল হবে বলে আমার মনে হয় না।

—কেন ? পুলিশ ওদের খুঁজে বার করবে।

—কেমন করে ?

—তাও তো বটে, ওদের ছবি তো আমার কাছে নেই। আপনার কাছে আছে ?

—উঁহু।

—তাহলে তো মুশকিল হলো।

—তবে একটা ডায়েরী করে রাখতে পারেন।

—তাই করি, অথচ জোন্স যে এই ভাবে ডোবাবে……।

—অথচ গেলে কত ভালো ব্যবহার করতো, কথায় কথায় চা কফি নিয়ে আসতো। আর সব সময় বাচ্চার কথা ওর মুখে লেগে থাকতো। এবং সেই বাচ্চার ক্ষতি করার জন্যে ও আজ উঠে পড়ে লেগেছে।

—সত্যি, আমি ও বাচ্চার কথা ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

—ও বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে, আর জোন্স এক সঙ্গে তত টাকা হাতে পেয়ে হয়তো বেপরোয়া জীবন শুরু করে দেবে।

—আমারও সেই একই চিন্তা হচ্ছে, আর আপনাকে যে টিচার রাখবো বলে কথা দিয়েছিলাম, তারও খেলাপ হলো।'

—আপনি আর কি করবেন, এবং আমার দুর্ভাগ্য যে, এমন একটা সুন্দর বাচ্চার পড়াবার ভার পেয়েও বঞ্চিত হোলাম।

—সবই ভবিতব্য, তাহলে ছাড়ি।

—হ্যাঁ, আর শুনুন কোন খবর থাকলে আমায় দয়া করে একটি বার ফোন করবেন।

—নিশ্চয়ই।

—হ্যালো!

—হ্যালো সুশান, আমি ডিনসমেড কথা বলছি।

—বলো। তা তুমি ফিরতে এত দেরি করছো কেন!

—হ্যাঁ, একটু পরেই ফিরছি, তারপর ডিসসমেড খবরটা জানাতে গিয়েও থমকে যায়। ভাবে, চট করে খবরটা ওকে জানানো ঠিক হবে না। ভালো খবর হলে তবু একটা কথা ছিল।

—আর দেরি করো না। তাড়াতাড়ি এসো, এদিকে আমি ছেলে মেয়েদের বলে রেখেছি। ওরা বারবার এসে বাচ্চার কথা জিজ্ঞেস করছে। তবে বাবা আসছে না কেন। তুমি বাবার কাছে আমাদের নিয়ে চলো। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে হচ্ছে।

—সুশান!

—বলো। থামলে কেন।

—খারাপ খবর আছে।

—তা খবরটা কি?

—জোন্সকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—আর বাচ্চা?

—সেও।

—তার মানে?

—ও বাচ্চা নিয়ে কোথায় চলে গেছে তা কেউ বুঝতে পারছে না।

—তুমি থানায় খবর দিয়েছো?

—না প্রথমেই ওরা ছবি চাইবে। তা আমার কাছে নেই। মিস জুলিয়েটও একই কথা বলেছে।

—তাকেও জানিয়েছো?

—হ্যাঁ।

—সে কিছু জানে না?

—উঁহু।

—মেয়েটা তাহলে এ ভেবে হারিয়ে যাবে?

—কি করবো বলো। আমার করার তো কিছুই নেই।

—জোন্স যে মেয়েটাকে নিয়ে পালালো এর পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে তোমার ধারণা।

—তা ওই জানে।

—অথচ তুমি জোন্সের কত প্রশংসা করতে।

—তখন তো এমন ছিল না।

—যাক্। তবু একটা ডায়েরী করে এসো।

—আচ্ছা।

সাত

—হ্যালো!

—হ্যালো! মিঃ ডিনসমেড, কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

—স্যার, আমি পিটার কথা বলছি।

—বলো কি খবর?

—স্যার, একটা খবর আছে।

—খবরটা দিয়ে আপনাকে হয়তো খুশী করাতে পারবো।

—তা খবরটা কি?

—স্যার, একটা তৈরি বাড়ির সন্ধান পেয়েছি।

—কোথায়?

—গ্রীন উডে।

—তুমি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছো!

—স্যার, আপনার সঙ্গে তা কখনো করতে পারি!

—তবে তোমায় গ্রীন উডে বাড়ি কে দেখতে বলেছে! ডিনসমেডের মেজাজ চিড় খেয়ে যায়। একবারে গ্রাম।

—স্যার, গ্রাম ঠিক, কিন্তু এমন সুন্দর বাড়ি শহরে পাবেন না। আর পেলেও তার দাম কম করে দু' তিন লাখ পড়ে যাবে।

—তা নয় বুঝলাম, কিন্তু আমি শহরের বাড়ির কথাই বলেছিলাম তা কি মনে আছে?

—স্যার, আছে বই কি এবং আমার চেষ্টারও ত্রুটি নেই।

—তাই দেখো, যদিও ডিনসমেড কথাটা বললো বটে তবে সে আর শহরে থাকতে চাইছে না। সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। আর

সারাক্ষণ রবার্টের চিন্তা তাকে মনমরা করে তুলেছে। তার উপর বাচ্চাটাও ঐ ভাবে চলে গেল।

—আচ্ছা স্যার।

তারপর ডিনসমেড কি ভেবে বলে, তা ঐ বাড়ির দাম কত চাইছে?

—ষাট হাজার টাকা, বলে পিটার বাড়ির সব বিবরণ দিতে থাকে। ঐ টাকায় পুরো একটা বাংলো বাড়ি পেয়ে যাবেন। তিন তিনটে শোবার ঘর। বৈঠকখানা, কিচেন, ডাইনিং স্পেস। সামনে বাগানও আছে।

ডিনসমেড পাছে সরাসরি তাকে না বলে দেয়, তাই পিটার তাকে কিন্তু বলার সুযোগ না দিয়ে ফের বলে, বলুন স্যার সস্তা কিনা?

—পঞ্চাশ হলে ভালো হতো।

—স্যার, আপনার অফার তাকে জানাবো।

—তবে গ্রামে থাকতে ঠিক মন চাইছে না।

—স্যার, ওখানে কোন অসুবিধে হবে না সব আছে। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসে তবেই আপনাকে এ কথা বলছি। আমার কথা আপনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন।

—তা দেখেছো যখন তখন বলো ওখানে সুবিধে অসুবিধে তা আছে? বাড়িয়ে বলবে না যেন।

—স্যার, বাড়িয়ে বলা অধর্ম। এ শর্মা তা কোনদিন করে না।

—ঠিক আছে, যা আছে তাই বলো!

শুনুন স্যার বলে পিটার একটা লম্বা ফিরিস্তি দিলো, যার সুবিধেই বেশী, আর অসুবিধে নামে মাত্র।

—যাক্, সব শুনলাম। তবু তুমি শহরের বাড়ির চেষ্টাও চালিয়ে যাও। শহর শহরই।

—তা তো ঠিকই স্যার। তবে আপনি একটু নিরিবিলি চেয়েছিলেন বলে ওখানের বাড়িটা দেখতে গেয়েছিলাম।

—নিরিবিলি?

—হ্যাঁ স্যার। ওখানকার মত মুক্ত বাতাস, পাখির ডাক, অদূরে পাহাড় এসব কোথায় পাবেন। আর এখানে তো প্রাণ ভরে নিঃশ্বাসও নেওয়া যায় না। ওখানে ঠেলাঠেলি, নোংরা, বিষাক্ত হাওয়া ওসব কিছুই নেই। টাটকা বাতাস চারদিকে।

তারপর পিটার বলে, স্যার এই রোববার বাংলোটা একবার দেখে আসবেন নাকি। স্যার দেখলে চোখ ফেরাতে পারবেন না।

—দাঁড়াও, তার আগে মিসেসের সঙ্গে কথা বলি। সে রাজি না হলে তো কিছুই হবে না।

—সে স্যার, ঠিকই। ঠিক আছে, কাল আমি আবার আপনাকে ফোন করবো।

—আচ্ছা। তাই বলে যেন আবার শহরের বাড়ির কথা ভুলো না।

—সে কি কখনো হয় স্যার? তাহলে ছাড়ি স্যার।

—ঠিক আছে।

নিরিবিলি? কথাটা ডিনসমেডের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। কথাটা যেন চুম্বকের মত তার মাথায় আটকে যায়। সত্যি সে নিরিবিলিতে থাকতে চায়। এই লোকালয়ের বাইরে।

ডিনসমেডের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। ভাবে, রবার্টের অকাল-মৃত্যুই তাকে এ সব চিন্তা করাতে বাধ্য করিয়েছে। অথচ রবার্ট বেঁচে থাকতে সে পিটারকে বলেছে, দেখো তো, আমার বন্ধুর আশে পাশে কোন তৈরি বাড়ি পাও কি না, যাতে আমি বন্ধুর সঙ্গে আরো বেশী করে যোগাযোগ রাখতে পারি। আর

এখন বন্ধুর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলবার জন্য সে এখান থেকে পালাতে ব্যস্ত। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। আর রবার্টের চিন্তা যখনই তার মনের মাঝে হানা দেয় তখন সে বুকের মাঝে একটা ব্যথা অনুভব করে, যা সহজে কমে না।

ডিনসমেড রবার্টকে ভুলে যেতে চায়। ভাবে, ও তো আর ফিরে আসবে না। শুধু শুধু ওর জন্য এ ভাবে দুঃখ করে লাভ কি। তাই সে কাজের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়।

কিন্তু স্মৃতি? স্মৃতির হাত থেকে তো কারুর রেহাই নেই। সেই স্মৃতি তাকে এক দণ্ডের জন্য চুপ করে বসে থাকতে দিচ্ছে না। এক জায়গা থেকে যেন আর এক জায়গায় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। উঃ, এ যেন আর সহ্য করা যায় না। আগে ডিনসমেডের এক ঘুমে রাত ভোর হয়ে যেত। এখন এপাশ ওপাশ করার পর যাও বা কিছুটা ঘুমোতে পারে, তারপর তার ঘুম ভেঙে যায়। এরপর বার বার চেষ্টা করেও আর ঘুমোতে পারে না। দেয়ালঘড়ির টিক টিক শব্দটা যেন তাকে অনেক কথা বলতে চায়। তার যেন একান্ত দোসর হয়ে ওঠে।

শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে রবার্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দৃশ্য ডিনসমেডের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তখন যেন রবার্ট তাকে হাত ইশারা করে কাছে ডাকে। শুধু যেন ডেকেই ক্ষান্ত হয় না। হাতটা তার দিকে বাড়িয়ে দেয়। সে হাতটা তখন বীভৎস দেখায়। অথচ সুপুরুষ রবার্টের হাত মেয়েদের মত সুডোল।

এ দৃশ্য দেখে এক আধ দিন মাঝ রাতে ডিনসমেড চিৎকার করে ওঠে। তা দেখে সুশান ভয় পেয়ে যায়। শেষে স্বামীকে জল খাইয়ে সুস্থির করে।

এই সব ঘটনার পর থেকে ডিনসমেড এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র সরে পড়ার চেষ্টায় আছে এবং সেই মত সে পিটাকেও বলেছে।

ডিনসমেড যে ভয় পেয়ে এ সব কাণ্ড কারখানা করছে তা ঠিক

নয়। আসলে সে রবার্টকে নিয়ে বেশী ভাবে বলেই অবচেতন মনে এই রকম নানা ধরনের চিন্তা দেখা দেয়। সুতরাং ওসবের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে বোধ হয় গ্রামের বাংলো বাড়িই শ্রেয়।

অন্য দিনের তুলনায় ডিনসমেড আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে। সুশান তাতে খুশী। সে স্বামীকে ফ্রেস হাত বলে কফি আনতে চলে যায়।

একটু পরে সুশান কফি নিয়ে ফিরে আসে। এখন স্বাম-স্ত্রী মুখোমুখি বসে কফি পান করছে।

কফিতে চুমুক দিয়ে ডিনসমেড সুশানের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।

—জরুরী? সুশান কফিতে চুমুক দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্বামীর কথার ধরণ দেখে তা আর হলো না।

—হ্যাঁ।

—তা আলোচনা কিসের প্রসঙ্গে?

—বাড়ির।

—সত্যি, এ বাড়িতে আর থাকা যাবে না।

—হঠাৎ এ কথা বলছো।'

—সাধে কি আর বলছি।

—কিন্তু কেন সেটাই জানতে চাইছি।

—রজার লাঞ্চের পর এসেছিল। রাতে তোমার সঙ্গে দেখা করবে সে কথা বলে গেছে।

—ওকে ঠিক দোষ দিতে পারি না, ডিনসমেড এবার একটু শান্ত গলায় কথা বলে। ওর ছেলে আসবে বলে কথা।

—কিন্তু আমাদের অসুবিধেটাও উপেক্ষণীয় নয়।

—তা তো ঠিকই।

—তা তুমি কি বলছিলে যেন।

—পিটার একটা বাড়ির সন্ধান এনেছে।

—কোথায়?

—একটু গ্রামের দিকে।

—ওসব গ্রাম ফ্রামে গিয়ে থাকতে পারবো না।

—তোমার সঙ্গে আমিও এক মত, কিন্তু…।

—এর মধ্যে কোন কিন্তু ফিন্তু নেই।

—তোমার কথার যৌক্তিকতা আমি অস্বীকার করছি না, তবুও আমি একটা কথা বলছিলাম।

—বলো। তবে গ্রামের ব্যাপারে যেন কোন কথা না হয়। এতদিন শহরে থেকে কখনো গ্রামে গিয়ে থাকতে পারি।

—তোমার কথা ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিচ্ছিনা, কিন্তু সুশান, আমি এখানে থাকলে মরে যাবে।

—এসব কথা আসছে কোত্থেকে।

—রবার্টের ছায়া যেন আমায় সর্বক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বরার্ট আমায় কাছে পেতে চায়।

—ও সব অলক্ষুণে কথা মনে আনবে নাতো!

সুশান এ কথা বললো বটে, কিন্তু স্বামীর কথায় সে বেশ ভয় পেয়ে যায়। সেই সঙ্গে রাতের স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ে যায়। তারপর সে আর দাপটের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। ক্ষীণকণ্ঠে বলে, তোমার দিকটা যে আমি একবার বুঝতে পারছি না তা নয়, কিন্তু…।

—সুশান, আমি বুঝতে পারছি, তোমাদের গ্রামে গেলে একটু অসুবিধে হবে। শহরের বিলাসিতা থেকে অনেকটা বঞ্চিত হবে, কিন্তু এখানে থাকলে রবার্টের হাতছানি আমায় কোন অতলে তলিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যেন ওৎ পেতে রয়েছে।

—না! না! তুমি এসব কথা বলো না, সুশান আরো ভয় পেয়ে যায়। তা বাড়ির কোথায় পেয়েছো বলো?

—গ্রীনউডে।

—সে তো এখান থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে।

—হ্যাঁ।

—ওখানে স্কুল-টিস্কুল আছে?

—তা থাকবে না কেন! ওখানকার ছেলে-মেয়েরা কি পড়া-শুনা করে না।

—তা করবে না কেন! আর সব চেয়ে বড় কথা হলো, এত বড় একটা বাংলো বাড়ির দাম মাত্র ষাট হাজার টাকা চাইছে। বলে ওখানকার ঘর দোরের বিবরণ জানায়।

তারপর ডিনসমেড বলে, তাও আমি ষাট হাজারের রাজি হইনি।

—কত বলেছো?

—পঞ্চাশ হাজার।

—দেখো, আমি আর কি বলবো।

—না। তোমার মত না পেলে……।

—তোমার মতই আমার মত বলে ধরে নিতে পারো।

—তাহলে বাংলোটা একদিন গিয়ে দেখে আসি?

—ঠিক আছে।

—কবে যাবে?

—তোমার সুবিধে মত একদিন চলো।

—আচ্ছা সামনের রবিবার যাওয়া যেতে পারে।

—তাই চলো।

আট

সুন্দর সকাল। অথচ পরিষ্কার আকাশ দেখে কে বলবে গতরাতে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন তার লেশমাত্র কোথাও নেই।

চার্লস গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। উইক-এণ্ড হলেই সে কোথাও না কোথাও পাড়ি জমায়, তা সে যেখানেই হোক।

চার্লসের ঘোরা নেশা। এই ঘোরাই নাকি ওকে সারা সপ্তাহের রসদ যোগায়।

চার্লস অবিবাহিত। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছে। সুপুরুষ। লম্বায় প্রায় ছ'ফুটের কাছে। পেশীবহুল চেহারা। চওড়া কাঁধ। দুপুরের দিকে উত্তর আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ জমতে শুরু করে দিলো। চার্লসের যে সেদিকে নজর যায়নি তা নয়। সে গাড়ি চালাতে চালাতে ভেবেছে, ও মেঘ কেটে যাবে।

চার্লসের ধারনাই ঠিক হলো। সে মেঘ একটু পরে কেটে গেল।

তাবপর চার্লস একটা রেস্তোর'ার সামতে গাড়ি পার্ক করে লাঞ্চ সেরে নেয় এবং এখানেই কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে শহরের দিকে গাড়ি চালিয়ে দেয়। তবে এখান থেকে শহর অনেক দূরে।

এরপর যত এগোচ্ছে তত যেন চার্লস ঘাবড়ে যেতে থাকে। আকাশের রং পাল্টে গেছে। চারদিকে রাশি রাশি মেঘ সৃষ্টি হয়েছে। তার উপর আবার ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আকাশের একরূপ সাংঘাতিক গর্জন। সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাস।

চার্লস আকাশের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দ্বিগুণ গতিতে গাড়ি চালিয়ে চলেছে, কিন্তু তার পরই যত গণ্ডোগোল। একটু পরে তার

পক্ষে আর গাড়ি চালানো সম্ভব হলো না। তাকে গাড়ি থামাতে হলো।

চার্লস গাড়ি থামিয়ে নেমে এসে দেখে, পথের মাঝে একটা বিরাট গাছ ভেঙে পড়ে রয়েছে. এবং সে গাছ পথ থেকে 'না সরালে গাড়ি চালানো অসম্ভব। তারপর স্থানীয় লোকের সাহায্যে অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর সে গাছ সরানো সম্ভব হলো। ইতিমধ্যে ঘণ্টা দুয়েক পার হয়ে গেছে।

ওদের টাকা মিটিয়ে দিয়ে চার্লস আবার গাড়ি চালিয়ে দিয়ে ভাবে। এখন ভালোয় ভালোয় শহরে পৌঁছতে পারলে হয়। আকাশের হলে চাল মোটেই সুবিধের নয়। যে কোন মুহূর্তে তেড়ে বৃষ্টি নামতে পারে। আর একটু পরে নামলোও তাই।

তবুও তার মধ্যে ঝড়ের গতিতে চার্লস গাড়ি চালিয়ে চলেছে। আসলে যতটা পথ সে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। নইলে সমূহ বিপদ। তার উপর যা ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডায় তার হাত পা যেন বুকের মধ্যে শিঁথিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তার দু'দিকে পাহাড়ের সারি। অদূরে ঘন জঙ্গল। এইসব দেখে আর একবার আমার পরিকল্পনা চার্লস মনে মনে করেছিল। এখনকার মায়াবী পরিবেশ যেন তাকে ভুলিয়ে শহর থেকে এখানে টেনে নিয়ে গিয়ে তাণ্ডবপুরীর মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

তারপর হঠাৎই বৃষ্টিটা থেমে গেল। কিন্তু হাওয়ায় দপাট রয়েছে। চার্লস ভাবে, হাওয়া থাকে থাকুক। আর বৃষ্টি না হলে যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শহরে পৌঁছে যাবে। নইলে ঠাণ্ডায় কালিয়ে সে নির্ঘাৎ মরে যাবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। নইলে আবারই বা কেন বৃষ্টি শুরু হবে। শুধু তাই নয়। এবার সাংঘাতিক জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

বৃষ্টির তোড়ে গাড়ি যেন ফুটো হয়ে যাবে, আর দমকা বাতাসে

আবার গাড়ি না উড়িয়ে নিয়ে যায়। পরিস্থিতিটা সত্যিই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চার্লস লোকালয় থেকে বহু দূরে চলে এসেছে। একটা থেকে আর একটা বাড়ির দূরত্ব বেশ খানিকটা। তার উপর সন্ধ্যে হয়ে আসছে। বলা বাহুল্য, আজ অন্য দিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি দিনের আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে। এও যেন এক ধরণের শত্রুতা।

হঠাৎ ওয়াইপারটা কাজ করছে না। বিগড়েছে, তবু চার্লস হাত দিয়ে মুছে গাড়ি চালাতে থাকে। কারণ কোন মতেই এখন গাড়ি থামলে চলে না। আর ভাবে, বিপদ যখন আসে তখন যেন চারদিক দিয়েই আসে।

বৃষ্টি হয়েই চলেছে। থামাবার আর কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। উল্টে উত্তোরোত্তর বেড়েই চলেছে।

একটু আগে পিচের রাস্তা শেষ হয়ে গেছে। এখন কাঁচা মাটির রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। ফলে চার্লসকে গাড়ির গতি অনেকটা কমিয়ে দিতে হয়েছে। নইলে যে কোন মুহূর্তে পিছলে রাস্তার পাশের গভীর খাদে গিয়ে পড়বে।

এইভাবে মিনিট পাঁচেক গাড়ি চালাবার পর চার্লসকে পথের মাঝে থেমে পড়তে হয়। গাড়ি এখন আর যেন রাস্তায় চলছে না। ভেসে চলেছে। আর জলের তোড় যে ভাবে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, তা রাস্তার পাশের জলাভূমিতে গাড়ি না পড়লেই এক আশ্চর্য ব্যাপার হবে।

চার্লস গাড়ি থামিয়ে চুপটি করে বসে থাকে, কিন্তু এভাবে হাত পা গুটিয়ে থাকা যায় না। গেলে বিপদ অনিবার্য। কেউ রুখতে পারবে না

চার্লস কি করবে? একটা বুদ্ধি এখনই বার করতে হবে। নইলে একটু পরে চরম বিপদ ঘনিয়ে আসবে।

আবার চার্লস ভাবে, গাড়ি থেকে নেমেই বা কি করবে। আর

যাবেই বা কোথায়। আশেপাশে যতদূর চোখ যায় বসতির লক্ষণ সে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। চারদিকে শুধু জল আর জল। সে যেন নদীর বুকে নৌকোয় বসে আছে।

গাড়িতে শান্তিতে বসে থাকতে পারলে চার্লস অনায়াসে রাত কাটিয়ে দিতে পারতে। এভাবে কয়েকবার সে রাতও কাটিয়েছে। অবশ্য তখন পরিস্থিতি ছিল অন্য।

গাড়ি থেকে নামবে বললেই হলো! চার্লস মনে মনে বলে ওঠে। নেমে সে যাবেই বা কোথায়! বসতির চিহ্ন মাত্র কোথাও নেই। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথে ভিজতে হবে। তার উপর যা হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। আর বাতাস যেন গায়ে তীর ফুটিয়ে দিচ্ছে।

তারপর চার্লস গাড়ি থেকে নামবে না। মরতে হলে গাড়িতে বসেই করবে। এরূপর সীট থেকে হুইস্কীর বোতলটা তুলে নিয়ে বেশ খানিকটা হুইস্কী খায়। তবু যেন শীতটা যায় না।

তবে চার্লস এখন খানিকটা তাজা বোধ করছে। মনেও খানিকটা আমেজ এসেছে। তবু বিতৃষ্ণা ভাব মনে থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছে না।

চার্লস আবার গাড়ি স্টার্ট দেয়। গাড়িটা খানিকটা চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। ইঞ্জিনে জল ঢুকে গেছে। আর গাড়ি চলবে না। তবুও চার্লস কয়েক বার গাড়ি স্টার্ট দেবার চেষ্টা করে। গড় গড় শব্দ করে থেমে গেল। যদিও সে বুঝলো আর গাড়ি চলবে না, তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখলো। ফলাফল সেই একই। তাহলে এখন উপায়? চার্লস ভাবে। আশে পাশে কোথায় গাড়ির কারখানা তাও সে জানে না। আর এই আবহাওয়ায় মেকানিকের আসতে বয়ে গেছে। মোটা টাকার লোভ দেখালে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু পাচ্ছে কোথায়? তারপর তো টাকার প্রশ্ন আসছে।

চার্লস হঠাৎ দেখে, গাড়ি চলতে শুরু করে দিয়েছে অথচ গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ, সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝলো গাড়ি জলের তোড়ে ভেসে চলেছে।

চার্লস আর কিছু ভাবতে পারে না। তারপর গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির মাডগার্ড আঁকড়ে ধরে গাড়ির গতি রোধ করার চেষ্টা করে। তারপর বেশ খানিকটা কসরৎ করার পর গাড়ির গতিরোধ করতে সক্ষম হলো। তারপর একটা নাইলনের মোটা দড়ি গাড়িতে ছিল। সেটা দিয়ে কোন রকমে গাড়িটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ওভারকোট দিয়ে মাথা ঢেকে সে সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

এই ভাবে চার্লস মিনিট দশেক জলের মধ্যে ছপ ছপ করে হাঁটার পর অদূরে একটা অস্পষ্ট আলোর রেখা সে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে তার চলার গতি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কারণ সে যেন শীতে জমে যাচ্ছে। এখন কোন একটা আশ্রয় না পেলে নির্ঘাৎ মরে যাবে। কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। ওদিকে পকেটের হুইস্কীও শেষ। তাতে এক ফোঁটাও পড়ে নেই। সে রাগে বোতলটা সামনের দিকে ছুড়ে মারে।

হ্যাঁ, চার্লস ঠিকই দেখেছে। ওটা একটা বাংলো ধরণের বাড়ি। ভাবে যেন একটা পেতপুরী। নইলে এই জায়গায় এ ধরনের বাড়ি কখনো হতে পারে।

চার্লস রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির দিকে তাকায়। প্রায় সাতটা বাজে।

চার্লস প্রায় বাড়িটার কাছে চলে এসেছে। আর হাত দশেক কোন রকমে যেতে পারলেই হয়। তবু ভারি আর শীতে জমে যাওয়া অবশ শরীরটাকে যেন সে আর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারছে না। এভাবে আসতে সে বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডায় সে যেন ঠক ঠক করে কাঁপছে।

দরজার সামনে এসে চার্লস কলিং বেলটা হাতড়াতে থাকে, কিন্তু বেলটা কোথায়? অবশেষে সে বেলটা খুঁজে পায়।

হঠাৎ বেলটা বেজে উঠতে ডিনসমেড একটু হকচকিয়ে যায়।

সে ডিনার টেবিলে বসে ব্যবসা সংক্রান্ত একটা কাগজ দেখছিল।

তার অবাক হবার কারণ এই ঝড়জলের রাতে কে আবার বেল বাজাচ্ছে। এমন করে কেউ তো কখনো বাজায় না।

ডিনসমেডের কাছে জর্জ বসে আছে। সেও চমকে বাবার দিকে তাকায়। ভাবে কে বেল বাজাচ্ছে।

কিচেন থেকে সুশান এক রকম দৌড়ে এসে ডিনসমেডকে বলে, বাইরে মনে হচ্ছে কে যেন বেল বাজাচ্ছে।

—আমারও তাই মনে হলো, ডিনসমেড আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে।

—কে আবার আসতে পারে।

—আমিও তো তাই ভাবছি।

—মামী, আমি গিয়ে দরজা খুলবো। জর্জ মায়ের দিকে তাকায়।

না! না! সুশান প্রায় হিস্টিরিয়া রোগীর মত চিৎকার করে ওঠে।

—কেন মা?

—তার আগে আর একবার বেলের আওয়াজ শুনি।

আর তখনই বেলটা আবার বেজে উঠলো এবং বেশ জোরে।

—মামী, গিয়ে খুশি?

সুশানকে কথা বলতে না দিয়ে ডিমসমেড বলে, কোন অশরীরি আত্মা নয়তো।

—সে আবার কি কথা। সুশান স্বামীর দিকে তাকায়।

—হয়তো রবার্টের।

—আঙ্কেল তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে, জর্জ হেসে বলে। তোমার যত কথা।

—হতেও তো পারে? ডিনসমেড কথাটা যেন ফিসফিস করে বলে।

—আমি গিয়ে দরজা খুলছি, জর্জ দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

জর্জ! সুশান কতকটা চেঁচিয়ে ডাকে।

ওদিকে ডিনসনেড বাধা দিতে পারলো না। সে যেন নির্জীব ভাবে বসে রইলো।

—নিশ্চয়ই কেউ বিপদে পড়েছে, জর্জ দরজার কাছে এগিয়ে যায়।

তারপর জর্জ দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঁপা গলার আওয়াজ ভেসে আসে, ভেতরে আসতে পারি।

—নিশ্চয়ই। আপনি যে একবারে ভিজে নেয়ে গেছেন।

—পথের মাঝে গাড়িটা বিগড়ে গিয়েই এ বিপত্তি।

এরি মধ্যে বাবা মায়ের কাছে মেরী এবং শার্লেট হাজির। ওরা এতক্ষণ কিচেনে মাকে সাহায্য করছিল। মা কিচেন থেকে এভাবে ছুটে আসতে ওরা আর ওখানে থাকতে পারেন নি। ডিনসমেড আর বসে থাকতে পারে না। গৃহকর্তা হিসেবে এখন তার অনেক কর্তব্য রয়েছে। তারপর লোকটি যেখানে বিপদে পড়েছে।

—এসে ফায়ার প্লেসের কাছে বসুন, ডিনসমেড ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজ পত্তর টেবিলে রেখে চার্লসের দিকে এগিয়ে যায়।

আপনাকে অসেক ধন্যবাদ। চার্লাসের এখনো কাঁপা থামেনি।

—আরে এতে ধন্যবাদের কি আছে। ডিনসমেড লজ্জিত ভাবে বলে। আজ আপনি বিপদে পড়েছেন, কাল আমিও পড়তে পারি।

ততক্ষণে জর্জ একটা বাড়তি চেয়ার ডাইনিং টেবিল থেকে নিয়ে ফায়ার প্লেসের কাছে রাখে, আপনি এতে বসুন।

—ধন্যবাদ ভাই।

ফায়ার প্লেসের কাছে বসে এখন চার্লস হাত দুটো আগুনের গনগনে আঁচে বাড়িয়ে দেয়।

—আপনার পরিচয়টা জানা হলো না? ডিনসমেড চার্লসের দিকে তাকায়।

সুশান আর দু' মেয়েও একই কথা জানতে চাইছিল। বাইরে

থেকে একটা অজ্ঞাত কুলশীল লোক হুট করে ঢুকে পড়লো। তার সম্বন্ধে তো কিছু খবরা-খবর নেওয়া দরকার। তার উপর দিন কালের যা অবস্থা।

—আমার নাম চার্লস বোভারী।

—কোথায় থাকেন?

—পাম এভিনিউতে।

—তা এদিকে কোথায় এসেছিলেন?

—নিছক ঘুরতে।

—এভাবে বুঝি বের হন?

—হ্যাঁ, তা বলতে গেলে প্রায় উইক এণ্ডে বের হই।

—তা হলে ঘোরা আপনার নেশা, কি বলুন?

—হ্যাঁ, তা কতকটা বলতে পারেন।

হঠাৎ একটা জিনিষের দিকে নজর পড়তে সুশান বলে ওঠে শার্লট!

শুধু নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে শার্লট দ্রুত ভেতরে চলে যায় এবং তার যাওয়ার মধ্যে একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে ওঠে। শার্লটের চলে যাওয়াটা চার্লস দেখলো। যুবতী নারীর দিকে বারে বারে তাকানো যায় না। ফলে সে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার ডিনসমেডর দিকে তাকায়।

আপনাকে একটু ব্রাণ্ডি দিতে বলি। ডিনসমেড চার্লসের দিকে তাকায়।

—তাহলে তো খুব ভালো হয়। চার্লস যেন কৃতার্থ। সত্যি আপনাদের আশ্রয় না পেলে...।

—কিছু হতো না। আর কোথাও পেয়ে যেতেন।

—এখানে আপনার বাড়ি ছাড়া তো আর কোন বাড়িই নজরে এলো না।

—হ্যাঁ, কাছে পিঠে আর নেই।

ইতিমধ্যে মেরী ব্রাণ্ডি ভর্তি পানীয় চার্লসের দিকে তুলে ধরেছে, এই নিন।

মেরীর হাত থেকে পানীয় নিতে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চার্লস তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাত বাড়িয়ে পানীয় নিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বললে ধন্যবাদ।

ব্রাণ্ডি পান করে চার্লস কিছুটা চাঙ্গা বোধ করছে। এবং মনে মনে ডিনসমেডের আতিথ্যের জন্য বার বার প্রশংসা করে চলেছে।

—এই দেখুন, কি ভুলো মন, ডিনসমেডের লজ্জা পেয়ে যায়। আপনি এখনো ভিজে জামা কাপড়ে রয়েছেন।

—ঠিক আছে, চার্লস সত্যি লজ্জা পেয়ে যাচ্ছে।

—তা বললে কি কখনো হয়। এই ভিজে জামা কাপড় গুলো না ছাড়লে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, সেই সঙ্গে আমিও লজ্জায় মরে যাবো। আর আমার আপনার সাইজ সামান্য উনিশ বিশ। এক রাত একটু কষ্ট করে আমার পোশাক পরে চালিয়ে দিন।

ইতিমধ্যে শার্লট ফিরে এসেছে এবং ও ফিরতে মা ও বাবা দু'জনেই তার দিকে তাকালো।

হঠাৎ চলে গিয়ে শার্লট আবার ফিরে এসেছে দেখে চার্লস খুশী। দু'বোনের মধ্যে শার্লট সুন্দরী।

এরপর ডিনসমেড মেরীর দিকে তাকিয়ে বলে, মেরী তুমি মিঃ চার্লসকে বাথরুমটা দেখিয়ে দাও।

—আসুন আমার সঙ্গে, মেরী চার্লসকে আহ্বান জানায়।

—অগত্যা, চার্লস একটু কুণ্ঠার সঙ্গে কাঁচের গ্লাসটা টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ায় এবং মেরীকে অনুসরণ করে।

বাথরুম থেকে পোশাক পাল্টে এসে চার্লস আর ডিনসমেড ডিনার টেবিলে মুখোমুখি বসেছে।

দু'একটা মামুলী কথাবার্তার পর ডিনসমেড বললো, আপনার

নেশার কথা তো জানা গেল কিন্তু পেশাটা...।

—পেশায় আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার।

—জানেন, আমারও ইঞ্জিনিয়ার হবার শখ, জর্জ ও ওদের কথার মাঝে বলে ওঠে।

চার্লস জর্জের দিকে তাকায়। রোগা ছিপছিপে গড়ন। কটা চোখ, মাথার চুল ধূসর। বয়স ষোল হবে।

—ভালো কথা, চার্লস মাথা নাড়ে।

—আমি এখানে একটা ছোট ল্যাবোরেটরী তৈরী করেছি।

—ভেরি গুড। যাবার সময় দেখে যাবো।

—আর আমি হোলাম গিয়ে পেশায় কনট্রাকটার, ডিনসমেড বলে।

—কিসের?

—বাড়ির। অথচ আমার নিজের আর বাড়ি করা হলো না।

—এটা?

—কিনেছি।

—আচ্ছা, এখান থেকে শহর কত দূর?

—ত্রিশ চল্লিশ মাইল হবে।

—বলেন কি?

—হ্যাঁ, তা তো হবেই।

—আপনার ছেলে কোথায় গিয়ে পড়াশুনো করে?

—এই গ্রামের শেষের দিকে স্কুল কলেজ আছে। সেখানে গিয়ে কষ্ট করে পড়ে আর কি।

—বাজার হাট?

—টিন ফুড ভরসা।

—বলেন কি?

—পাওয়া যখন যায় না তখন আর উপায় কি বলুন।

—মাংসওয়ালাই সপ্তাহে মাত্র একদিন দোকান খোলে, মেরী

বলে, এবং তার কথার মধ্যে একটা অসুখী ভাব ফুটে ওঠে।

—তাই নাকি? চার্লসের বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

—হ্যাঁ।

—কে বলুন তো টিন ফুডের সৃষ্টি করেছিল? ডিনসমেড চার্লসের দিকে তাকায়। তাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে কিছুতেই থাকতে পারছি না।

—ঠিক বলতে পারবো না। চার্লস মুখে লাজুক হাসি।

হঠাৎ ডিনসমেড কথা বলে ওঠায় চার্লস মেরীর দিকে ভালো করে লক্ষ্য করতে পারেনি। এবার তাকালো। মেরীর বয়স আঠারো হবে। মাথায় একরাশ জর্জের মত ধূসর চুল। স্লীম ফিগার। পরণে ম্যাক্সি। কটা চোখ।

ওদিকে সুশান আর শার্লট ডিনার সাজাতে ব্যাস্ত। তারই ফাঁকে চার্লস এক নজর শার্লটকে দেখে নেয়।

শার্লট সুন্দরী, বয়স সতেরো হবে, নীল চোখ, মাথার চুল ধূসর এবং মেরীর মত লম্বা।

তারপর এক সময় ওরা ডিনারে বসলো। ডিনারে বসে খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামুলী কিছু কথাবার্তা হলো এবং তখনই ঠিক হয় কোণের ঘরটা যেটা রাস্তার কাছে সেখানে চার্লস থাকবে।

একটা রাতের মত ব্যবস্থা হওয়ায় চার্লস খুশী এবং কি বলে সে ডিনসমেড দম্পতীদের প্রসংসা করবে তার ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছে না। তার উপর সে ইঞ্জিনিয়ার মানুষ।

তারপর ডিনসমেডের কথা মত চার্লস কোণের ঘরে শুতে গেল। তাকে ঘরের সব কিছু দেখিয়ে দেবার জন্য দু'বোন ও এসেছে। তাতে সে খুশীই।

শার্লট বললো, ঘরের সঙ্গে বাথরুম রয়েছে।

কথা তো নয় যেন মুক্ত ঝরছে, চার্লস তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে শার্লটের দিকে তাকাল।

—ধন্যবাদ। কিন্তু ম্যাডাম আপনার এখনো নামটাই জানা হলো না।

—শার্লট ডিনসমেড। শার্লট মিষ্টি করে হেসে জবাব দেয়।

—আর এই অধমের নাম……।

—শুনেছি।

—সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ থেকে ভগবান বঞ্চিত করে রেখেছে।

—টেবিলে আপনার জন্য জল ঢাকা রয়েছে, মেরী চার্লসের দিকে তাকায়। তবে টেবিলটা কিন্তু খুব একটা পরিষ্কার করতে পারিনি, কিছুটা নোংরা রয়ে গেছে।

—যা করেছেন তাই যথেষ্ট। চার্লস মেরী দিকে তাকায়। আপসার নামটাও অজানা রয়ে যাচ্ছে।

—মেরী ডিনসমেড।

—দু'অক্ষরের ছোট্ট সুন্দর নাম। তারপর চার্লস বলে আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি।

আমরা দু'বোন ততক্ষণ বিছানা আর একটু ঠিকঠাক করে রাখি। এরপর ওরা চলে গেছে। চার্লসও ক্লান্ত, সে দেহের ভার আর বইতে পারছে না। সে বিছানায় শুতে যাবার আগে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ায়, আর তখনই সে চমকে ওঠে।

চার্লস সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে। গ্লাসের দিক থেকে নিমিষের মধ্যে হাতটা টেনে নেয়। ভাবে এটা কে লিখলো কার লেখা হতে পারে?

চার্লস ভালো করে লেখাটার দিকে তাকাতে থাকে এবং এ ধরণের লেখার অর্থই বা কি আর লেখার কিই বা উদ্দেশ্য হতে পারে! এবং এর পিছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে।

চার্লস আমার লেখাটার দিকে তাকায়। টেবিলের ধুলোর উপর লেখা রয়েছে—এস. ও. এস.। অর্থাৎ সেভ আওয়ার সোল।

কার বা কাদের। এবং এত কথা থাকতে এ লেখা লেখার কিইবা হেতু থাকতে পারে। সে এর চুল চেরা বিচার করতে গিয়ে শুধু বার-বার ক্ষত বিক্ষত হয়ে চলেছে।

আর ভাবতে পারে না। একেই চার্লস ক্লান্ত। অবশ দেহ, তাই বিছানায় গা এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তবে তার আগে সে ঠিক করে নিয়েছে, কাল ভোরেই জানতে হবে কথাটা কে লিখেছে এবং কেন? নইলে সে নিশ্চিন্ত মনে এখান থেকে যেতেও পারবে না।

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। পাখির মিষ্টি ডাকে চার্লসের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে চোখ মেলে বাইরের দিকে তাকায়। চার্লসের চোখ জুড়িয়ে যায়। অদূরে পাহাড়। চারদিকে ঘন জঙ্গলের জটলা পরিষ্কার আকাশ, সূর্য ওঠার প্রতীক্ষা। সে এক অনিন্দ সুন্দর মুহূর্ত।

চার্লস আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না। সে বাগানে এসে গুটি গুটি পায়ে হাঁটতে থাকে। আর ঠিক তখনও তার দৃষ্টি যায় মেরীর দিকে। সে গাছের পরিচর্যা করছে।

—গুড মর্নিং মিস মেরী।

—গুড মর্নিং মিঃ চার্লস।

তারপর দু'চারটে মামুলী কথাবার্তার পর চার্লসের গতরাতের কথাটা মনে পড়ে যায়। বলে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম।

—আমাকে। মেরী কাঁপা গলায় চার্লসের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ।

কি বলুন?

—গত রাতে আমার ঘরের টেবিলে কে এস. ও. এস. লিখেছে?

—আমি।

—কেন?

—তা জানি না।

—না জেনেই লিখেছেন ?

—হ্যাঁ।

—বিশ্বাস হয় না।

—আমি যাই, বলে মেরী আর দাঁড়ায় না।

মেরী ওভাবে চলে যেতে চার্লস দারুন আশ্চর্য বোধ করে। ভাবে সে কেন এভাবে পালিয়ে গেল ? এর পিছনে কি রহস্য থাকতে পারে।

তারপর বাগানে শার্লট আসছিল। সে চার্লসকে দেখেই আবার বাড়ির দিকে চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে না। বাধা পায়।

—মিস শার্লট, গুড মর্নিং।

—গুড মর্নিং মিঃ চার্লস।

—প্লীজ। চলে যাবেন না। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

—আপনি কাল আমার ঘরের টেবিলে এস. ও. এস. লিখেছেন ?

—না। আমি যাই।

—দাঁড়ান।

—আমার মনে হয় আপনিই লিখেছেন

—কিসে বুঝলেন ?

—তা তো ঠিক জানি না। তবে আমার মনে হলো বলেই এ কথাটা বললাম।

—আর যদি আমি লিখেও থাকি, তাতে হয়েছে কি।

শার্লস হাসে।

—না কিছুই হয়নি। কথাটার মানে জানেন ?

—উহুঁ। চলুন ব্রেক ফাষ্ট তৈরী।

—হ্যাঁ চলুন কিন্তু চার্লস যেতে যেতে ভাবে, এই এস. ও. এসের মাধ্যমে কি রহস্যের সৃষ্টি হতে চলেছে।

নয়

আরকুল পোয়ারো সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার নেই। সে একজন স্বনামধন্য গোয়েন্দা। বহু রহস্যের জাল সে ভেদ করে খুনীকে ধরেছে, যার প্রশংসায় খবরের কাগজ থেকে শুরু করে নানা রকম পত্র পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদি ধন্য ধন্য করেছে।

পোয়ারো বার কয়েক চেষ্টা করার পর চার্লসের লাইনটা পেয়ে যায়। চার্লস তার কলেজ জীবনের বন্ধু। যদিও বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়েছে, তবুও দু'জন দু'জনকে পরে প্রণয়ীর মত কাছে টেনেছে। একে অপরের কাছে মনের কথা ব্যক্ত না করে সুস্থির থাকতে পারেনি। তবে এ কথা ঠিক, পোয়ারো তার লাইনের বিষয় অনেক কথা চার্লসকে বললেও বিশেষ বিশেষ কথা তার কাছেও গোপন রাখে। অর্থাৎ বলতে চায় না। সে গোপনীয়তার যৌক্তিকতা চার্লস বোঝে এবং তা জানবার জন্য সেও পেড়াপেড়ি করে না। কারণ সে বেশ ভালো করেই জানে, সবার লাইনেই কিছু না কিছু গোপনীয়তা আছে, যা নিজের স্ত্রীর কাছেও বলা চলে না।

অবশ্য পোয়ারো অনেক কথাই অকপটে চার্লসের কাছে বলে এবং সময় বিশেষে বুদ্ধি পর্যন্ত নেয়। আর কথার মাঝে অনেক সময় অন্ধকারের মাঝে সে আলো পর্যন্ত দেখতে পেয়েছে এবং পেয়ে তার হাত দুটো পর্যন্ত চেপে ধরেছে।

অপর দিক থেকে উত্তর ভেসে আসে। হ্যালো।

—আমি পোয়ারো বলছি।

—বলুন স্যার।

—তোমার সাহেব ফিরেছে?

—না স্যার।

—এখনো নয়?

—হ্যাঁ স্যার। সে জন্য বড্ড চিন্তায় আছি।

—চিন্তার কিছু নেই। কোথায় গেছে তা কিছু জানো?

—না স্যার।

—সে একা, না সঙ্গে আর কেউ গেছে?

—একা স্যার।

—ঠিক আছে, এলে আমায় ফোন করতে বলো।

—আচ্ছা স্যার। গুড নাইট।

—গুড নাইট।

—হ্যালো!

—চার্লস ফিরেছে? পোয়ারো জানতে চায়।

—না স্যার। রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেল।

—হুঁ। ঠিক আছে, শোন, পোয়ারো একটু চিন্তিত।

—বলুন স্যার।

—যত রাতেই ফেরে ফিরলে যেন আমায় ফোন করতে বলবে

—নিশ্চয়ই স্যার।

সেই চার্লস ফিরেছে তার পরের দিন সকাল ন'টা নাগাদ। তবে নিজের গাড়িতে ফিরতে পারেনি। ফিরেছে কিছুটা পথ একটা ট্রাকে এবং বাকি পথ ট্যাক্সিতে।

চার্লস তার গাড়ি ডিনসমেডের জিম্মায় রেখে এসেছে। ডিনসমেড বলেছে, চিন্তার কারণ নেই। গ্যারেজ থেকে লোক আনিয়ে গাড়ি মেরামত করে কয়েক দিনের মধ্যেই গাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

চার্লস বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্‌বিগ্ন চারক বার্ট তাকে নানা কথা জিজ্ঞেসা করতে থাকে। সে বাড়ির চাকর হলেও চার্লসের অবিবাহিত জীবনে তার বিরাট ভূমিকা আছে। অনেকটা বন্ধুর মতন।

চার্লস তাকে মোটামুটি বুঝিয়ে বলার পর বার্ট বলে, স্যার, এখুনি একবার মিঃ পোয়ারোকে ফোন করুন।

—হ্যাঁ করছি। এর আগে কয়েকবার ফোন করেছে তো?

—হ্যাঁ স্যার।

—এক কাপ কফি দাও তো?

—এখুনি নিয়ে আসছি। কাল রাতে উনি দু'বার ফোন করেছেন। আর সকালেও এর মধ্যে দু'বার করা হয়ে গেছে।

—তাই নাকি? চার্লস বুঝতে পারে। এরপর দেখা হলে পোয়ারো এক চোট নেবে।

—হ্যাঁ স্যার।

—ভাবছিলাম, এখন একটু বিশ্রাম নেবে, না, এখুনি ওর ওখানে একবার যাই। দারুন চিন্তায় রয়েছে। বলে চার্লস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—স্যার, কফি খাবেন না?

—এখন থাক্।

চার্লস রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি পেয়ে যায় এবং মিনিট-দশেকের মধ্যে সে পোয়ারোর বাড়ি পৌঁছে যায়।

পোয়ারো চার্লসকে দেখে একটু ধমকের সুরে কথা বলে, এই যে ধাড়ি খোকা! তোমার খবর কি?

—খুবই গুরুতর, চার্লস হাসে।

—সে তো তোমায় দেখেই বুঝতে পারছি।

—তা কাল প্রেজার ট্রিপ মারতে কোথায় গিয়েছে?

গ্রীন উড ছাড়িয়ে।

—সঙ্গে কে ছিল।

—কেউ না।

—উঁহুঁ। সঙ্গে যাবার কথা তো তোমার ছিলো। তুমি তো কাজের অজুহাত দেখিয়ে আমায় কাটালে। অগত্যা আমাকেই ··।

—অগত্যা তোমাকেই তো সুন্দরী ললনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হলো। আহারে বেচারা!

—ঠিক বলেছো! গাড়ি স্টার্ট দেবার সময় তুমিই তো আমাদের হেসে সি অফ করলে।

—কারেক্ট! বলে পোয়ারো হাসতে থাকে।

তারপর পোয়ারো হাসি থামিয়ে বাঁ পাটা ডান পায়ের উপর তুলে বলে, তা গেছিলে কোথায়?

বললাম তো। কফি আনতে বলো।

তারপর কফি এলো। কফিতে ঠোঁট ডুবিয়ে চার্লস বার বার ডিনসমেড পরিবারের প্রশংসা করে তাদের আতিথ্যের বর্ণনা করে গেল এবং রাতে তাকে থাকতে না দিলে আমায় আর জীবন্ত দেখতে পেতে না।

—বন্ধু, ও অবস্থায় কেই কাউকে ফেরাতে পারে না। রাস্তার একটা কুকুর পর্যন্ত আশ্রয় পেয়ে যায়।

—এবার আর কোথাও তোমায় ছাড়া বেরুচ্ছি না। তবে···।

—তবেটা একটু পরে বলো।

—কেন?

—তার আগে তোমায় ডিনসমেডের দুই কন্যার একটু বিস্তারিত বিবরণ দিলে সুখী হোতাম।

—বন্ধু, বয়সে বড়ই ছোট।

— গল্পটার গোড়াতেই কেঁচিয়ে দিলে!

—কিসে ?

—আবার জিজ্ঞেস করছো কিসে !

—বুঝিয়ে বলবে তো।

—সাধে কি আর তোমায় লোকে অবিবাহিত বলে… … ;

—বন্ধু, তুমিও তো একই দোষে দোষী।'

—অস্বীকার করছি না। তবু একটু রেখে থেকে বলি।

—কিন্তু যা সত্যি, তাই তোমায় বললাম। নইলে পরে দুঃখ পেতে।

—তা বয়স কত ? একবারে তো মায়ের কোলে বসে দুধ খাচ্ছে নাতো ?

—না, তা নয়। দু' জনেরই সতেরো আঠারো করে হবে।

—এই জন্যই বলে অবিবাহিত লোকগুলো যেমন অবিবেকে, তেমনি আহম্মক। পোয়ারো অল্প অল্প হাসে।

—বন্ধু, আমায় তো অনেক গালাগালি করলে! কিন্তু থুতু ছেটালে কিন্তু নিজের গায়েও এসে পড়ে।

—তা ঠিকই। তবে আমি তোমার মত এতটা আহাম্মক নই। একটু সুপার কোয়ালিটির, পোয়ারো কফিতে চুমুক দেয়।

তারপর পোয়ারো চার্লসের চোখে চোখ রেখে বলে, কেউ সতেরো আঠারো বয়সের দুরন্ত যৌবনা এবং বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসের মেয়েদের বলে কি না বয়সে বড়ই ছোট।

—বন্ধু, তোমার আমার বয়স কত ?

—ওদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে আমাদের বয়সও পঁচিশের নিচে গিয়ে দাঁড়াতো। নইলে গত পরশু মিঃ লয়েডের পার্টিতে মিস জার্ডিন আমার উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল বলে একরাশ দুঃখ আর অভিমান প্রকাশ করে কত কথা বলছিল।

—আর তুমি কথা দিয়েও তার পরের দিন জার্ডিনের বাড়ি যাওনি।

—আহাম্মক তো।

—স্বীকার করছো ?

—বেটার কোয়ালিটির। পোয়ারো হাসে।

পোয়ারোর কথার ধংণ দেখে চার্লস হো হো করে হেসে উঠে। তারপর সে হাসির বেগ থামিয়ে বলে, আজ আর অফিসে গেলাম না।

—কেন ?

—ডুব মেরে দিলাম।

—হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি, আর এসে আমার কাজেরও ক্ষতি করছো।

—মোটেই না। বরং তোমায় একটা কেস দিতে এসেছি।

—কেন ?

—কেস ? তবে এখন আর কোন কেন নয়, এই তিন মাস গোটা ছয়েক কেসের সমাধান করতে গিয়ে বহুত নাজেহাল হয়েছি। এখন শুধু বিশ্রাম।

—বিশ্রাম তাই বুঝি কাল আমার সঙ্গে প্রেজার ট্রিপে গেলেনা ?

—অনেকটা তাই।

—ও বিশ্রাম তোর ঠিকুজি কুষ্ঠিতে লেখা নেই।

—কেন ?

—ভগবান ব্যাটা তোমার পায়ে চাকা লাগিয়ে দিয়েছে বন বন ঘুরবার জন্য, আর সূক্ষ্ম মন দিয়েছে চিন্তা ভাবনা করবার জন্য।

কফির কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে চার্লস আবার বলে, এই কাজ করার স্পৃহা তোমার মধ্যে যথেষ্ট রয়েছে, আর সে ক্লু তুমিই দিয়েছো।

—আমি ? পোয়ারো নিজেকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ।

—কিসে বুঝলে ?

—এই মাত্র একটা ডায়লগ ছেড়েছো তা মনে আছে ?

—এর মধ্যে তো অনেক কথাই বলা হয়েছে।

—তবু বিশেষ কোন ডায়লগের কথা মনে করো।

—মনে করতে পারছি না।

—আমার অফিস ডুব মারার প্রসঙ্গে তুমি বললে, এসে আমার কাজের ক্ষতি করছো !

—ব্রাভো বন্ধু !

—আধা গোয়েন্দা, কি বলো ?

—পুরো, চার্লস হাসে।

—তবে তোমার ট্রেনিং-এ কিছুদিন থাকতে পারলে বোধ হয় হয়ে যেতে পারি। শাস্ত্রে বলে, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায়।

—তুমি অন্তত হবে না।

—এই মাত্র আশ্বাস দিয়ে আবার……।

—নইলে মিস হবসের মত পাত্রীকে তুমি প্রত্যাখ্যান করো, যে বিশাল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী।

—করাটা বোধ হয় উচিত হয়নি।

—বড় লেটে বুঝলে।

—আসলে সেদিন আধো অন্ধকার জায়গায় আমায় টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে গদ গদ গলায় কি সব বলতে লাগলো। তাতেই আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে পালিয়েছি।

—তুমি একটা ইডিয়েট।

—বন্ধু, একটু স্যামেণ্ড করো।

—কিসে ?

—বলো, আমরা ইডিয়েট।

—আমাকেও তোমার দলে ফেলতে চাও ?

—ও এসে যায়।

—সত্যি, বোধ হয় তাই, পোয়ারো হাসে। তা তোমার কেসটা

কি? একটু শোনা যাক্।

—দ্যটস লাইক এ গুড বয়। এর মধ্যে একটা ঘন রহস্যের জাল লুকিয়ে রয়েছে। এবং সেটা তোমায় বার করতে হবে।

—একটু খুলে বলো তো শুনি, পোয়ারো আগ্রহ প্রকাশ করে।

—তাহলে কেসটা টেক-আপ করলে?

—আগে কেসের মেরিট বুঝি।

—মেরিট আছে, তারপর চার্লস পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বলে।

—আমার ছুটো জিনিসের উপর দারুণ ভাবে সন্দেহ হয়েছে।

—কালকের সেই ডিনসমেড পরিবারে কথা বলছো?

—হ্যাঁ।

—সে ছুটো জিনিস কি?

পোয়ারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চার্লসের দিকে তাকায়। তার চোখ দারুণ ভাবে সজাগ হয়ে উঠেছে। সে তার কথার দৃঢ়তার মধ্যে যেন একটা রহস্যের সন্ধান পাচ্ছে। এবং সে বেশ ভালো করেই জানে ও কখনো তার সঙ্গে কোন ব্যাপারে রসিকতা করে না। বিশেষ করে এ ধরনের ক্ষেত্রে।

—প্রথমত, আমি ডিনসমেডের বাড়িতে প্রবেশ করার পর ডিনসমেড, তার ছেলে জর্জ এবং মিসেস ডিনসমেডের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাদের মেয়েরা এলো।

—তাদের নাম? পোয়ারো বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে।

—শার্লট এবং মেরী, চার্লস জানায়।

—এদের মধ্যে কে বড়? ফের পোয়ারোর প্রশ্ন।

—মেরী।

—বয়স কত? পোয়ারো সঠিক ভাবে জানতে চায়।

—আঠারোর কাছে হবে।

—আর শার্লটের?

—সতেরো হবে।

—তারপর ?

—শার্লট আর মেরী আমার কাছে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস ডিনসমেড 'শার্লট' বলে চাপা গলায় যেন হিস হিস করে উঠলো।

—কেন ?

—আমি জানি না।

—তারপর কি হলো ?

—শার্লট চলে গেল এবং একটু পরে আবার ফিরে এলো।

—হঠাৎ কেন চলে গেছিল ?

—তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে শার্লট যখন এলো তখন ওর চুলের রং ধূসর দেখলাম।

—তাতে কি হয়েছে ?

—মনে হয় ওর চুলের সে রং ছিল না।

—তোমার মনে হয়, কি রং ছিল ?

—সম্ভবত সোনালী।

—তা থাকলে হয়েছে কি ? কিন্তু মিসেস ডিনসমেড ওভাবে 'শার্লট' বলে একটু চেঁচিয়ে ডাকলে কেন। আর কেনই বা শার্লট সেই ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গিয়ে একটু পরে আবার ফিরে এলো।

—তুমি এ ব্যাপারে শার্লট বা মিসেস ডিনসমেডকে কিছু জিজ্ঞেস করেছো ?

—না।

—অথচ বললে তোমার মনে সন্দেহ হয়েছে।

—হ্যাঁ। আসলে তখন সবে আশ্রয় পেয়েছি শেষে যদি আবার ঘাড় ধরে বার করে দেয়। আর সব ব্যাপারে কৌতূহল দেখানোও ঠিক নয়।

—আর তোমার দ্বিতীয় পয়েন্টটা ?

—আমাকে শুতে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল বাড়ির একবারে

কোনের ঘরে। আমার ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে মেরী এবং শার্লট দু'জনেই আফসোস করে বললো, ঘরের টেবিলটা তাড়াহুড়োতে ঠিক পরিস্কার করে উঠতে পারিনি। তার জন্য লজ্জিত।

—তখন তুমি গলে গিয়ে কি বললে?

—অবজেকসন। তবে সাময়িক ভাবে গলে গিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, যা করতে পেরেছেন তাই যথেষ্ট।

এরপর আমি বাথরুম গেছি। তারপর আমার জন্য ঘরে যে এক বিস্ময় অপেক্ষা করছে তা আমি বুঝতে পারি নি। ঠিক শুতে যাবার আগে দেখলাম।

—কি দেখলে?

—দেখলাম, টেবিলের ধুলোতে এস. ও. এস. লেখা।

—এস. ও. এস.?

—হ্যাঁ।

—আগে লেখা ছিল না?

—না।

—কাউকে লিখতে দেখেছো?

—না মনে হয়, ঐ দু'বোনের মধ্যে কেউ একজন লিখেছে? আর সে লিখেছে আমি বাথরুমে যাবার পর।

—তুমি বাথরুম থেকে এসে কাউকে দেখেছো?

—না।

—তখন তুমি কি জিজ্ঞেস করছো?

—না। তখন করিনি।

—কখন করেছো?

—তারপরের দিন সকালে।

—কোথায়?

—বাগানে বেড়াতে গিয়ে।

—তা ডিনসমেড দম্পতি জানে?

—না।

—কিভাবে করেছো ?

ঘুম ভাঙতে সকালে আমি বাগানে একটু পায়চারি করতে যাই। তখন মেরীকে বাগানে দেখি। দেখে সুপ্রভাত জানিয়ে গত রাতের কথাটা বলতে বললো, সেই লিখেছে। তখন আমি জিজ্ঞেস করি, কেন লিখেছেন। তখন ও বললো, তাতো জানি না।

একথা শুনে আমি বলি, না জেনেই লিখেছেন ? ও মাথা নাড়তে আমি বলি, এ কথাটার সঠিক মানে জানেন এবং কখন কথাটা ব্যবহার করা হয় ? ও ফের মাথা দোলায় এবং যাবায় জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। তবু আমি বলি, তাহলে আপনি না জেনেই লিখেছেন ? হ্যাঁ বলে ও দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হেঁটে যায়। আর তখন স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম। ওর মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

—তারপর শার্লটকে কখন একথা জিজ্ঞেস করলে ? পোয়ারোকে চিন্তিত দেখাতে থাকে।

—মেরীর জবাব শুনে আমি বাড়ির ভেতর যেতে পারি না। এলোমেলো ভাবে বাগানে পায়চারি করতে থাকি। ঠিক তখনই বাগানে শার্লট এলো। এবং তাকেও ঠিক ঐ প্রশ্ন করি। সে আমার কথা শুনে প্রথমটা অস্বীকার করে। পরে বলে সেই লিখেছে, জিজ্ঞেস করি, কেন লিখেছেন ? বলে তা তো জানি না এবং আরো জানালো মানে ও তার অজানা। আর আমার ব্রেকফাস্ট রেডি, বলে সে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হেঁটে গেলেও তার চোখে মুখে একটা আতঙ্কের চিহ্ন দেখলাম।

—কেন ?

—সেটা তো তুমি বার করবে। পারলে তো আমিই ডিটেকটিভ হয়ে যেতাম।

হুঁ, পোয়ারোকে বেশ গম্ভীর দেখাতে থাকে। অর্থাৎ সে চিন্তার মাঝে ডুবে রয়েছে।

দশ

আর বুল পোয়ারো যখন ডিনসমেড কনষ্ট্রাকশনের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন বেলা বারোটা। কোম্পনীটা এমন কিছু আহামরি নয়। মাঝারি আকারের একটি ঘর নিয়ে কোম্পানী। তাতে একজন অল্প বয়েসী ছেলে কাজ করছে। আর সেই ছেলেটির সামনে অপেক্ষাকৃত একটা বড় টেবিলে ডিনসমেড মাথা ঝুঁকে একটা বাড়ির প্ল্যান দেখছে।

পোয়ারোর পরণে নিখুঁত স্যুট। স্যুটের রং কালো। তার উপর নীল লাল স্ট্রাইপ। পায়ে চকচকে সু। টাইয়ের রং হাল্কা নীল। তার উপর সাদা কাজ। ভেতরে ওয়েস্ট কোট। এবং তার উপর দিয়ে সাদা জামাটা উঁকি দিচ্ছে।

—গুড মর্নিং মিঃ ডিনসমেড।

—গুড মর্নিং। ডিনসমেড প্ল্যানের উপর থেকে দৃষ্টি তুলে পোয়ারের দিকে তাকায়।

—আমাকে ঠিক চিনতে পারলেন না তো? পোয়ারো হাসি মুখে ডিনসমেডের দিকে তাকায়।

—না ঠিক, ডিনসমেড একটু ইতস্তত বোধ করতে থাকে।

—আমি চার্লসের বন্ধু। আমরা এক সঙ্গে কলেজে পড়তাম।

—ও আচ্ছা, আচ্ছা।

—ও তো সেদিন আপনাদের ওখানে রাত কাটিয়ে এসে আপনার আতিথ্যের প্রসংশায় পঞ্চমুখ।

—ঐ দুর্যোগের রাতে কি আর মিঃ চার্লসের জন্যে করতে

পেরেছি।

—যা করেছেন যথেষ্ট! ঐ ভাবে ওকে রাতে আশ্রয় না দিলে ও ঠিক মরে যেত। তার উপর সেদিন হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ায় যা ঠাণ্ডা পড়েছিল।

—আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও অমন কাজ করতেন, তারপর ডিনসমেড জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথায় থাকেন?

—ওয়েস্ট রোডে। পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে একটা রাস্তার নাম বলে দেয়।

—তা হলে তো খুব একটা দূরে নয়।

—আবার কাছেও নয়।

—হ্যাঁ, তা প্রায় মাইল চার পাঁচেক দূরে হবে।

—আপনি কি করেন?

—আমি এক কলেজের শিক্ষক। পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মিথ্যে কথা বলে। আসলে এ ধরনের অনেক কথা তার ঝুলিতে রাখা আছে।

—সম্মানীয় চাকরি।

—সে যুগ আর নেই। এখন ছেলেরা মাস্টারদের আর ততটা শ্রদ্ধা ভক্তি করে না।

—তা অবশ্য ঠিক, দিন কাল অনেক বদলে গেছে।

—আপনার এখানে কোম্পানী কত দিনের হলো?

—তা ধরুন বছর পঁচিসেক তো হলো? দাঁড়ান, একটু কফি আনাই।

তার কোন দরকার নেই, পোয়ারো বলে। আমি এই মাত্র বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি। তাই আপনার কুণ্ঠার কোন কারণ নেই। আর শুধু কফির উপর দিয়ে সারছি না। একদিন চার্লসকে সঙ্গে করে সকালে আপনার বাড়ি হাজির হবো। সারাদিন থেকে ফিরবো সেই সন্ধ্যের মুখে।

—সে তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা।

ওদের কথার মাঝে তরুণ ছেলেটি ওদের দিকে কয়েকবার তাকিয়ে আবার সে কাজের মাঝে ডুবে গেল।

—চার্লস বলছিল, আপনি যেন কোথায় থাকেন?

—গ্রীন উডে।

—সে তো অনেক দূরে। তবু বলবো শান্তিতে আছেন। এ গতির জীবন আর সহ্য হয় না। চেঁচামেচি, গাড়ির আওয়াজ আর ভালো লাগে না।

—আমি ও কতটা সেই কারণে……।

—ভালো করছেন। অনেক ভালো করেছেন। নেহাত আমার উপায় নেই বলে, নইলে……।

—সত্যি কথা বলতে কি, ব্যবসাটা তেমন ভালো চলছেন না, আর যে বাড়িতে ছিলাম, সেখানকার বাড়িওয়ালা উঠে যাবার জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছিল। এবং ঠিক তখনই একজন দালাল এই বাড়িটার খোঁজ দিল। দামেও সস্তায় পেলাম।

—কত তে?

—পঞ্চাশ হাজারে।

—এখন ঐ বাড়ির দাম গিয়ে দেখুন দু'লাক্ষ টাকা।

—হ্যাঁ তাতেও করা যাবে না। যে ভাবে জমি, জিনিসপত্তরের দাম বেড়ে চলেছে তাতে অনেকেই বাড়ি করার দিকে একটুও ঝুঁকছে না। তবে আবার না করেও উপায় নেই। যা ভাড়া।

—তা ঠিকই বলেছেন, পোয়ারো ডিনসমেডের কথাটা সমর্থন করে।

—তবে আমার স্ত্রী প্রথমটা এ বাড়ি দেখে আপত্তি করেছিলেন।

—কেন?

—শহর থেকে এতটা দূরে।

—ত্রিশ চল্লিশ মাইল তো হবেই, আর শহরের সব সুবিধে কি

ওখানে পাওয়া যায়।

—তা তো সম্ভব নয়।

—যার জন্যে আমারও প্রথম দিকে খুব অসুবিধে হতো।

—আচ্ছা। আপনার কাজের কোন ক্ষতি করছি না তো।

—না, না, তেমন কাজের চাপ নেই।

—যাক্। শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হোলাম। তা আপনি ওখানে কবে বাড়িটা কিনেছেন?

—তা ধরুন, বছর পনেরো হবে।

—আমরা হঠাৎ হাজির হই, তাহলে আপনার স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েরা বিব্রত বোধ করবে না তো?

—না, না। তাছাড়া. আমার স্ত্রী দারুন মিশুকে। আর ছেলে মেয়েরা কলেজে পড়ে। ওরাই সঙ্গী সাথী চায়।

—গুড। তা ছেলে বড় না মেয়েরা বড়?

—মেয়েরা।

—ওরা কোন কলেজে পড়ে?

—মেরী এবং শার্লট কুরীতে পড়ে।

—মেরী বড় বুঝি?

—হ্যাঁ।

—আর ছেলে?

—জর্জ হোবার্ট ইউনিভারসিটিতে পড়ে।

—বাঃ বেশ। তাহলে আজ উঠি।

—আবার আসবেন কিন্তু।

—নিশ্চয়ই।

—আপনার কলেজ কি এদিকে?

—আর একটু এগিয়ে গিয়ে।

হঠাৎ বেরুবার মুখে একটা ছবির দিকে পোয়ারোর নজর যায়।

ছবিটা কোন কনস্টাকশনের নয়, যে সেটা টাঙিয়ে রেখে বাহাদুরী কুড়বে। এ ছবিটা হলো দুজনের। সেই দু'জনের মধ্যে, একজন হলেন ডিনসমেড, অপরজন ?

পোয়ারো সেই ছবির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললো, আপনার সঙ্গে এটা কার ছবি।

এটা আমার এক বন্ধুর ছবি, কথা শেষ করে ডিনসমেডের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসলো।

—না জেনে আপনাকে কোন দুঃখ দিয়ে বসলাম নাকি।

—না, না, দুঃখ নয়। মানে……।

—না, না, আপনার বলার অসুবিধে থাকলে জানতে চাইনা।

—না, না, আপত্তি ঠিক নয়, মানে আমার সেই বন্ধু অকালে মারা যায়।

—কি ভাবে ?

—ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে।

কেমন করে পড়ে গেলেন ?

—নামতে গিয়ে।

—কিন্তু বয়স তো বেশী বলে মনে হয় না।

—না, রবার্ট আমারই বয়েসী ছিল।

—তখন আপনার বয়স কত ছিল ?

—ধরুন, পঁয়ত্রিস হবে।

—ভেরী স্যাড। অবশ্য কপালে মৃত্যু থাকলে কেউ ঠেকাতে পারে না। আমার এক কলেজের বন্ধু। দারুণ ফুটবল খেলতো। সে খেলতে খেলতে আঘাত পায়। পরে তাতেই মারা যায়, পোয়ারোর আর একটা মিথ্যে কথা।

—এটা ও একটা দুঃখের ঘটনা।

হ্যাঁ। যার জন্য এখন আর সময় পেলেও আর ফুটবল মাঠে যাই না। এমন কি ফুটবল খেলা সম্বন্ধে কোথাও আলোচনা হলে

যোগ দাওয়া তো দূরের কথা, সেখান থেকে উঠে চলে যাই।

—বোঝা যাচ্ছে, এখনো সেই বন্ধুর কথা ভুলতে পারেন নি।

—এরপর হয়তো ভুলে যাবো।

—আপনার কথাই যা বুঝতে পারছি তাতে একটু সময় লাগবে

—আপনারও তো আমার মত একই অবস্থা দেখছি।

—হ্যাঁ। ডিনসমেডের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস পড়ে আসলে বড্ড বেশী রবার্টকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম।

এগারো

পোয়ারো নির্দিষ্ট কলেজের সামনে এসে দাঁড়ায়। সে সামনের দিকে তাকায়। ঐ তো কলেজের হলুদ রঙের বিরাট বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। পোয়ারো গাড়িটা কলেজের পার্কিং জোনে রেখে হাত ঘড়ির দিকে তাকায়। এখন সময় সাড়ে এগারোটা। বেশ শান্ত পরিবেশ গেটের পাহারারত দারওয়ানকে নিজের পরিচয় পত্র দেখাতে সে অসম্মানে পোয়ারোকে সেলুট কার ভেতরে যাবার অনুমতি দেয়। সামনেই একটা বিরাট লন। মৌসুমী ফুলের জটলা। পোয়ারো সেটা অতিক্রম করে একটা বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। তবে এটা কলেজ বিল্ডিং নয়। এখানে কিছু কেরানী ধরণের কাজ করছে।

পোয়ারো তাদেরই একজনের কাছে দাঁড়ায়, গুড মর্ণিং।

—গুড মর্ণিং।

—আমি একবার মেরী ডিনসমেডের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সেটা কি করে সম্ভব।

—কিসে পড়ে?

—তা ঠিক বলতে পারছি না।

—ঠিক আছে, আপনি মিঃ জ্যাকসনের কাছে জান।

—ধন্যবাদ। কোথায় বসে বলুন তো?

—ঐ যে ঘড়ির নিচে যে ভদ্রলোক বসে আছেন. উনিই মিঃ জ্যাকসন।

—ঠিক আছে।

পোয়ারো মিঃ জ্যাকসনের দিকে তাকায়। বয়সে তরুণ। ত্রিশের নিচে বয়স হবে।

—গুড মর্ণিং মিঃ জ্যাকসন।

জ্যাকসন একরাশ ফাইলের মাঝে ডুবেছিল। প্রতি মাসের মাইনে তোলা হয়েছে কিনা দেখছে।

—গুড মর্ণিং। তবে জ্যাকসন ঠিক খুশী নয়। তার এখন বিরাট কাজের চাপ। সামনের মাসে তাকে আবার অডিটের মুখোমুখি হতে হবে।

— আপনাকে একটু বিরক্ত করবো।

—বলুন,পোয়ারোর সম্ভ্রান্ত পোশাক আর ব্যক্তিত্ব দেখে জ্যাকসন তাকে সরাসরি 'না' বলতে পারে না।

—আমি একটু মেরী ও শার্লট ডিনসমেডের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কিসে পড়ে ?

—সেটাই হয়েছে মুসকিল। তা অল্প বয়স। মনে হয় হয়তো ফাস্ট´ ইয়ারে পড়ছে।

—ঠিক আছে, আপনি একটু বসুন। সেকসানও জানেন না বুঝি ?

—হ্যাঁ।

তারপর জ্যাকসন গোটা তিনেক খাতা ঘেঁটে বলে, শার্লট ডিনসমেড বি. এ. ফাস্ট ইয়ারে পড়ছে। সেকশন এ, রোল নাম্বার পঁচিশ।

—আর মেরী ? পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ডাইরী বার করে শার্লটেরটা লিখে মেরীরটা জানার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলো।

—বি. এ. সেকেণ্ড ইয়ার। সেকশন বি এবং রোল নাম্বার একত্রিশ।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আর একটু আপনাকে বিরক্ত

করব, বলুন।

—আমি যে একবার ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—এখন তো দু'জনেরই ক্লাস চলছে।

—কখন ছুটি হবে ?

—তা ধরুণ সাড়ে তিনটে।

—তাহলে আমি একটু অপেক্ষা করি। আপনি যদি দয়া করে একটু ডেকে দেন।

—এ ভাবে ডেকে দেওয়ার তো একটু অসুবিধা আছে।

—বলুন ওদের একজন আত্মীয় তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

—আপনার নামটা কি ? জ্যাকসন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছুটো স্লীপ ছিড়ে নিয়ে বলে।

পোয়ারো সত্য পরিচয় গোপন করে বললো, লিখুন, চার্লসের বন্ধু এ্যালবার্ট জোন্স, আর আমি ভিজিটার্স রুমে গিয়ে অপেক্ষা করছি। রুমটা কোথায় ?

—এই হলুদ বাড়িটার এক তলায়।

—ধন্যবাদ।

পেয়ারো চলে যেতে জ্যাকসন ছুটো স্লীপ মেরী আর শার্লটের নাম সেকশান এবং রোল নাম্বার লিখে বেল বাজাতে একজন বেয়ারা এসে হাজির হয়, স্যার।

—এই দু'জনকে গিয়ে বলো তাদের একজন গেস্ট ভিজিটোর অপেক্ষা করছে।

—আচ্ছা স্যার।

একটু পরে মেরী এসে ভিজিটার্স রুমের কাছে এসে দাঁড়ায় অবশ্য প্রথমটা সে আসতে চায়নি। চার্লস হলে তবু একটা কথা ছিল। এ তার বন্ধু। আর নাম যা বললো সেদিন সে চার্লসের মুখে শোনেনি।

তারপর মেরী ভেবেছে, চার্লসের বন্ধু যখন তখন একবার দেখা করা উচিত। নইলে বড়ই অভদ্র ব্যবহার করা হবে। আরো যখন যেচে দেখা করতে এসেছে। আর দেখাই যাক না কি বলে।

মেরী আরো ভাবে, সে বেশ ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলবে। আর একবার সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে হলে দু'চারটে কথা বলেই তাকে বিদায় করে দেবে।

মেরী আস্তে আস্তে ভিজিটার্স রুমের দিকে তাকাতে থাকে। ভিজিটার্সদের মধ্যে বেশীর ভাগই পুরুষ। তারা তাদের বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এবং বেশ ঘন হয়ে বসে কথা বলছে।

মেরী ভাবে নিশ্চয়ই এদের মধ্যে কেউ হবে না। আরো যেখানে চার্লসের বন্ধু বলেছে।

তারপর দূরের কোণের দিকে মেরীর নজর যেতে সম্ভ্রান্ত পোয়ারোর সঙ্গে তার চোখাচেখি হয়ে যায়। তাতে সে বেশ স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পারে, এ নিশ্চয়ই চার্লসের বন্ধু।

পোয়ারোও সেটাকে দেখতে পেয়েছে এবং তাকে সে এখানে প্রবেশ করা থেকে লক্ষ্য করছে। এখনো তার দৃষ্টি মেরীর দিকে। তবে তার মনে প্রশ্ন, এ শার্লট, না মেরী?

পোয়ারো ভাবে, ও একা। তবে কি অন্য বোন আজ কলেজে অনুপস্থিত? না কেনা কে এসেছে বলে দেখা করতে আসে নি? যাক্, ওর কাছেই সব কিছু জানা যাবে।

পোয়ারো মেরীর কাছে এগিয়ে বলে, আপনি মিস ডিনসমেড তো? কথার মাঝে তার মুখে হাসির রেখা।

—হ্যাঁ।

—মেরী, না শার্লট?

—মেরী।

—ধন্যবাদ।

পোয়ারো মেরীর দিকে তাকায়। বয়স আঠারোর কাছে। পরনে

মিনি স্কার্ট। স্কার্টের রং সবুজ। তার উপর একটা লাল ফুল হাতার সোয়েটার। সোয়েটারের বুক খোলা।

মেরীর স্লীম ফিগার। মাথায় প্রায় পাঁচ ফুট তিন চার ইঞ্চির মত লম্বা হবে।

মেরীর চোখ কটা। চুলের রং ধূসর। তাতে একটা রং বেরঙের রিবণ বাঁধা।

পায়ে হাই হিলের জুতো। কালো স্ট্রাপ। এবং পায়ের রঙের সঙ্গে রং মিশিয়ে হাঁটু পর্যন্ত একটা মোজা পরেছে। পোয়ারো বলে, আমার নাম……।

পোয়ারোর কথার মাঝে বাধা পড়ে। তাই সে আর কথাটা শেষ করতে পারে না।

শুনেছি।

—দয়া করে বললে একটু খুশী হোতাম। তা আপনাকে বিরক্ত করছি নাতো?

—না, না।

—চার্লাস তো আপনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিশেষ করে আপনার। পোয়ারোর এখনো সেই হাসি হাসি মুখ।

—কেন? মেরীর মুখে এবার হাসি ফুটে ওঠে।

—তার যোগ্য জবাব আপনি নিজেই।

—কিসে? মেরী মুখ সহসা রাঙা হয়ে ওঠে।

—আয়নায় তো রোজই অন্তত একটিবার নিজেকে দেখেন। তা সত্ত্বেও কি আবার বলতে হবে।

—হ্যাঁ, তা দেখি বই কি। মেরীর কথাগুলো বেশ ভালো লাগছে, আর নিজের স্তুতি কে না শুনতে চায়।

তাহলে তার জবাব পেয়ে গেছেন এবং চার্লস আবার আপনাকে দেখার জন্য ব্যস্ত। সে কথা শুধু চার্লস আর আপনি জানেন।

—উনি এলে খুশী হোতাম। পরে আসতে বললেন।

—আর ওর বন্ধু হয়ে আমি বুঝি বাদ ?

—না, না, তা হবেন কেন।

—মুখে একথা বলছেন বটে, নেমন্তন্ন পেলাম অনেক অনেক দেরিতে। অবশ্য আমার কপালটাই এমন, নইলে দেখুন এই বয়সেই ঘরনী জুটলো না।

—আপনি বিয়ে করেননি তাই, মেরী এখন অনেকটা স্বাভাবিক।

—কিসে বুঝলেন ?

—আপনি মিঃ চার্লসের বন্ধু তো। মেরী হাসে।

—তাই বুঝি এক ? পোয়ারো প্রথম প্রেমে পড়া যুবকের মত হাসে।

—একবারে সবেতে এক বলতে পারলো না।

—কেন ?

—কারণ আপনার কিছুই তো জানি না। তবে একটা ব্যাপারে এক। মেরীর মুখে হাসির ছটা।

কিসে ? পোয়ারো মুখটা এমন করে জানবার জন্য যেন কত ব্যস্ত।

—কথাবার্তায়, আর সময় মত বিয়ে না করায়।

—বুজিয়ে গেছি বুঝি ? মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে পরার আগের মুহূর্তের মত পোয়ারো কথা বলে।

—শত্রুরেও এ কথা বলতে পারবে না।

—তাহলে অভয় দিচ্ছেন ? পোয়ারো হাসে।

—এক কথায়। মেরী এখনো হেসে কথা বলে চলে।

—যাক্, খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। চার্লসকেও এ কথা বলতে পারি ?

—স্বচ্ছন্দে।

—তবে চার্লস আপনার একটা ব্যাপারে একটু চিন্তিত।

—কোন ব্যাপারে ?

—ও আজ আমার সঙ্গে আসতো। হঠাৎ একটা জরুরী কাজে আটকে পড়লো বলে আসতে পারলো না।

—তা ওর চিন্তাটা কোন ব্যাপারে ?

—আপনাদের ওখানে থাকার পরের দিন ভোরে আপনার সঙ্গে বাগানে দেখা হবে চার্লস জানতে চায়, এস. ও. এস. কে তার ঘরের টেবিলে লিখে এসেছে।

—আমি লিখেছি।

—আপনি ?

—হ্যাঁ। অবশ্য প্রথমটা আমি 'না' বলেছি।

—কেন ও রকম লিখতে গেলেন ? পোয়ারো খুব সাধারণ ব্যাপারের মত হাসি হাসি মুখ করে রাখে। অনেকটা বোকার মতন।

—কে জানে ?

—হঠাৎই লিখে ফেললেন ?

—হ্যাঁ।

—কোন কারণই মনে করতে পারছেন না ?

—উহুঁ।

—কিন্তু এ ভাবে হঠাৎ লিখতেই বা গেলেন কেন ?

—লেখার পর সেটাই তো ভাবছি।

—এস. ও. এস. কথটার মানে জানেন ?

—একবারে যে জানি না তা নয়।

—কি বলুন তো ?

—ঠিক আবার গুছিয়ে বলতে পারছি না। মেরী মুখ কুঁচকে বলে।

—তবু একটু চিন্তা করে বলুন।

—পেটে আসছে মনে আসছে না।

—একটু সময় নেবেন ?

—না, আপনিই বলুন। তবে কষ্ট বা দুঃখের কোন ব্যাপার হলে……। মানে বিপদ টিপদ ঐ জাতীয়…… ।

—কিছুটা ঠিক বলেছেন। এটা হলো গিয়ে জাহাজের প্রসঙ্গে। জাহাজ বিপদে পড়লে…… ।

—ও।

—তাই চার্লস বলেছিল, আপনি হট করে ও কথা লিখতে গেলেন কেন। বলেই পোয়ারো এক দৃষ্টিতে মেরীর দিকে তাকায়।

—সেটা আমার কাছেও খানিকটা রহস্য বলতে পারেন।

—কি ব্যাপারে?

—সেটা তো আমি নিজেও জানি না। জানলে তো আপনাকে বলতাম।

—ও, আর চার্লস এই ব্যাপারে আপনাকে একটা কথা বলতে আমায় বিশেষ ভাবে বলেছে।

—কি কথা?

—ওর এক সাইক্রিয়াটিস্টের সঙ্গে বিশেষ জানা শুনো আছে। সে আমারও পরিচিত। তবে ওর সঙ্গে বেশী।

পোয়ারো মেরীকে জরিপ করতে করতে আবার বলে, তাই চার্লসের ইচ্ছে, অবশ্য আপনি যদি রাজি হন, তাহলে ও আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে চায়।

—না। না। তার কোন প্রয়োজন নেই।

—মিস মেরী, চার্লস আমায় আরো বলেছে। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয় থাকবে। শুধু আমরা চার জন ছাড়া কেউ জানতে পারবে না। আর ও ডাক্তারবাবু হওয়ায় সে আমাদের পুরো মাত্রায় সহযোগিতা করবে।

—না, না, এসবের কোন দরকার নেই।

—আপনার মত আমিও এ কথা চার্লসকে বলেছি, কিন্তু ও

শুনতে চায় কোথায়। বলে, আমাকে ওরা নতুন ভাবে জীবন দিয়েছে। তাই ওদের জন্য কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করবো।

—ওটা ওর মহানুভাবতা, আর উনি যে আমার ব্যাপারে এত সব ভেবে বসে আছেন, তা আদৌ বুঝতে পারিনি।

আমিও কি পেয়েছি। পোয়ারোর মুখে এখনো সেই হাসি বজায় রয়েছে। কোন মেয়ের ব্যাপারে এত উৎসুক্য এর আগে ওর মধ্যে কখনো দেখিনি।

যাক্, আমার তরফে ওকে ধন্যবাদ জানাবেন।

—নিশ্চয়ই।

আর আপনি যদি কখনো মত পাল্টান তাহলে দয়া করে জানাতে ভুলবেন না।

—ঠিক আছে।

—আর হঠাৎ এস. ও. এস. কথাটা লিখেছেন শুনে আমিও ওর মতন একটু চিন্তিত।

—আসলে আপনার বন্ধুর মতন আপনিও একটু বেশী মাত্রায় ভাবেন।

—হয়তো।

আর একটা কথা।

এটা কেন লিখেছেন যদি মনে করতে পারেন তাহলে অবশ্যই জানাবেন। এটা আপনার কাছে আশা করতে পারি, অবশ্য যদি আমায় বন্ধু বলে মনে করেন।

—নিশ্চয়ই।

—যাক্, আজ উঠি। আবার দেখা হবে।

—আচ্ছা, আর বাড়ি গিয়ে আপনি যে দেখা করতে এসেছিলেন তা বলবো।

—না, না, তা বলবেন না।

--কেন ?

—তাহলে বেচারা চার্লস লজ্জায় পড়ে যাবে। আসলে ওই তো এক রকম জোর করে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।

—ও। মেরীর মুখখানা আবার রাঙা হয়ে ওঠে।

—আচ্ছা, আজ আপনার বোন মিস শার্লট আসেন নি?

—না।

—বাই।

—বাই।

বারো

এর মাঝে দিন তিনেক পার হয়ে গেছে। চার্লসের আর দেখা নেই। হঠাৎ সে পোয়ারোকে ফোন করে। সে অফিসের কাজে বাইরে গেছিল।

—হ্যালো।

—হ্যালো পোয়ারো, আমি চার্লস।

—সে তোমার গলা আমি শুনেই বুঝতে পারছি। তা এ ক'দিন কর্পুরের মত কোথায় উঠে গেছিলে ?

—আর বলো না। হঠাৎই অফিসের কাজে ফেঁসে গেছিলাম। আর এসেই তোমায় ফোন করছি।

—আমার প্রতি তোমার অসীম করুণা দেখছি।

—এতে করুণার কি আছে।

—তা হয়তো নেই, কিন্তু তোমার ট্রিপ দেখছি ইদানিং বেশ বেড়েই চলেছে। ব্যাপারটা কি ? এবারে সঙ্গে কেউ ছিল নাকি ?

—হ্যাঁ, পেনিকে নিয়ে গেছিলাম।

—ও তো তোমার বীকুরমা।

কি শোন। এর মধ্যে একটা কাজ করেছি। মেরীর সঙ্গে দেখা করেছি।

—কোথায় ?

—কলেজে।

—ও তোমার সঙ্গে দেখা করলো ?

—হ্যাঁ, তোমার নাম করে চালিয়েছি। এবং আমার সঙ্গে তোমারও আসার ইচ্ছে ছিল। যাওনে অফিসের কাজের জন্য...।

—তুমি এই সব বলেছো ?

—হ্যাঁ। আরো বলেছি, তোমার প্রতি তার দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। এবং অচিরেই এই অধমকে সঙ্গে করে ওদের বাড়ি যাচ্ছো। সব বুঝতে পারছো তো ?

—আমি বিশ্বাস করি না, চার্লস প্রায় নিশ্চিন্ত।

—কি বিশ্বাস করো না ?

পোয়ারোর কথার দৃঢ়তা।

—তুমি বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছো।

—মোটেই নয়।

—আর যদি ঘটনাটা সত্যি হয় তাহলে ?

—তাহলে কি ?

—আমার বলার আর কিছুই নেই।

—যাক্, এতক্ষণে সার কথা বুঝেছো।

—তা শার্লটের সঙ্গে দেখা হয়নি ?

—না। ও সেদিন কলেজে আসেনি।

—কাজ কিছু হয়েছে ?

—উহুঁ, ফোন বলেই পোয়ারো চেপে গেল। আর একদিন যেতে হবে। নইলে কাজ কিছুই এগোবে না।

—কার কাছে ? মেরী ?

—না, শার্লট।

—শার্লট ? তাকে আবার গিয়ে কি বলবে ?

—বলবো তার প্রেমে আমি পড়েছি।

—তুমি পারও বটে ?

—কেন প্রেমে পড়তে পারি না ?

—পারো না যে তা নয়, তবে যেন মরিয়া হয়ে অঘটন কিছু করে বসোনা। বুড়ো ভাব তো ?

—তোমার হিতোপদেশ আমার মনে থাকবে। তা আজ সন্ধ্যোর পর আসছো ?

—ও সিওর। ছাড়ি।

—হুঁ।

তেরো

আগের দিনের মত আজ পোয়ারো দুপুরের দিকে এলো না। এলো একটু বেলার দিকে। আর তার হাতে কিছু দরকারী কাজ ছিল। সেগুলো ও সেরে এসেছে।

আজ পোয়ারো সরাসরি জ্যাকসনের কাছে গিয়ে হাজির, এবং তাকে কিছু বলার আগেই সে বললো। আজও ওদের সঙ্গে দেখা করবেন বুঝি ?

জ্যাকসন আজ আর কাজ করছিল না। পালাবার ধান্দায় আছে। বান্ধবী ঠিক চারটের সময় কলেজের গেটের কাছে হাজির হবে।

শুধু শার্লট ডিনসমেডের সঙ্গে।

—আচ্ছা ? আর ওর ক্লাস, সেকশন এখন তো সবই জানেন ?

—হ্যাঁ, বলে পোয়ারো ডায়েরী না বের করেই সব বলে দেয়।

জ্যাকসন শার্লটের ক্লাস, সেকশন একটা ছোট কাগজে লিখতে লিখতে বলে, আপনি ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসুন। ও ওখানে চলে যাবে খন।

অসংখ্য ধন্যবাদ।

—ঠিক আছে, এও আমাদের কাজের কিছুটা অঙ্গ।

আজ আর তেমন ভিজিটার্স রুমে ভিড় নেই। বেশ ফাঁকা।

বললেই চলে। শুধু কোণে কোণে কয়েক জোড়া প্রেমিক প্রেমিকা হাতে হাত রেখে ঘন হয়ে কথা বলছে।

শার্লট একটু লাজুক ধরণের মেয়ে হলেও একবারে লজ্জায় জড়সড় নয়। প্রথমেই যা একটু জড়তা। তারপর সে জড়তা কেটে গিয়ে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

শার্লট ভাবে, তাকে আবার কে ডাকতে এলো! তার বয়ফেণ্ড এখানে কোন দিন আসে না। সে থাকে গ্রীনউড থেকে আরো দূরে।

তবে আবার কে হতে পারে। শার্লট বেশ চিন্তিত ভাবে ভিজিটার্স রুমে পা রাখে এবং চারদিকে তাকাতে থাকে তারপর তার পোয়ারোর দিকে নজর যায়।

সেদিনের মত পোয়ারো আজ ও সুন্দর করে নিজের পোশাক পরিচ্ছদ পরেছে। কোথাও এতটুকু ক্ষুত নেই। আর আয়নায় যখন একবার নিজেকে শেষবারের মত দেখে নিয়েছে তখন তার নিজেকে দেখে নিজেরই ঈর্ষা করতে ইচ্ছে করছিল। আর ভেবেছিল সময় কালে বয়সটাকে কাজে লাগালো না কেন? তারপর জুতো পরার পর থেকে কথাটা আর মনে থাকেনি। এখন যা একবার মনে হয়েছিল, স্বপ্রতিভ পোয়ারো চেয়ার ছেড়ে উঠে মুখে হাসির ভাব ফুটিয়ে তুলে ধীরে ধীরে শার্লটের দিকে এগিয়ে যায়। এবং তার তীক্ষ্ণ চাহনী দিয়ে শার্লটকে জরিপ করতে থাকে।

শার্লটের বয়স সতেরোর কাছে হবে। একটু পাতলা ধরণের চেহারা। পান পাতার মত মসৃণ মুখ। মুখশ্রীর মধ্যে একটা কমণীয়তা আছে। যা মেরীর মধ্যে নেই। সত্যি শার্লট সুন্দরী। তার কটা চোখ হলেও বড়বড় চোখ দুটো নজর কাড়ার পক্ষে যথেষ্ট। এক নজর তাকে দেখলেই ভালো লেগে যায়।

মেরীর চেয়ে শার্লটের চুল লম্বা। এবং চুলের রং ধূসর, তেমনি মেরীর সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারোর চার্লসের কথা মনে পড়ে যায়। চার্লস

বলেছিল। মেরীর চুলের রং ধূসর হলেও শার্লটের যেন প্রথমটা সোনালী দেখেছিলাম। পোয়ারো ভাবে, কিন্তু না। এখন তো তা দেখে আদৌ মনে হচ্ছে না। এ বোধহয় চার্লসের দেখার ভুল।

আপনি মিস শার্লট ডিনসমেড? পোয়ারো শার্লটের কাছে গিয়ে বলে।

হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে……

এইরে সেরেছে! সেদিন মেরীকে বলা নামটা আর পোয়ারোর মনে নেই। হট করে তার ইংল্যাণ্ডের এক ফুটবল প্লেয়ারের নাম মনে পড়ে যায়। তাই সে বলে ববি চার্লটন। তারপর সাময়িক বিপর্যয় কাটিয়ে ফের পোয়ারো বলে, এই পরিচয়ও আমার চিনবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তা আমি নিজেই জানি। আমার প্রধান পরিচয় হলো আমি হোলাম চার্লসের বন্ধু, যে, দিন কয়েক আগে এক ঝড় বৃষ্টির রাতে আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করে ধন্য হয়ে গেছিল, আর…।

আর কি? শার্লটের মুখ খানা এবার হাসি হাসি দেখাতে থাকে।

পোয়ারো বুঝলো কাজ হয়েছে। তাই সে সুযোগের সং ব্যবহার করে বলে। একটু বসলে হতো।

—হ্যাঁ।

—আর আপনার প্রশংসায় তো পঞ্চমুখ।

—সেদিন রাতে আমরা আর কি করতে পেরেছি।

—যা করতে পেরেছেন তাই যথেষ্ট। আর আপনার মত সুন্দরীর সহচার্যে ও ধন্য।

এবং ও আজও তো আমার সঙ্গে আসতো। নেহাৎ একটা জরুরী কাজে আটকে……।

—হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার মানুষ তো……।

—তবে এবার ওর সঙ্গে আমিও যাবার লোভ সামলাতে পারছি না।

—নিশ্চয় যাবেন।

—সবে তো আজ প্রথম আলাপ। তাতেই আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার দারুন ভালো লাগছে। কই, আগে তো এমনটি হতো না।

—আপনি নিজে ভালো বলে সবাইকে ভালো দেখেন।

—ভালো? মোটেই নয়। মনে রাখবেন, ব্যাচিলার মানুষ।

—ব্যাচিলাররা বুঝি সব খারাপ! শার্লট হাসে।

—তা নয়, তবে আমি খারাপ। দেখছেন না সুন্দরীর মন ভোলাবার জন্য তার সামনেই কত স্তুতি করে যাচ্ছি।

—ও আপনার নিষ্পাপ সরলতা।

—সত্যি, আপনার কথার মধ্যে যেন যাদু আছে, যা সহজেই মায়ার জোরে বেঁধে ফেলে।

—আপনার কথাগুলো লিখে রাখার মতন।

—দয়া করে এ ভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন না। এ মিনতিটুকু এখন এবং পরের জন্য তোলা রইলো।

তারপরই পোয়ারো ভাবলো, অনেক নেকামো করা হয়েছে। এরপর হয়তো কাট খোট্টা কথা বেড়িয়ে পড়বে। তার চেয়ে কাজের কথায় আসা ভালো। পোয়ারো হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গলার স্বর ভারি করে বলে। চার্লস কিন্তু আপনার দারুন ভাবে উদবিগ্ন।

—কেন?

—যাবার দিন সকালে ও যখন ঘুম থেকে উঠে বাগানে পায়চারি করছিল তখন ওর আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

—হ্যাঁ। শার্লট মাথা নেড়ে সায় জানায়।

—তখন ওর গত রাতের একটা কথা মনে পড়ে যায়।

—কি কথা? শার্লট জানতে চায়।

—ও যে ঘরে ছিল তার টেবিলে কে যেন এস. ও. এস. লিখে রেখেছে।

—হ্যাঁ, শার্লট মাথা নাড়ে।

—ওটা কে লিখেছে ?

—আমি জানি না।

—জানেন না ? পোয়ারো খুব সহজ ভাবে কথাটা বললে ও সে ভেতরে ভেতরে খুব সজাগ।

—না।

—পরে বলেছেন আপনিই লিখেছেন।

—হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে আমিই লিখেছি।

—কেন লিখেছেন এ কথাটা ? বার বার চার্লসকে জিজ্ঞেস করতে আমায় বলেছে ওর মনে বোধ হয় কোন দুঃখ কষ্ট আছে।

—কষ্ট আর কি ! শার্লট বলে।

—তবু ও খুব চিন্তিত, আর সত্যি কথা বলতে কি, সেই কারণটা জানার জন্যই ও একরকম জোর করে আমায় এখানে পাঠিয়েছে। কেন লিখতে গেলেন আপনি ?

—আমার কেবলই মনে হচ্ছে বাড়িতে কোন বিপদ ঘটবে।

—কিসে বুঝলেন ?

—বাবা মাকে গম্ভীর দেখি। আমাকে দেখলেই তাদের কথা থেমে যায়।

—কেন ?

—তা তো জানি না।

—এটা কি আপনার বোনের ক্ষেত্রেও হয় ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক জানেন ?

—হ্যাঁ। আমি অনেকবার তা লক্ষ্য করেছি। ও আমায় বহু দিন সে কথা জিজ্ঞেস করেছে।

—আচ্ছা, তখন আপনার বাবা মা ছাড়া অন্য কেউ সেখানে থাকে।

—না।

—তাহলে ব্যাপারটায় ততটা গুরুত্ব দেবেন না। পোয়ারো ইচ্ছে করেই ঐ কথাটা বলে। হয়তো আপনাদের বিয়ের ব্যাপারে চিন্তিত।

—ও।

—চলুন, এবার ওঠা যাক্, পোয়ারো কথাটা বললো বটে কিন্তু চুলের ব্যাপারটা তার কাছে ঠিক পরিষ্কার হলো না।

শার্লট সামনে এগিয়ে চলেছে পিছনে পোয়ারো। ভিজিটার্স রুমের চৌকাঠ পেরুবার মুখে পোয়ারো ইচ্ছে করে তাকে ধাক্কা দিল ভাবটা এমন যেন চৌকাঠে হঠাৎ ধাক্কা খেয়েছে। এবং নিজের দেহের ভার সামলাবার জন্য আলতো করে শার্লটের গায়ে পড়ে। ইতিমধ্যে, তার চুলেও টান দিয়েছে। তাতে তার চুলে ও টান দিয়েছে। তাতে তার যা বুঝবার যা বোঝা হয়ে গেছে।

চোদ্দ

—হ্যালো।

—হ্যালো পোয়ারো ?

—হ্যাঁ।

আমি চার্লস কথা বলছি।

—তুমি এখন কোথা থেকে ফোন করছো।

—অফিস থেকে।

—একবার বেরিয়ে পড়ো না। তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। এবং কাথাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

—তা কথাটা কি ?

—ফোনে বলা যাবে না।

—তাহলে তো এখুনি আসতে হয় ?

—হ্যাঁ, তাই চলে এসো।

—সেদিন তোমায় যা বলেছিলাম, সেই ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছুটা ইঙ্গিত করবে, অন্তত আমার তাই ধারণা।

—কতকটা।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

—আগে ধন্যবাদ দিও না। অনেক কেস ও প্রপার ক্লু থাকা সত্ত্বেও পরে কেঁচিয়ে যায়।

—তোমার ক্ষেত্রে অন্তত তা হয় না।

—আমি কি ভগবান।

—তা না ঠিকই। তবে ঈশ্বরের একটু বাড়তি করুণা তোমার উপরে আছে। সেই বলেই তুমি বলিয়ান।

—বাঃ, বেশ কথা বলতে শিখেছো তো। এ কি মেরীর সহচার্যে ?

—উ হুঁ। তোমার সঙ্গে মিশে মিশে।

—যাক্, এ কথার জবাব পরে হবে এখন। তুমি এখন তাড়াতাড়ি লক্ষ্মী ছেলের মতন এসো তো দেখি।

—ও কে।

—শোন চার্লস, আমি ঐ গ্রীন উড যেতে চাই। পোয়ারো আর চার্লস মুখোমুখি বসে এবং দুজনের হাতেই এখন ধূমায়িত কফি।

—তা যাওয়া যেতে পারে। চার্লস বলে।

—যেতে পারে নয়। ওখানে যাওয়া একান্তই প্রয়োজন।

—তুমি কথায় বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলছো বলে মনে হচ্ছে।

—সেন্ট পারসেন্ট কারেক্ট।

—নিশ্চয়ই কোন রহস্যের সন্ধান পেয়েছো।

—এখনো ঠিক বলতে পারছি না।

—তোমার কথা শুনে কিন্তু তা আদৌ মনে হচ্ছে না, তুমি কেসের মেরিট যাচাই করেই তবে নাও এবং একবার যখন নিয়েছো তখন তার রহস্য টেনে বার করে তবেই তুমি শান্ত হও। এখানেও নিশ্চয়ই তেমন কিছু পেয়েছো।

—বললাম তো এখনো ঠিক সঠিক করে বলতে পারছি না।

—তবে অনেক ব্যাপারেই তুমি প্রথমে আমার কাছে চেপে যাও। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তা যুক্তি সঙ্গতও। কারণ সবারই কিছু না কিছু প্রাইভেসি থাকে। এবং আমিও তা জিজ্ঞেস করে তোমায় বিব্রত করতে চাই না।

এই তো একটা বিবেচকের মত কথা বলেছো।

—তা আমায় এখন কি করতে হবে?

—তুমি ফোনে মিঃ ডিনসমেডের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমরা সেখানে উইক-এণ্ডে যেতে চাই।

—হঠাৎ গিয়ে সার প্রাইজ ভিজিট দিলে হয় না?

—না কারণ আমরা এমন একটা দিনে যেতে চাই যেদিন বাড়ির সকলে উপস্থিত থাকবে।

—ও। অর্থাৎ তোমার সকলকেই প্রয়োজন?

—হ্যাঁ। তবে ফোন এখন করবে না।

—কেন?

—ডিনসমেড হয়তো এখনো বাড়ি ফেরেনি। একটু অপেক্ষা করো।

—ঠিক আছে।

—তুমি ফোন করলে হয়তো ডিনসমেড তোমায় যেতে বারণ করবে না। করলে অভদ্রতা হবে। সে হয়তো রাজি হয়ে যাবে। আর আসার কারণ যদি একান্ত ভাবে জানতে চায় তাহলে বলবে, সেদিন আপনাদের ওখান থেকে ফিরে আমার এক বন্ধুকে আপনাদের আতিথ্যের কথা বলতে এবং জায়গাটা সুন্দর শুনে সে আসতে চাইলো। তাই ফোন করে আপনাকে……।

—গুড পয়েন্ট।

—আর সেদিন আমি যার সঙ্গে কথা বলবো তখন তুমি অন্যদের ব্যাস্ত রাখবে।

—তাই হবে।

তারপর আরো কিন্তু দরকারী কথার পর পোয়ারো বললো, এবার ফোন করতে পারো। ডিনসমেড এতক্ষণে হয়তো বাড়ি পৌঁছে গেছে, অন্তত আমার তাই ধারণা।

পনেরো

—আরে আসুন। আসুন? ডিনসমেড পোয়ারো এবং চার্লসকে উষ্ণ আহ্বান জানায়।

তারপর সকালের ব্রেক ফাস্টের পর বেশ কিছু মামুলী কথাবার্তা হয়ে চললো? তাদের সঙ্গে পোয়ারো আছে। এরপর এক সময় পোয়ারো জর্জের দিকে তাকিয়ে বললো, চলো, তোমাদের বাগানটা ঘুরে দেখে আসি।

চলুন, জর্জ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—ততক্ষণে চার্লস, তুমি বাবার সঙ্গে গল্প করো।

—হ্যাঁ, আর তোমার তো এদিকের কিছুই দেখা হয়নি, তারপর পোয়ারো সকলের দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে আমি একটু…।

নিশ্চয়ই, সুশান বলে ওঠে।

পোয়ারো জর্জের সঙ্গে বাগানে প্রবেশ করে বাগানের খুব প্রশংসা করলো। অথচ বাগানটা অযত্ন আর অবহেলায় কাঁটা ঝোপঝাড়ে ভর্তি হয়ে উঠেছে। এবং অনেক ফুলের গাছ মরে শুকিয়ে রয়েছে।

. তারপর পোয়ারো আরো কিছু সাধারণত কথাবার্তার পর বলে, জর্জ, তুমি তো কলেজে ভর্তি হয়েছো, তাই না?

—হ্যাঁ, জর্জ মাথা দোলায়।

—তোমার কোন সাবজেক্টের প্রতি আগ্রহ বেশী?

—সাইন্সের উপর।

—ভেরি গুড!

—জানেন, আমি বাড়িতে একটা ছোট মত ল্যাবোরেটরি বানিয়েছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। বাড়িতে গিয়ে আপনাকে দেখবো।

—ঠিক আছে। তবে জর্জ, ল্যাবোরেটরিতে টেস্টের জন্য নিশ্চয়ই নানা রকম জিনিস পত্তর যোগাড় করো?

—হ্যাঁ। যেমন এখন আরসেনিকের চেষ্টায় আছি, আর কলেজের বেহারাকে বলেছিও।

—সে কি বলেছে?

—বলেছে ম্যানেজ করে দেবে।

—ওটা তুমি আনবে না, এখন বাড়িতে কিছুদিন এ ধরণের জিনিষ এনো না।

—এতো টেস্টের জন্য লাগবে।

—তবুও।

—কিন্তু……।

—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। আমার কথা মত কাজ করো। নইলে বাড়িতে বিপদ ঘটতে পারে।

—মানে টেস্ট করার সময়……।

—না, না, আমি সে বিপদের কথা বলছিনা।

—তবে?

—কারণটা আমার কাছে জিজ্ঞেস করো না। শুধু গুরুজন হিসেবে তোমায় যে অনুরোধটা করলাম তা দয়া করে রেখো।

—কিন্তু এখন আরসেনিক না হলে অনেক কিছুই টেস্ট করতে পারবো না।

—তবু জর্জ, প্লীজ!

—আচ্ছা।

—তোমাতে আমাতে যে এ ধরণের কথাবার্তা হয়েছে তা যেন কেউ জানতে না পারে এখন কি তোমার মা, বাবা এবং দিদিরা পর্যন্ত নয়।

—আপনার কথা শুনে আমার রীতিমতন ভয় করছে॥

—এতে ভয়ের কিছু নেই, পোয়ারো জর্জের পিটে হাতে রাখে। একটু সাবধান থাকলেই চলবে।

পোয়ারো একা একা বাগানে ঘুরছিল। তখন মেরী সেখানে হাজির। বললো, মিঃ চার্লস বলছিলেন, কখন কোন গাছ লাগাতে হয় সে ব্যাপারে আপনি নাকি বেশ অভিজ্ঞ।

পোয়ারো বুঝতে পারে, এটা চার্লসের একটা চালাকি। কারণ মেরীর সঙ্গে কথা বলতে হলে একটু নির্জনতা প্রয়োজন। তাই সে কৌশল করে তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর এ ব্যাপারে তো দু' বন্ধুর মধ্যে আগে ভাগেই কথাবার্তা হয়ে আছে।

—অভিজ্ঞ ঠিক নয়, তবে একটু আধটু বলতে পারি আর কি, বলে পোয়ারো সত্যি মিথ্যে বলে একটা দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপরই পোয়ারো একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভাবে, এখনিই কাজের কথাটা সেরে নেওয়া দরকার। নইলে এরপর আর বেশী সময় পাওয়া যাবে না।

তাই পোয়ারো বলে। মিস মেরী, সেদিনের কথাটা সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন?

—কোন কথাটা বলুন তো? মেরী জানতে চায় যদিও সে বেশ ভালো করে জানতো পোয়ারো তাকে এ কথাটা জিজ্ঞেস করবে।

—সেই এস. ও. এস. সম্বন্ধে।

—না।

—তবে এ কথা ঠিক যে, কথাটা আপনিই লিখেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন লিখতে গেলেন ?

—তা তো জানি না। আমার সব সময়ই মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটবে।

—কি ঘটতে পারে বলে আপনার ধারণা ?

—তাতো ঠিক বলতে পারছি না।

—তবে একথাটা কেন মনে হচ্ছে, আর কবে থেকেই বা ?

—তা ধরুন, প্রায় বছর খানেক ধরে।

—তখন থেকে কি দেখে আসছেন ?

—মানে মানুষের মনে কখনো হঠাৎই একটা কথা মনে হয় না, সেই রকম আর কি !

—ও। মানে সঠিক কারণটা খুঁজে পাচ্ছেন না ?

—না।

—এ ব্যাপারে আপনাকে কেউ কোন রকম ইঙ্গিত দিয়েছে ?

—না।

—তাহলে একবারে হঠাৎই ভাবতে লাগলেন ?

—হ্যাঁ। তবে আজ থেকে বছর খানেক আগে বাবা আমায় এক ভদ্রলোকের বাড়ি নিয়ে গেছিলেন।

—কেন ?

—তাতো জানি না।

—ওখানে গিয়ে আপনার বাবা কি করলেন ?

—আমায় সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

—দিয়ে কি বললেন ?

—কিছুই বললেন না। মেরী আরো যোগ করে। উহুঁ শুধু বাবা বললেন, তুমি এখন বাইরের ঘরে গিয়ে বসো।

—আচ্ছা সেই ভদ্রলোককে দেখতে কেমন ?

—মাথায় বিরাট টাক, রোগা লম্বা ধরণের, চেহারা, বয়স ষাটের কাছে।

—ভদ্রলোক কি করেন বলে মনে হয়?

—মনে হয় উকিল।

—কিসে বুঝলেন?

—ওঁনার সামনে একটা আইনের বই খোলা ছিল, আর একটা ব্যাপার আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে।

—কোন ব্যাপারটা?

—বাবা একই রাস্তায় বার কয়েক গাড়ি এদিক ওদিক ঘোরাবার পর সেই বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

—কেন?

—জিজ্ঞেস করতে বাবা বলেছেন, পথটা নাকি চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল।

—সেই বাড়িটা এখন আপনি চিনতে পারবেন?

—না।

কেন?

—অচেনা রাস্তা তো। তার উপর ঐ ভাবে ঘোরাঘুরি করতে রাস্তাটা চিনতে পারিনি।

—তবে বাবা ফেরার পথে অন্য রাস্তা ধরে এসেছিলেন।

পোয়ারো ভাবে, কেন ডিনসমেড একই রাস্তা কয়েকবার ঘোরার পর সেই বাড়িতে গেল। আর ফেরার পথেই বা অন্য রাস্তা দিয়ে কেন বাড়ি ফিরলো, এবং সেই লোকের কাছে মেরীর নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাকে কেন বৈঠকখানা ঘরে সরিয়ে দেওয়া হলো। সেই লোকটিই বা কে। আর তার সঙ্গে ডিনসমেডের সম্পর্কই বা কি।

তারপর পোয়ারো বলে, আচ্ছা মিস মেরী, তখন আপনার সঙ্গে আর কেউ ছিল কি?

—না।

—ঠিক মনে করে বলছেন তো?

—হ্যাঁ।

—আর সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে যাবার কথা কিন্তু ভাবলো?

—না, না, তার কোন দরকার নেই। আমি সম্পূর্ণ নরম্যাল।

—থাকলেই সব চেয়ে আমি খুশী হবো।

—আমার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু দেখছেন?

—না, নেহাৎ চার্লসের বন্ধু সাইক্রিয়াটিস্টের একজন ডাক্তার বলেই……।

—মিঃ চার্লাসকে আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবে।

—নিশ্চয়ই জানাবো।

—এবার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—ও সিওর। পোয়ারো মাথা নাড়ে।

—আপনি আমায় ওসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—আপনার মুখে এস. ও. এসের কথা শুনে, আর চার্লসও আপনার ব্যাপারে উদবিগ্ন প্রকাশ করায়……।

—আচ্ছা, আচ্ছা।

—আশা করি আজকের আলোচনাটা গোপনই থাকবে।

—আপনি বললে নিশ্চয়ই।

—রাখলে খুশী হবো।

—তাই হবে।

—ধন্যবাদ!

—মিঃ চার্লস বলছিলেন, আপনার নাকি ঘণ্টায় ঘণ্টায় কফি প্রয়োজন, আমি আপনার জন্য কফি নিয়ে আসি।

পোয়ারো মেরীকে সায় জানিয়ে ভাবে, এর মধ্যেও চার্লসের কোন একটা চাল রয়েছে। হয়তো এখনই শার্লট কফি হাতে বাগানে হাজির হবে। আর হলোও তাই।

হঠাৎ শার্লট বাগানে প্রবেশ করতে দেখে পোয়ারো তার দিকে এগিয়ে যায়। সেই সঙ্গে মুখটা সে হাসিতে ভরিয়ে তুলতে ভুলে যায় না।

শার্লটের হাতে ধূমায়িত কফির কাপ। তা দেখে পোয়ারো ভাবে চার্লস দিনকে দিন বেশ চালাক হয়ে উঠেছে। না, বাড়ি গিয়ে ওকে এক বোতল স্যাম্পন খাওয়াতে হবে।

—আর মিস শার্লেট। পোয়ারো মুখখানা শিশুর মত করে শার্লটের কাছে এগিয়ে আসে। আপনি আবার কষ্ট করে কেন কফি নিয়ে এলেন!

—কষ্টের এতে কিছুই নেই, শার্লট মিষ্টি করে হেসে কাপটা পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দেয়, আর আপনি হলেন গিয়ে আমাদের অতিথি। এবং আপনার বন্ধুর মুখে শুনলাম, আপনার ঘণ্টায় ঘণ্টায় কফি প্রয়োজন।

—হ্যাঁ, একটা বাজে অভ্যাস করে বসে আছি।

—তাতে লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।

—ধন্যবাদ!

—আপনার স্যুটটা ভারি চমৎকার। আর আপনাকে মানিয়েছেও দারুণ! নজর কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট।

—তবে এখন আমায় কিন্তু একটা কথা বলতে হয়।

— বলবেন বই কি!

—এ মুহূর্তে আপনাকে বনদেবীর মত লাগছে।

—না। না। শার্লট খুশী।

পোয়ারো কফিতে চুমুক দিয়ে শার্লটের চুলের দিকে তাকায়। ধূসর রঙের চুল। কাঁধ ছাপিয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে।

তারপর পোয়ারো বলে, আপনার চুল কিন্তু ভারি সুন্দর।

—আর সুন্দর কি ।

—আজ কাল এত লম্বা চুল দেখাই যায় না। সবাই ওর তরে ঝামেলা এড়িয়ে যায়।

—আমারও মাঝে মধ্যে বিরক্ত ধরে যায়। সামলাতে বড় কষ্ট হয়। একটু অযত্ন হলেই জটা বেঁধে যায়। গেলে একটা দারুন কষ্টের ব্যাপার।

—তাই বলে যেন আবার কেটে ফেলবেন না।

—না, তা ঠিক আবার চাই না।

—বড় চুলের সৌন্দর্যই আলাদা।

—মাও সেই কথা বলেন।

—আমার একটা ইচ্ছের কথা বলবো।

—বলুন।

—কিছু মনে করবেন না তো।

—উহুঁ।

—আপনার চুলে একটু হাত বোলাতে ইচ্ছে করে। এমন রেশম কোমল চুল বড় একটা দেখা যায় না। যাকে বলে রেশম কোমল।

—ইদানীং চুলে তো তেমন যত্নই নিতে পারি না, শার্লট এড়িয়ে যেতে চায়।

—তবু একটু……, পোয়ারো শার্লটকে আচমকা কাছে টানে এবং টানটা এমনভাবে দিল যাতে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। মিস শার্লট……।

—বলুন।

—এ কি আপনার ফল্‌স হেয়ার ?

—কই না তো। শার্লট চমকে ওঠে।

—নিজেই দেখুন।

শার্লটের মাথার চুলের ক্লিপ আচমকা টানে খুলে গেছে। তা সঙ্গে সঙ্গে সে ঠিক করতে করতে বলে। আমি ভিতরে যাই।

—উহুঁ, পোয়ারোর বাহু ডোরে শার্লট বন্দী। শার্লট আমার

কাছে সত্যি কথা বলো।

—আমি ইচ্ছে করেই এমন চুল ব্যবহার করি।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস না করার কি আছে।

—আছে বই কি!

—আপনি বিশ্বাস করুণ।

—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। সেকথা তো প্রথমেই আপনাকে বলেছি।

—আপনি কে? শার্লট সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকায়।

—আমি চার্লসের বন্ধু।

—হ্যাঁ, তা হতে পারেন। কিন্তু আপনার প্রকৃত পরিচয় কি?

—মানুষ।

—সে তো আমরা সবাই। আপনার সত্যি পরিচয় কি?

—একজন প্রফেসার।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—শার্লট! আমি তোমায় ভালবাসি, বলে পোয়ারো শার্লটকে বুকের মাঝে টেনে নেয়।

—কিন্তু .....।

—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। এবার শার্লট, বলে তোমার এমন সুন্দর সোনালী চুল থাকা সত্ত্বেও কেন এমন ধূসর চুলের পরচুলা পরে থাকো।

—থাকতে বাধ্য হয়েছি।

—কিন্তু কেন?

—এ ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই বলে।

—কেন আমি সেই কথা তো তোমার কাছে জানতে চাইছি।

—রাস্তায় বেরুলে সবাই একই প্রশ্ন করতো। শেষে মায়ের কথা মত।

—কিন্তু তোমার মায়ের চুল তো সোনালী নয়।

—তা ঠিকই।

—তাহলে? তোমার বাবা, মা, ভাই বোনের কারুর তো সোনালী চুল নয়। তবে তোমার মায়ের মুখের সঙ্গে তোমার বেশ মিল আছে।

—হ্যাঁ, তাই তো ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি।

—আচ্ছা, এ পরচুলা কতদিন ধরে ব্যবহার করে আসছো?

—তা ধরুন বছর পাঁচেক হলো। শার্ল'ট একটু ভেবে বলে।

—তোমার ক'টা পরচুলা আছে?

—দুটো।

—ক'দিন অন্তর একটা দোকানে দিয়ে আসো?

—পনেরো দিন অন্তর।

—কোন দোকান থেকে এই পরচুলা কিনেছো?

—রোজী ড্রেসার্স থেকে।

—সেটা কোথায়?

—লারেন্স অ্যাভিনিয়্যুতে।

—আচ্ছা, তোমার ছোটবেলাকার কোন ঘটনা মনে আছে?

—না, ঠিক মনে করতে পারছিনা। তবে দশ বারো বছর বয়সের একটা ঘটনা……

—না, তার কোন দরকার নেই। আচ্ছা, তোমার জ্ঞান হওয়া বয়স থেকে এখানে আছো?

—না।

—এর আগে কোথায় ছিলে?

শার্ল'ট রজার্সের অ্যাপার্টমেন্টের কথা জানাতে পোয়ারো বলে, সেটা তো ভাড়া বাড়ি ছিল তাই না?

—হ্যাঁ।

—তুমি ইদানীং বাবার সঙ্গে কোথাও ঘুরতে গেয়েছিলে?

—ঘুরতে নিয়ে যাবে বাবার সে সময় কোথায়।

—উইক-এণ্ডে ?

—তাও নয়। বাবা তখন তার ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে নানাভাবে ব্যস্ত থাকেন।

—আর এস. ও. এসের. ব্যাপারে কিছু ভাবলে ?

—মানে ?

—মানে আমি বলতে চাইছি। হঠাৎ সেদিন ও কথাটা লিখতে গেলে কেন ? কারণ কি ?

—জানি না। একবারে হঠাৎ লিখে ফেলেছি।

—আচ্ছা. আগের মত তোমার বাবা মাকে চিন্তিত দেখো ? আর তুমি হঠাৎ গেলে আলোচনা থেমে যায় ?

—হুঁ।

—তুমি একটু সাবধানে চলবে।

—হঠাৎ এ কথা বললেন ?

—তোমার ভালোর জন্যই।

—আপনার কথা শুনে আমার ভয় করছে।

—ভয়ের কিছু নেই। তবে বাবার সঙ্গে কোথাও গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানাতে ভুলবে না।

—আচ্ছা। আমি এখন ভেতরে যাই।

—এসো।

—মিসেস ডিনসমেড, আপনার সঙ্গে ছেলে মেয়েদের কিন্তু খুব মিল আছে, পোয়ারো বলে।

মায়ের ছেলে মেয়ে তো! সুশান হাসে।

—তবে জর্জ একটু ব্যতিক্রম।

ও ওর বাবার মত দেখতে হয়েছে।

—হ্যাঁ, এ কথাটা তো মনে হয়নি। আসলে ব্যাচিলার মানুষ

তো……। জর্জ হুবহু আপনার স্বামীর মত দেখতে। একেবারে যেন তার মুখ বসানো।'

—হ্যাঁ, একথা অনেকেই বলে।

—তবে মিস শার্লট আপনার মুখ পেলেও চুলের রং কিন্তু পায়নি পোয়ারো স্পষ্ট লক্ষ্য করলো, চুলের কথা বলতে গিয়ে সুশান কেঁপে উঠলো না। এবং মুখটা বেশ স্বাভাবিক রয়েছে। ফলে মুখে ভাঁজ পড়লো না।

কথাটা বলেই আবার পোয়ারো ভাবে, সুশান যথেষ্ট চালাক চতুর মহিলা। তার ইঙ্গিতটা ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছে। এতে সে শার্লটের উপর রেগে যেতে পারে। এবং নির্যাতন করা ও অসম্ভব নয়। কিন্তু পোয়ারো ভাবছে, সোনালী চুল অনেকেরই থাকে তা ঢাকবার জন্য কেন শার্লট ধূসর চুল ব্যবহার করতে শুরু করলো। এবং তাকে কি করতে বাধ্য করালো সুশান। শুধু কি লোকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য? না এর পিছনে অন্য কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। তারপর হঠাৎই পোয়ারোর একটা কথা মনে পড়ে। তবে কি শার্লট সুশানের মেয়ে নয়। কিন্তু কিছু তো মিল রয়েছে, তা থাক। ডিনসমেডের কি আগের পক্ষের স্ত্রীর মেয়ে? তাহলে সুশান কি ডিনসমেডের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী?

—হঠাৎ একটা কথা ভেবে পোয়ারো বলে, জর্জের বয়স কত হলো?

—পনেরো।

—মিস মেরীর?

—প্রায় আঠারো হাত চলেছে।

—আর শার্লটের?

—সতেরো।

—আমি কিন্তু শার্লটকে বড় ভেবেছি। পোয়ারো কথটা ইচ্ছে-করেই বললো।

—হ্যাঁ, এ কথাটা কেউ কেউ বলে বটে।

—সত্যি, মেয়েদের বয়স বোঝা যায় না। ও হ্যাঁ ভালো কথা, আপনাকে একটা অনুরোধ করবো।

—তা কথাটা কি?

—আমি যে কলেজে প্রফেসারী করি, সেই কলেজেরই একটি অল্প বয়েসী বেয়ারা আছে। একবারে টেম্পোরারী কাজ করতো। এসব আমি কিছুই জানতাম না। ও যার জায়গায় কাজে লেগেছিল সে জয়েন করতে ওর চাকরি গেছে। তখন ওর যে কি কান্না।

পোয়ারো কথার মাঝে সুশাসনের ভাবসাব লক্ষ্য করে। তারপর বলে এই ছেলেটিকে যদি আপনি রাখেন।

এরপর পোয়ারো বলে, আপনার তো কাজের কোন ছেলে বা মেয়ে নেই।

—না।

—তাই আপনি যদি তাকে রাখেন।

—হ্যাঁ, রাখতে অসুবিধে নেই। তবে মাইনে কিন্তু বেশী দিতে পারবো না। আজকাল বাজারের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তার জন্য অসুবিধে হবে না। ওর একটা গতি হলেই বাঁচি। ও আবার আমায় দারুণ ভাবে ধরেছে। আর আমাব এবং চার্লসের বাড়িতে কাজের লোক না থাকলে আপনাকে আদৌ বিরক্ত করতাম না।

—ঠিক আছে।

—কবে পাঠিয়ে দেবো?

—সামনের সপ্তাহে।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমায় একটা বিরাট চিন্তার হাত থেকে বাঁচালেন।

—কি আর আপনার জন্য করতে পেরেছি। আর আমাদের সাধ্যও বা কি।

—যা করেছেন এই যথেষ্ট।

তা ছেলেটির বয়স কত ?

—বিলো টুয়েন্টি।

—ঠিক আছে।

—তাহলে সামনের সপ্তাহে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—আচ্ছা।

—মিঃ ডিনসমেড, একদিন কিন্তু আমার বাড়িতে ওদের সবাইকে নিয়ে যেতে হবে। পোয়ারো ডিনসমেডকে অনুরোধ জানায়।

ওদিকে চার্লস তার কর্তব্যে অবিচল। সে পোয়ারোর পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী তাকে একা সবার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছে।

—কিন্তু আমার যে একবারে সময় হয় না। ডিনসমেড জানায়। ব্যবসা নিয়ে একেবারে ফেঁসে গেছি। তার উপর আবার একার ব্যবসা তো।

—তবু যে কোন একদিন, আর উইক-এণ্ড তো আমি সম্পূর্ণ ফ্রি থাকি।

—চেষ্টা করবো।

—আপনি ওদের নিয়ে তো বের হন ?

—না। বললাম যে একবারে সময় হয় না। বছর কয়েকের মধ্যে ওদের নিয়ে কোথাও বের হইনে।

—তবু আমার জন্য একটি বার চেষ্টা করবেন। বলেই পোয়ারো ভাবে মেরী বলেছিল, বছর খানেক আগে বাবা তাকে এক ল' ইয়ারের বাড়ি নিয়ে গেয়েছিল এবং সে বাড়ি যেতে একই রাস্তায় বার কয়েক ঘুরিয়েছিল আর ফেরার পথে অন্য রাস্তা ব্যবহার করেছিল। কিন্তু কেন ?

—আচ্ছা, আচ্ছা।

ষোল

এখন সকাল সাড়ে দশটা এবং স্থান হলো গিয়ে রজারের বৈঠকখানা আর উপস্থিত রয়েছে পোয়ারো এবং গৃহস্বামী রজার। সামান্য দু'চারটে কথার পর রজার একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বলে। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নামটাই জানা হলো না।

পোয়ারো খুব সহজ ভাবে জবাব দেয়, বিলি জোন্স।

ধন্যবাদ!

আপনার পরিচয়টা!

—আমি ইনকামট্যাক্স থেকে আসছি।

—ইস। একথা আগে বলবেন তো। রজার বেশ ভীত হয়ে পড়ে। তার উপর সে এমনিতেই একটু ভীতু ধরণের মানুষ। পোয়ারোর পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া তো দূরের কথা সে তাকে খাতির করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

রজার হেসে বলে, স্যার, পানীয় না গরম কিছু ব্যবস্থা করতে বলবো।

—মিঃ রজার তার কোন দরকার নেই।

—স্যার, সে কথা বললে কি হয়?

—মিঃ রজার, আপনি আদৌ ব্যস্ত হবেন না। তাছাড়া, আমি বাড়ি থেকে একটু আগে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি।

—তবু স্যার কিছু।

—ঠিক আছে, যাবার আগে……। আচ্ছা আপনার এ বাড়ি কত দিনের?

—সে স্যার, সাট সত্তর বছর তো হবেই।

—এক তলাটা পুরো তো ভাড়া, তাই না?

—হ্যাঁ।

—আর দোতালাটাও তো তাই?

—স্যার হলে কি হবে! দোকানের ভাড়া তো নামে মাত্র।

—কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া তো ভালোই।

—স্যার, পুরনো ভাড়াটে। ভালো কি আর কখনো হয়!

—উহুঁ। এভাড়া তো আপনি বছর তিনেক হল বসিয়েছেন।

—স্যার, ঐ তা হলেও ভাড়া বেশী নয়।

—কিন্তু কমও নয়। এটা পোয়ারো নির্দিষ্ট অ্যাপোর্টমেন্ট গিয়ে ভাড়াটের কাছ থেকে নিজের পরিচয় জানিয়ে জেনে এসেছে। এবং পরিচয়টা গোপন রাখতে বার বার অনুরোধ করেছে। এবং সে কথা দিয়েছে রাখবে।

—এ আর কি।

—আপনি রিটার্ন সাবমিট করেন?

—স্যার, আয় বা কি যে করবো।

—সে কথা বললে তো আয়কর বিভাগ শুনবে না।

—স্যার, একটা উপায় করে দিন।

—ঠিক আছে। আপনাকে বাঁচাতে পারি এক শর্তে।

—স্যার। শর্তটা বলুন। আমি এক কথায় সে শর্ত পালন করতে রাজি। অর্থাৎ রজার ভাবলো, তাকে কিছু খরচ করতে হবে।

—মিঃ ডেনসমেডকে আপনি চেনেন?

—স্যার, চিনবো না? আমার এখানেই তো ছিলেন। এবার স্যারের কৃপা দৃষ্টি বুঝি……।

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। তা কতদিন আগে ছিলেন?

—তা ধরুণ, বছর পনেরো আগে হবে।

—উনি চলে গেলেন কেন?

—তখন আমার ছেলের এখানে ট্রান্সফার হয়ে আসার কথাছিল। সে কথা বলে তাকে প্রায়ই চাপ দিলাম। তারপর ই…।

—এরপর উনি ছেড়ে দিলেন।

—হ্যাঁ।

—বেস ভালো লোক বলতে হবে।

—হ্যাঁ স্যার।

—তখন তার আয় কেমন ছিল?

—কোন রকম।

এ কথা বলছেন কেন।

—মানে তখন তার ব্যবসা ভাঁটার দিকে চলছিল।

—তা কি করে হবে।

—কেন স্যার?

—তিনি 'তখন বাড়ি কিনে কি করে চলে গেলেন?

—গেলেন তো।

—কোথায়?

—প্লেন উড়ে।

—আপনি সেখানে গেয়েছিলেন?

—না স্যার।

—আচ্ছা, মিঃ ডিনসমেড যখন এখান থেকে যান তখন তার সংসারে ক'জন লোক ছিল?

—চার জন।

—কে কে?

—তিনি, তার স্ত্রী এবং তার এক ছেলে ও মেয়ে।

—এক ছেলে এক মেয়ে।

—হ্যাঁ।

—আপনি ঠিক মনে করে বলছেন তো?

—হ্যাঁ।

—তার ছেলের নাম কি?

—তখন ছিল জর্জ।

—বয়স ছিল কত?

—দেড়।

আর মেয়ের?

—তিন।

—তার নাম আপনার মনে আছে কি?

—না।

—কেন?

—ওর নির্দিষ্ট কোন নাম ছিল না।

—আচ্ছা। ওদের এর মাঝে আর কোন সন্তান হয়েছিল কি?

—না। তেমন তো কিছু শুনি নি।

—আচ্ছা, মিঃ ডিনসমেড অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন কি?

—না, হলে কি আমি জানতাম না!

—তখন তাহলে এ ছাড়া তাদের আর কোন সন্তান ছিলো না তো।

—না স্যার।

—কোন মেয়েকে কি তারা আশ্রিতা হিসেবে রেখেছিলেন কি?

—আশ্রিতা? না।

—মেরী বলে কি কোন মেয়ে তাদের কাছে ছিলো?

—উহুঁ।

—আচ্ছা, উইক-এণ্ডে মিঃ ডিনসমেড কি করতেন?

—বাড়িতেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন। তবে কখনো সখনো এক আধ ঘণ্টার জন্য ছেলে মেয়েদের নিয়ে বেরুতেন।

—তখন তাদের সঙ্গে কোন অন্য মহিলা থাকতো কি?

—না।

—মিঃ ডিমসমেড কখনো অন্যত্র গিয়ে থাকতেন কি?

—মানে তো পড়ে না। লোকটা শুধু ব্যবসা আর বাড়ি নিয়ে

থাকতো। এ ছাড়া অন্য কিছু যেন জানতো না।

—আচ্ছা, মিঃ ডিনসমেডের কি দ্বিতীয় পক্ষ ছিল।

—দ্বিতীয় পক্ষ? না, না! এক সংসার চালাতে গিয়ে সে রীতিমতন হিমসিম খাচ্ছিল তার আবার দ্বিতীয় বার বিয়ে।

—তবু মানুষ করে।

—ও সে ধরণের মানুষ ছিল না।

—আচ্ছা, এখানে থাকাকালীন মিঃ ডিনসমেডের এখানে কার যাতায়াত বেশী ছিল।

—একমাত্র রবার্ট বলে ওর এক বন্ধু আসতো।

—রবার্ট? এছাড়া আর কেউ?

—না। তেমন তো কাউকে দেখিনি।

—রবার্ট থাকে কোথায়?

—ওর মুখেই শুনেছিলাম ভিক্টোরিয়া টর্মিনাসে থাকে।

—কত নম্বর তা জানেন?

—উহুঁ। সে আর বেঁচে নেই।

—তার কি হয়েছিল?

—ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়।

—কেমন করে অ্যাকসিডেণ্ট হয়?

—তা ঠিক মনে নেই।

—ভদ্রলোক কিসে কাজ করতেন?

—ব্যাঙ্কে।

—পেশা আলাদা। অথচ দু'জনে বন্ধু ছিল?

—হ্যাঁ, কলেজে এক সঙ্গে পড়তো নাকি।

ও। আচ্ছা, মিঃ রবার্ট মারা যাবার পর তার সংসারে আর কে কে ছিলেন?

—তা ঠিক জানি না।

—আপনার বাড়ির আশে পাশে কোন ল'ইয়ার থাকেন?

—না। ধারে কাছে কেউ নেই। তবে একজন পাবলিক প্রসিকিউটার আছেন।

—তার কোন ল'ইয়ার বন্ধু তার বাড়ি কিংবা অফিসে আসতো কি না জানেন?

—বলতে পারবো না।

—ঠিক আছে আমি চলি।

আচ্ছা।

সতেরো

এখন সময় সকাল দশটা। পোয়ারো হেনেসের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর চারদিকটা একটু ভালো করে দেখে নিয়ে সে কোলিং বেল্টা পুস করে।

কোন সাড়া শব্দ নেই, বেলটা অন্ধকারের মাঝে একবার চিৎকার করেই যেন আবার হারিয়ে গেল।

পোয়ারো আবার বেল বাজায়। এরপর মিনিট খানেক অপেক্ষা করার পর হেনেস এসে দরজা খুলে দেয়।

পোয়ারো হেনেসের দিকে তাকায়। বয়স পঁচাত্তর, ছিয়াত্তর হবে বয়সের ভারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। লম্বা ধরনের শীর্ণ চেহারা। চোখে মোটা কাচের চশমা। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। আর যে ক' গাছা আছে তা শনের মত এদিক ওদিক ঝুলছে।

—গুড মর্নিং!

—গুড মর্নিং, হেসেন পোয়ারোর দিকে তাকায়।

—আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

—আসুন, ভেতরে আসুন।

—তারপর পোয়ারোকে একটা জীর্ণ বৈঠকখানা ঘরে বসতে হেসেন বলে, আপনার পরিচয়টা জানতে পারলে খুশী হোতাম।

—আপনার উপরের অ্যাপার্টমেন্টে যে মিঃ রবার্ট থাকতেন আমি তারই বন্ধু, পোয়ারো জানতো, তাকে প্রথমেই এই রকম একটা কথার মুখোমুখি হতে হবে। তাই সে কথাটা আগে ভাগেই ঠিক করে রেখেছিল।

—মিঃ রবার্ট তো আর বেঁচে নেই, হেনেস আহত কণ্ঠে জবাব দেয়।

—হ্যাঁ, এসে তাই শুনলাম, পোয়ারোকে কিছুটা বিমর্ষ দেখাতে থাকে যেন রবার্টের শোকে সে মর্মাহত। মাঝে দশ বারো বছর ওর সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে পারিনি।

—বাইরে ছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ। আচ্ছা, রবার্টের মৃত্যু কি ভাবে হয়?

—রেলওয়ে অ্যাকসিডেণ্টে, বলে হেনেস স্টেশনের নামটি জানায়

—ওখানকার স্থানীয় পুলিশ কি বলেছে?

—বলেছে, অ্যাকসিডেণ্টেই মারা গেছে।

—ভেরি স্যাড॥

—সত্যি, বড় ভালো মানুষ ছিলেন।

—ওর স্ত্রী?

—আপনি দেখছি ও অনেক খবরই জানেন না।

—আসলে বাইরে ছিলাম তো।

—ওর স্ত্রী উনি বেঁচে থাকতেই মারা যান।

—ও। ওদের কোন সন্তান ছিল বা আছে?

হ্যাঁ এবং একটিই?

—সে ছেলে না মেয়ে?

—মেয়ে।

—মেয়ে? আপনি ঠিক জানেন তো? পোয়ারোকে এ মুহূর্তে কিছুটা উত্তেজিত দেখাতে থাকে।

—হ্যাঁ।

—তবু একটু ভেবে বলুন। কারণ ওর উপরে অনেক কিছু নির্ভর করেছে। তাই আপনাকে একথা বললাম।

—আমি ভালো করে ভেবেই তবে একথা বলছি, আর ঘটনাটাতো বলতে গেলে সেদিনের। হুট করে তো আর ভুলে যাওয়া যায় না।

—আচ্ছা, আচ্ছা। আর রবার্ট যখন মারা যায় তখন সেই মেয়ের বয়স কত ছিল?

—প্রায় বছর তিনেকের কাছে।

—তার নাম জানেন!

—নাম? হেনেস চিন্তা করতে থাকে। তারপর চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে বলে। না, ঠিক মনে করতে পারছিনা।

তারপর আবার হেনেস বলে হ্যাঁ, এবার একটু মনে পড়েছে। তখন ওর তো একটা নাম ছিল? ওর মা ওর নামে ডাকতো। ওর বাবার আবার সে নাম পছন্দ হতো না। আর চাকর জোন্স সব অদ্ভুত অদ্ভুত নামে ডাকতো।

—তবু তার মধ্যে একই নাম বলতে পারলে ভালো হতো।

—বৃদ্ধ হয়েছি তো। স্মরণ শক্তি অনেক কমে গেছে। সব জিনিষ এখন আর ঠিক ঠিক করে মনে রাখতে পারি না।

আচ্ছা, সে মেয়ের নাম কি শার্লট ছিল?

—শার্লট? হ্যাঁ, হলেও হতে পারে। উঃ মনটা যে কি হয়েছে না! আবার নাও হতে পারে।

—মেরী হতে পারে কি? মিঃ হেনেস আপনার এই জবাবের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

—তাহলে তো বেশ ভেবে চিন্তে বলতে হয় কিন্তু কিছুই যে মনে করতে পারছি না।

—আচ্ছা রবার্টের স্ত্রী মারা যেতে সেই মেয়েকে কে দেখাশুনো করতো?

—মিঃ রবার্টের চাকর এবং তার নাম জোন্স।

—না তবে জোন্স ছাড়া একজন শিক্ষয়ত্রী নিয়মিত মেয়েকে পড়াতে আসতো।

—শিক্ষয়ত্রী? পোয়ারো বলেই মনের মাঝে অনেক কথা তার আনাগোনা করতে থাকে।

—হ্যাঁ।

—তার নাম কি আপনার মনে আছে? পোয়ারো একটু ঝুঁকে হেনেসের দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ। জুলিয়েট। তখন ভারি মিষ্টি দেখতে ছিল। প্রায়ই এসে আমাদের খোঁজ খবর নিত। আর আমায় মাঝে মধ্যে কাজেও সাহায্য করতো।

—মিস না মিসেস? মানে আমি বলতে চাইছি, যখন সে রবার্টের মেয়েকে পড়াতো তখন সে মিস না মিসেস ছিল।

—মিস ছিল।

—তার সঙ্গে রবার্টের কি কোন রকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল? কথাটা পোয়ারো বলেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেনেসের দিকে তাকিয়ে তাকে জরিপ করতে থাকে।

—অনেকে সেই রকম বলতো। এরকম যে কিছু কিছু কথা আমার কানে যে তখন আসেনি তা নয়।

—তবে আপনার কি মনে হতো?

—ওটা একটা বাজে রটনা। তাই আমি ততটা কান দিলাম না। আর সত্যি কথা বলতে কি, তখন মিঃ রবার্ট যদি তাকে বিয়ে করতো তাহলে আমি সবচেয়ে বেশী খুশী হোতাম। কারণ তখন মিঃ রবার্টের বয়সই বা কত! আর ওর মতন সজ্জন ব্যক্তি হয় না।

—মিস জুলিয়েট কোথায় থাকেন তা জানেন? পোয়ারো আবার একটা প্রশ্ন হেনেসের দিকে ছুঁড়ে দেয়।

—শুনেছিলাম তো ধারে কাছেই থাকে, বলেই হেনেস ভাবে ওর কি প্রশ্নের শেষ নেই! একের পর এক করে চলেছে। তারপর হেনেস আবার বলে, এতদিন পরে জুলিয়েটের কি খবর পাবেন।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। বিয়ে করে হয়তো অন্যত্র চলে গেছে। এরপর পোয়ারো ফের বলে, আচ্ছা, রবার্ট এবং তার স্ত্রী মারা যেতে তাদের মেয়ের কি হালো।

—মিঃ রবার্ট মারা যেতে তার এক বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু মিঃ ডিনসমেড সেই মেয়ের ভার নিতে চাইলেন।

—তবেই বুঝি জোন্স মেয়েটিকে দেয়।

—না।

—তবে ?

—প্রথমটা সে বলেছিল মেয়েকে দেবে এবং সেই মত তাকে আসতেও বলে। তারপর মিঃ ডিনসমেড এসে শোনেন, জোন্স মেয়ে নিয়ে উধাও। সেই সঙ্গে অ্যাপার্টমেণ্ট এবং ফার্নিচারও বেচে দিয়েছে।

—কোথায় গেছে বলে আপনি কিছু জানেন ? পোয়ারো ভাবে। এই জোন্সের দেখা পেলে সঠিক খবরা-খবর পাওয়া যাবে।

—না। কি জানা যায়নি। মিঃ ডিনসমেড অনেক খোঁজা-খোঁজি করেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন।

—আচ্ছা, ঐ মিঃ ডিনসমেড ভদ্রলোক বুঝি প্রায় রবার্টের কাছে আসতো ?

হ্যাঁ।

—শুধু কি বন্ধুত্বের খাতিরে, না অন্য কিছু···।

—শুনেছিলাম, দু'জনে কলেজে এক সঙ্গে পরতেন। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েও সেই কথাই মিঃ রবার্ট বলেছিলেন। হয়তো সেই সুবাদেই...।

—আচ্ছা, রবার্ট মারা যাবার কত দিন পরে জোন্স অ্যাপার্টমেণ্ট বেচে উধাও হয়।

—তা ধরুন, দিন দশ পনেরো হবে। হয়তো আমার হিসেবের মধ্যে দু' চার দিন কম বেশী হতে পারে।

—ও, ওদিকে পোয়ারো রজারের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছে ডিনসমেড তার বাড়ি ছেড়েছে রবার্ট মারা যাবার বছর দেড়েক পরে এবং সে কথা ডিনসমেডের সঙ্গেও মিলেছে। তারপর পোয়ারো

বলে, জোন্স মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে মিঃ ডিনসমেড কি স্থানীয় থানায় ডায়েরী করেছিলেন।

—এত শত আজ আর মনে নেই।

—আচ্ছা, জোন্স যার কাছে অ্যাপার্টমেণ্টটা বেচেছে সে আছে। না হাত বদলিয়েছে।

—না, আছেন। তবে এখন গেলে তার দেখা পাবেন না। তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

—ধন্যবাদ। উঠি।

—আস্থন।

আঠারো

পোয়ারো নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেণ্টে লক করতে বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে টি. ভির জোরালো শব্দ ভেসে আসছে।

যে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে সে একজন মহিলা। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছে। ভারি ধরনের চেহারা। চোখে চশমা। মাথায় এক রাশ সাদা পাকা চুলের রাশ।

—গুড মর্নিং।

—গুড মর্নিং।

—আপনি নিশ্চয়ই মিসেস ম্যাকডোনাল্ড?

—হ্যাঁ।

—মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বাড়িতে আছেন?

—না।

—তাহলে আপনাকে একটু বিরক্ত করবো।

—ভেতরে আসুন।

ঘরটা ঠিক বৈঠকখানা নয়। গোটা দুয়েক চেয়ার পাতা থাকলেও অন্য টুকি টাকি অনেক জিনিস পত্তর রয়েছে।

—আগে আমার পরিচয়টা দিই, পোয়ারো হাতলবিহীন চেয়ারে বসতে বসতে আর একটা মিথ্যে কথা বললো। তারপর সামনে বসা মহিলার দিকে তাকিয়ে পোয়ারো আবার বলে, আপনারা এ ফ্ল্যাটটা কার কাছ থেকে কিনেছেন?

—জোন্সের কাছ থেকে কিনেছি।

—জোন্স তো রবার্টের চাকর ছিল তাই না? কথাটা বলেই পোয়ারো মিসস ম্যাকডোনাল্ডকে জরিপ করতে থাকে। কথা বলতে

গিয়ে তার মুখে কোন ভাঁজ পড়ছে কিনা, অথবা তাকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে কিনা।

—হ্যাঁ, মিসেস ম্যাকডোনাল্ড মাথা নেড়ে পোয়ারোর কথার জবাব দেয়।

—লেখা পড়া কার সঙ্গে হয়েছে? বোধ হয় জোন্সের সঙ্গেই।

—হুঁ। আসলে মিঃ রবার্টের আর তো কেউ তখন ছিলেন না।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, আর তখন তো রবার্টের মেয়ে বলতে গেলে দুধের শিশু।

—হ্যাঁ। গুটি গুটি পায়ে হাঁটতো। তবে দেখতে তখনই মেয়ে রীতিমতন সুন্দরী হয়ে উঠেছিল।

—আচ্ছা জোন্স টাকাটা নিয়ে কি করলো কিছু জানেন?

—না। তবে আমার মনে হয়, ও সম্ভবত দেশে চলে গেছে।

—সম্ভবত কেন বলেছেন। ও কি আপনাকে এ রকম কিছু কথা বলেছে।

—হ্যাঁ আমাকে তাই বলেছে।

—ও।

—আর অ্যাপার্টমেণ্টটা বেচে দেবার জন্য খুব তাড়াতাড়ি করছিল। কেন ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

—ও অ্যাপার্টমেণ্ট দেবার পর কি আপনাদের সঙ্গে আর দেখা করতে এসেছিল?

—না।

—কোন চিঠি পত্তর?

—না। তা ও দেয়নি।

—আচ্ছা, সেই বাচ্চা মেয়ের নাম আপনার মনে আছে?

—নাম? কথাটা উচ্চারণ করে মিসেস ম্যাকডোনাল্ড নামটা ভাবতে থাকে। উহুঁ, ঠিক মনে করতে পারছি না। কত দিনের কথা। এখন কি আর এসব মনে থাকে।

—শার্ট ?

—না, না, অমন নাম নয়। তা আমার বেশ মনে আছে।

—মেরী ?

—হ্যাঁ। ফুলের মত মিষ্টি মেয়ের এ নাম হতে পারে। আপনার ধারণাটা হয়তো ঠিক।

—মিসেস ম্যাকডোনাল্ড, একটু মনে করে দেখুন তো, ঐ মেয়ের কোন চিহ্ন বা কাটা দাগ আছে কি না। যাতে চট করে ঐ মেয়ে বলে চেনা যায়।

—মিঃ,......, এর মধ্যে অনেক দিন পার হয়ে গেছে, মিসেস ম্যাকডোনাল্ড হাসে। আর আমি ঐ বাচ্চাকে দেখেছি বলতে এক আধ বার। এবং আমি বাচ্চার কাছে অপরিচিত বলে ও আমায় দেখা দিয়েই বলতে এক লাফে পালিয়ে যেত। পোয়ারো ভাবে ম্যাকডোনাল্ডে কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তারপর সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, চলি।

—আপনাকে এক কাপ কফি খাওয়াতে পারলাম না। এরপর মিসেস ম্যাকডোনাল্ডের একটা কথা মনে হয়। জিজ্ঞেস করে, আপনি ঐ মেয়ের ব্যাপারে এত সব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

—মানে ···, হঠাৎ এ ধরণের প্রশ্নে পোয়ারো একটু থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু এক নিমেষের ব্যাপারও নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বলে, এ মেয়ের ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম আর কি। আসলে আমার ছেলে ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সে আর একটা মিথ্যে বললো।

—ও, তাই বলুন।

—চলি।

পোয়ারো এখান থেকে বেরিয়ে কিছু দরকারী কাজ কর্ম সেরে

রবার্টের বাড়ির কাছাকাছি একটা স্কুলে গেল। এখানকার হেড মিস্ট্রেস মিসেস বার্জ তার বিশেষ পরিচিত।

পোয়ারো মিসেস বার্জের চেম্বারে হাজির হয় এবং তাকে একা পেয়ে গেল। সে কি যেন একটা কাজ করছিল।

মিসেস বার্জের ভারিক্কি ধরণের চেহারা। মেদ বহুল স্বাস্থ্য। চোখে চশমা। বয়স পঞ্চাশের নিচে।

পোয়ারোকে দেখা মাত্র মিসেস বার্জ বেল বাজিয়ে কফির কথা বলে হেসে তার দিকে তাকায়, হঠাৎ আমার স্কুলে কেন?

—স্কুলটা একটু দেখতে এলাম।

—দেখতে?

—হ্যাঁ।

—এ কথা বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই কোন মতলবে এসেছে। আপনাকে দেখলেও আমার ভয় করে। কখন যে কোনটা ধরে নাড়া দিয়ে একটা কিছু বার করে বসবেন তার ঠিক নেই।

—মতলব একটা যে নেই তা নয়।

—তা সেটা কি? মিসেস বার্জে মিটি মিটি হাসে।

—আপনার এক শিক্ষয়ত্রীর প্রেমে পড়েছি।

—প্রেম? তা আবার আপনার ক্ষেত্রেই। আদৌ বিশ্বাস করি না।

—মানে আপাতত কেউ নেই পরে তো হতে পারে।

—তাও হবে না। মিসেস বার্জ মাথা নাড়ে। আপনাকে চিনতে তো আমার বাকি নেই। এই করেই তো বেশ কাটিয়ে দিচ্ছেন।

—কোথায় কাটাতে পারছি! এখনো তো জীবনের অর্দ্ধেক পড়ে রয়েছে। এ কথাটাতো ঠিক।

—তা তো ঠিকই। এবার দয়া করে কাজের কথাটা সেরে ফেলবেন নাকি। মিসেস বার্জ একটু তাড়া দেয়।

—ব্যাস্ত আছেন বুঝি?

—ব্যাস্ত ঠিক নয়, আর আপনার ক্ষেত্র তো নয়ই, আসলে আপনার কথাটা না শোনা পর্যন্ত স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছি না। ভীষণ একটা অস্বস্তি বোধ করছি।

ইতিমধ্যে কফি এলো। কফির কাপে চুমুক দিয়ে পোয়ারো বলে, আপনার এখানে কত বছর হলো।

—কত বছর? বলেই মিসেস বার্জ ভাবে, কথাটার সঠিক উত্তর দিতে হবে, তাই সে একটু ভেবে বলে, তা ধরুণ, প্রায় বছর কুড়ি হবে।

—হ্যাঁ তা হবে।

—আপনার এখানে মিস জুলিয়েট নামে কোন মহিলা কাজ করতেন? কথাটা বলেই পোয়ারো আবার বলে, মানে বিয়ের আগে তার ঐ নাম ছিল। অবশ্য তারপর সে বিয়ে করেছে কি না আমি জানি না। এতদিনে হয়তো নিশ্চয়ই করেছে।

—মিস জুলিয়েট? নামটা মিসেস বার্জ দারুণ ভাবে ভাবতে থাকে। আচ্ছা এটা কি অনেক বছর আগের ঘটনা?

—হ্যাঁ।

—না, ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে ইদানিং কালে ও নামে পারমানেন্টলি কেউ নেই, তা আপনাকে আমি সঠিক ভাবেই বলতে পারি।

—টেম্পোরারী?

—তাহলে একটু রেজিস্টারটা দেখে বলতে হবে।

—তাই দেখুন, পোয়ারো কফিতে চুমুক দেয়। আর ঘটনাটা কিন্তু পুরোনো নয়।

—কত দিনের?

—অন্তত বছর পনেরো তো হবেই।

—ও গড!

বাঃ, এতদিনে পরে এলাম আপনাকে একটু খাতির করবো না!

বলেই পোয়ারো হাসে।

—তবে আপনার জন্য কুড়ি পঁচিশ বছর ব্যাকেও যেতে রাজি আছি। অর্থাৎ অরাজি কিছুতেই নেই।

—শুনে খুশী হোলাম, আর আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণাটাও তো দারুণ দেখতে পাচ্ছি।

—তা আর এর কাপ কফির চলবে ?

—হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা করতে হবে তা বুঝতে পারছি না। তাই শুধু মুখে বাসার চাইতে কফিই হাজার গুণে শ্রেয়।

তারপর মিসেস বার্জের নির্দেশে একজন ক্লার্ক তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওনামের কাউকে বার করতে পারলো না। এরপর পোয়ারো এখান থেকে বেরিয়ে আর একটা স্কুলে হাজির হয়। এস্কুলটার দূরত্ব খুব একটা বেশী নয়। তবে এ স্কুলেই মিস জুলিয়েটের কোন হদিস মিললো। এখানে সে টেম্পোরারী কাজ করতো। এবং এরা জুলিয়েটের নাম ঠিকানা দিলে সে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসে।

উনিশ

পোয়ারো গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবে, এবার আর জুলিয়েটের সঙ্গে দেখা করতে বেগ পেতে হবে না। সে হয়তো অনেক কিছুই জানে, আরো বিশেষ করে সে যখন শিক্ষয়ত্রী ছিল।

ছুটির দিন গুলোতে জুলিয়েট হয়তো রবার্টকে কাছে পেয়েছে। দু'জনের কাছে হয়তে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তখন তাদের মাঝে হয়তো অনেক কথা হয়ে থাকবে।

তার উপর তখন ছোট ছিল খুব ছোট। তখন তো মেয়ের নেচে কুঁদে বেড়াবার বয়স। ফলে মেয়ের দিকে তখন হয়তো জুলিয়েটের ততটা নজর দিতে হয়নি, সে সময়টা হয়তো রবার্টকে ঘিরে কাটিয়েছে।

তারপর পোয়ারো ভাবে, রবার্টের অ্যাকসিডেন্ট হলো কেমন করে। ট্রেনে থাকাকালীন ট্রেনে ট্রেনে সংঘর্ষ, অথবা···। এরপর দুর্ঘটনার নানা কারণ সে মনের মাঝে খুঁজে বেড়াতে থাকে।

পোয়ারো ভাবে, না, এর পিছনে হয়তো জুলিয়েটের কোন হাত নেই। তবে আবার থাকতেও পারে। মেয়েদের চরিত্র বোঝা ভার। হয়তো জুলিয়েট রবার্টকে চেয়েছে। সে ধরা দিতে চায়নি। আর তারই বিষময় ফল এই দুর্ঘটনা।

হঠাৎ পোয়ারো পথের মাঝে গাড়ি থামায়। দেখতে পায়, সুইন ষ্ট্রীট শুরু হয়ে গেছে। এই রাস্তার দু' পাশে সে চোখ বুলোতে থাকে। ভাবে, জুলিয়েটের ঠিকানাটা হয়তো একটু দূরে পড়বে। তেষট্টি নম্বর। তবু সে দৃষ্টি রাখতে রাখতে চলে।

সহসা পোয়ারোর সামনে নির্দিষ্ট বাড়িটা ভেসে ওঠে। এক তলা বাড়ি। বাড়ির সামনে একটু ছোট মত মাঠ। তাতে দোলনা,

স্লীপ ইত্যাদি রয়েছে। তারই এক কোনে ফুলের বাগান। অনেকটা শিশু উদ্যানের মতন।

পোয়ারো বাগানটা পার হয়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। বাড়িটার রং হলদে। তবে তাতে কালো ছাপ পড়তে শুরু করে দিয়েছে। এবং দু' এক জায়গায় চিড়ও ধরেছে। আবার কোথাও খানিকটা সংস্কারের ছাপও রয়েছে।

পোয়ারোর কলিং বেল পুশ করতে হলো না। জুটিয়েট বেরিয়ে এলো। সে তাকে দেখতে পেয়েছে।

জুলিয়েটের পরনে গাউন। বেশ ঢোলা ধরণের। তার উপর একটা হাই নেকের নীল সোয়েটার। সোয়েটারের বুক খোলা।

—গুড মর্নিং। জুলিয়েট পোয়ারোর দিকে তাকায়। তাকে সে সুপ্রভাত জানালো ঠিকই, তবে তার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করে দিয়েছে।

—গুড মর্নিং। পোয়ারো নরম চোখে জুলিয়েটের দিকে তাকায় তবে সেই তাকানোর মধ্যে যেন একটা লক্ষ্যভেদী দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

—আমাকে আসতে দেখে হয়তো কিছুটা অবাক হয়ে গেছেন, জুটিয়েটের ঠোঁটের কোণায় হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে পোয়ারোর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেয়।

—হ্যাঁ, তবে কিছুটা, পোয়ারো চতুর খেলোয়াড়। সেও মুখখানি হাসি হাসি করে তুলেছে। তারপর সে বলে, আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

—দরকার? জুটিয়েটের কেমন যেন একটা সন্দেহ হতে থাকে। বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি। বলে সে সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। আমার সঙ্গে আসুন।

পোয়ারো জুলিয়েটকে অনুসরণ করে তার অফিস ঘরে এসে বসলো। চারদিকে অসংখ্য ফাইল-পত্তর। এ ছাড়া, কাচের আলমারি ভর্তি খাতা বই ইত্যাদি।

পোয়ারোকে বলতে বলতে সে বসতে বসতে বলে, আমি মনে করছি, কোন স্কুলের ঘরে যেন এসে বসেছি।

—হ্যাঁ, এখনো জুলিয়েটের ঠোঁটে সেই কৃত্তিম হাসির প্রলেপ। তবে তার চাহনিটা কিছুটা ধারালো, যেটা অনেক মেয়ে নিজেদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

—এটা একটা কিন্টার গার্ডেন স্কুল বুঝি? পোয়ারো দৃষ্টি এখানো চারদিকে দ্রুত ঘুরছে।

—হ্যাঁ, আপনার ধারণাই ঠিক, তারপর জুলিয়েট ভাবে। বাবা, তুমি কি এ সব না জেনে এসেছো! দেখে তো অন্তত তা মনে হয় না। আর বয়সও কম করে পঁয়তাল্লিশের দিকে চলেছে।

—আপনি চালান? পোয়ারো ইচ্ছে করে জুটিয়েটের দিকে তাকায় না। যেন অতি সাধারণত একটা প্রশ্ন, যার মধ্যে কোন গুরুত্ব নেই।

—হ্যাঁ, আমি একাই চালাই, জুলিয়েট কিছুটা অসহিষ্ণু। অবশ্য যে ভাবটা সে প্রকাশ করতে পারছে না। তার আলানি বা ছটফটানি সবটাই তার ভেতরে ভেতরে।

—এর মালিক আপনি? পোয়ারো র‍্যাক, পুতুল ইত্যাদির দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে জুলিয়েটের দিকে তাকায়। জুলিয়েটের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। মাঝারী লম্বা ধরণের চেহারা। চুল বর করা। কাঁধের কাছে চুলগুলো হেলিয়ে পড়ে আছে। তাতে কালো সাদা চুলের মিশ্রণ। তবে রূপালী চুলের ভাগ সামান্যই, যা আছে, তা তাকে আরো বৈশিষ্টময় এবং কিছুটা ভারিক্কি করে তুলেছে। যা হয়তো তাকে হেড মিসট্রেস হতে সাহায্য করে থাকবে।

মুখশ্রী জুলিয়েটের লাবণ্যময়ী। দু'একটা উটকো ব্রণ, যা কিছু ঝামেলা বাঁধিয়েছে। তবে চেহারার আঁটো সাঁটো বাঁধনি তাকে চলতে ফিরতে সাহায্য করছে।

জুলিয়েটের চোখে চশমা। তা না হলে তাকে মানাতো না।

বরং চশমাটা তাকে আরো ব্যক্তিত্বময় করে তুলেছে। তবে এ চশমায় বেশী পাওয়ার নেই।

—হ্যাঁ, মালিকের কথাটা জানাতে গিয়ে জুলিয়েট কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে। সে বেশ ভালো করেই জানে। এ কথাটা তাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাতে পারে!

—এ স্কুল কতদিন ধরে চালাচ্ছেন? পোয়ারো বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে কথাটা বলে।

—তা ধরুণ, জুলিয়েট ভাবে, যদিও এ উত্তরটা তার আদৌ অজানা নয়, তবু সে ইচ্ছে করেই কিছুটা সময় নেয়। যদিও এটা এ ধরণের কথা বলার রীতি। হ্যাঁ, তা প্রায় বছর পনোরা হবে। এবার জুলিয়েটের চোখের দৃষ্টি প্রখর। সে ভেতরে ভেতরে কিছুটা মরিয়া, পোয়ারোর আসার কারণটা জিজ্ঞেস করতে না পেরে এক রাশ আস্বস্তি মরছে। তাই সে এবার স্প্রতিভ মেয়ের মত পোয়ারোর চোখে চোখে জিজ্ঞেস করে, যদিও সে কথার মধ্যে একটা ভদ্র এবং মার্জিত ভাব রয়েছে, যা তাকে ঐ পদে বসাতে সাহায্য করেছে। সে এবার জানতে চায়, আপনার আসার কারণটা যদি……।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল। পোয়ারো যেন সহসা ঘুম থেকে জেগে ওঠে। আপনার মিঃ রবার্টের কথা মনে আছে?

—মিঃ রবার্ট। জুলিয়েট চমকে পোয়ারোর দিকে তাকায়। তার দৃষ্টি সহসা অশান্ত হয়ে ওঠে। একটা অস্বস্তিতা তাকে পেয়ে বসে, যে ভাবটা সহজে মুছে ফেলতে পারে না।

পোয়ারো অনেক টাল পোড় খাওয়া মানুষ। তার সাদা চোখেই অনেক কিছু ধরা পড়ে। ফলে জুলিয়েটের সহসা কেঁপে ওঠা বিবর্ণ মুখ দেখে তার মনের মাঝে নানা কথা দোলা দিতে থাকে।

—মিঃ রবার্টের সম্বন্ধে আরো কিন্তু বললে যাকে চিনতে আপনার

সুবিধে হবে, পোয়ারো বেশ সহজ ভাবে কথাটা বলে। অবশ্য ব্যাপারটা বছর পনোরা আগেকার। তখন আপনি তার শিশু-কন্যাকে পড়াতেন।

পোয়ারো কথা শেষ করে আবার বলে, এবার নিশ্চয়ই আপনার মিঃ রবার্টের কথা মনে পড়েছে। তারপর সে গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলে, রবার্ট আমার বন্ধু ছিল। এই কিছুদিন হল এখানে ফিরেছি এবং এসে তার মৃত্যু সংবাদটা পাই।

—হ্যাঁ। এবার আমার সব কথা মনে পড়ছে, জুলিয়েটের পাতলা শুকনো ঠোঁটটা সহসা নড়ে ওঠে। হ্যাঁ, তার একটি মেয়ে ছিল।

—মেয়ে ছিল এ কথা কেন বলছেন? পোয়ারোর কপালে কুঞ্চন।

—কারণ আমার কাছে যখন সে পড়তো তখন তার বয়স এই তিনের কাছাকাছি। তারপর আর কোন খবর জানি না।

—কেন?

—তখন চাকর জোন্স তাকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং যাবার আগে মিঃ রবার্টের অ্যাপার্টমেন্ট এবং ফার্ণিচার বেচে উধাও হয়। এটা কেন সে করলো তা আদৌ বুঝতে পারছিনা।

—জোন্স কোথায় যেতে পারে বলে আপনার ধারণা?

—জানি না। ও যে মেয়ে নিয়ে পালিয়েছে তা যেন এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।

—দেশে গিয়েছে কি?

—না।

—এ কথা আপনি জানালেন কি করে?

—এবার ঘটনা আমার আস্তে আস্তে সব মনে পড়ছে।

—আমায় দয়া করে সমস্ত খুলে বলুন তো।

—ঐ মেয়েকে জোন্সের মিঃ ভিনসমেডের হাতে তুলে দেবার

কথা ছিল এবং জোন্স সে কথা তাকে জানায়ও। তিনি ছিলেন মিঃ রবার্টের বন্ধু। কিন্তু জোন্স পরে তার কথা না রেখে হঠাৎই মেয়ে নিয়ে উধাও হয়।

—তারপর? পোয়ারোর আগ্রহ উত্তর উত্তর বাড়তে থাকে, যদিও এ কথাটা তার কাছে নতুন নয়। তবে তার ধারণা হয়, হয়তো সে এর মধ্যে একটু ক্লু পেয়ে যেতে পারে।

—তখন মিঃ ডিনসমেড দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং জোন্সের দেখা না পেয়ে তার দেশে পর্যন্ত যান। কিন্তু তাকে নিরাশ হয়ে দেশ থেকে ফিরে আসতে হয়, ও সেখানে নেই।

—এ সব কথা আপনি কেমন করে জানলেন? পোয়ারো জুলিয়েটকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

—আমাকে মিঃ ডিনসমেড পরে জানিয়েছিলেন।

—আচ্ছা, তাহলে কোথায় জোন্স যেতে পারে বলে আপনার ধারণা। পোয়ারো এখন সহজ ভাবে কথা বলে চলেছে।

—বলতে পারছি না। আমি সেদিন থেকে একই কথা ভেবে চলেছি। জুলিয়েট কিছুটা চিন্তিত ভাবে কথাটা বলে।

—আচ্ছা, জোন্স যাবার পর আপনার কাছে এসেছিল, অথবা কোন চিঠি পত্তর দিয়েছিল?

—না।

—আপনার সে কথা ঠিক মনে আছে?

—হুঁ।

—আচ্ছা। সেই মেয়ের মুখ আপনার মনে আছে?

—আমি যখন ওকে দেখেছি তখন ওর তিন বছরও হয়নি। তারপর আজ ষোলো সতেরো বছর পার হয়ে গেছে। এর মাঝে মানুষের চেহারার মত পরিবর্তন ঘটে যায়।

—তা অবশ্য ঠিক। অনেক কিছুই পাল্টে যেতে পারে। আচ্ছা, ওর শরীরের বিশেষ কোন দাগ, বা চিহ্নের কথা আপনার মনে আছে

কি, যাতে চেনা যেতে পারে ওই সেই মেয়ে।

—দাগ বা চিহ্ন? কথাটা বলে জুলিয়েট ভাবতে থাকে। প্রশ্নটা হঠাৎই তার কাছে এসেছে, আরো ওটা বহু বছর আগেকার ব্যাপার, তার হদিস হুট করে পাওয়া যায় না।

—হ্যাঁ, পোয়ারো বলে একটু ভেবে বলুন।

—না, মনে করতে পারছি না, তারপর জুলিয়েট পোয়ারোকে পাল্টে প্রশ্ন করে বসে। জিজ্ঞেস করে, এবার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

নিশ্চয়ই করতে পারেন।

—আপনি ওর সম্বন্ধে এত কৌতূহলী কেন? কথাটা বলে জুলিয়েট পোয়ারোর দিকে তাকায়।

—আমি সেই মেয়েটাকে ফিরে পেতে চাই, পোয়ারো কথাটা যেন রবার্টের বন্ধু হিসেবে বললো।

—ফিরে পেতে চান? কথাটা বলেই জুলিয়েট আবার বলে। কিন্তু তাতে আপনার লাভ কি?

—লাভ লোকসানের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। অসহায় কন্যাটিকে আমার হেফাজতে রেখে একটু ভালোভাবে মানুষ করতে চাই।

—ও, এর আর কিছু জবাব জুলিয়েটের মুখে যোগালো না।

—আচ্ছা, আপনি তো রোজই এই বাড়িতে যেতেন?

—না, রোজ নয়। ছুটির দিন গুলোতে যেতাম না।

—তবুও আমার পরের প্রশ্নটা বলতে পারবেন। তখন ঐ বাড়িতে সব চেয়ে বেশী কার যাতায়াত ছিল।

জুলিয়েট একটু ভেবে বলে, মিঃ ডিনসমেডের। তিনি মিঃ রবার্টে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। স্কুলে একই সঙ্গে পড়াশুনো করেছেন।

আর কেউ?

—অন্য কেউ বড় একটা আসতো না।

—কেন?

—মিঃ রবার্ট তেমন মিশুকে মানুষ ছিলেন না।

—আচ্ছা, মিঃ রবার্টের কোন ল'ইয়ার বন্ধু ছিলেন কিনা জানেন? বলেই পোয়ারো লক্ষ্য করতে চেষ্টা করে যে, জুলিয়েট সহজ স্বাভাবিক ভাবে তার কথার জবাব দিচ্ছে কি না।

—এ ব্যাপারে আমার ঠিক জানা নেই। তবে যতদূর সম্ভব নয়। অন্তত তার বাড়িতে আমি কোন ল' ইয়ারকে আসতে দেখিনি তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

—না, না, হলফ করে বলতে হবে না। পোয়ারো হাসে। আর মিঃ ডিনসমেডের?

—তা আমার জানা নেই।

—ওদের কথাবার্তার সময় আপনি কখনো ওদের কাছে থাকতেন?

—হ্যাঁ, আমি প্রায় সময়ই থাকতাম।

——ওরা কি ধরণের কথা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন।

—মামুলী কথা। আবার অনেক সময় আমি ওদের কথার একমাত্র বিষয়বস্তু হয়ে উঠতাম। জুলিয়েট একটু রাঙা হয়ে ওঠে, যদিও এবয়সে সে রং অনেকটা ফিঁকে হয়ে এসেছে।

—আপনি?

—হ্যাঁ, আমি, জুলিয়েটের কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

—কেন?

—মানে মিঃ ডিনসমেড চাইতেন, আমার সঙ্গে……। জুলিয়েট কথাটা শেষ করতে পারে না। সে কথার মাঝে থেমে যায়।

—বলুন? থামলেন কেন?

—মানে যেন আমার সঙ্গে মিঃ রবার্টের বিয়ে হয়।

—আপনি মিঃ রবার্টকে ভালো বাসতেন?

আজ অস্বীকার করবো না। আমি সত্যি মিঃ রবার্টকে ভালো বাসতাম। অথচ প্রথম দিকে তাকে এড়িয়ে যেতাম। পরে অসহায়

মানুষটার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি।

আচ্ছা, মিঃ রবার্ট সে কথা জানতেন ?

না।

—কেন ?

—আমি তাকে কোনদিন সে কথা বলতে পারিনি। অথচ বলবার জন্য ছটফট করতাম। একদিন মনে মনে ঠিকও করেছিলাম বললো, তারপরই কি না ঘটলো সেই অ্যাকসিডেণ্ট।

—ফলে তিনি আর জানতে পারেননি, তাই না ?

—হ্যাঁ, কিন্তু মিঃ ডিনসমেড ভেতরে ভেতরে খুব চেষ্টা করছিলেন।

—কিন্তু আমি ভাবছি. অ্যাকসিডেণ্টটা কি ভাবে ঘটলো!

—চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়েই নাকি এ অ্যাকসিডেণ্ট।

—কিন্তু উনি কি এমন দরকারে পড়ল যে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গেলেন! পরের স্টেশন কি উনি নামতে পারতেন না!

—শুনলাম নাকি স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। তারপর সজাগ হয়ে উঠে ধড়ফড় করে নামতে গিয়েই নাকি এই বিপদ। আসলে কপালে থাকলে……।

—আচ্ছা, তার পরের দিন খবরের কাগজে এই সংবাদ বেরিয়েছিল। না অন্য কথা লিখেছিল ?

—সামান্যই একটু খবর বেরিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে জনৈক ট্রেন যাত্রীর মৃত্যু।

—সেদিন আপনি কি জানতেন যে, মিঃ রবার্ট ট্রেনে করে কোথাও যাবেন ? কথাটা বলেই পোয়ারো ইচ্ছে করে জুলিয়েটের দিক থেকে মুখ সরিয়ে নখ খুটতে থাকে। আসলে সে বোঝাতে চাইছে এটা যেন একটা সিধে কথা। তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

—হ্যাঁ।

—কি করে জানলেন ? এবার পোয়ারো জুলিয়েটের দিকে তাকায়।

—মিঃ রবার্ট'ই আমায় বলেছিলেন। নইলে হয়তো জোন্স আমায় বলতো। ও আমায় ঘরের সব কথা বলতো। আসলে ও তো কথা বলার বড় একটা কাউকে পেত না।

—আচ্ছা, অন্য দিন মিঃ রবার্ট কিসে করে অফিস যান?

—গাড়ি করে।

—মিঃ রবার্টের কি প্রায়ই বাইরের কাজ পড়তো?

—না।

—উনি সেদিন অফিসের কাজে চলে যাবার পর আপনি কি করছিলেন।

—হঠাৎ এ কথা?

—মিস জুলিয়েট, আমার কথার জবাবটা কিন্তু এখনো পাইনি। পোয়ারো মুখে হাসি ফুটিয়ে কথা বলে।

—আপনি কি আমায় কোন কারণে সন্দেহ করছেন? বলেই জুলিয়েট সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকায়।

—না, ঠিক সন্দেহ নয়, পোয়ারো বলে।

—তবে? জুলিয়েটের সন্দেহ দূর হয় না।

—যাক্, সে কথা, আপনি বিয়ে করেছেন?

—হ্যাঁ। তবে সে বিয়ের সুখের হয়নি। ডিভোর্স হয়ে যায়।

—কারণটা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত? পোয়ারো জুলিয়েটের মন রেখে কথা বলে।

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, তখন বাচ্চার কি নাম ছিল তা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে।

—হ্যাঁ, ডিনসমেড মাথা দোলাকে থাকে। রোজি।

—রোজি? বলেই পোয়ারো নামটা মনে মনে বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করতে থাকে।

—হ্যাঁ, আর ওর ঐ নামটা আমিই দিয়েছি।

—আপনি? পোয়ারো ভাবতে থাকে কেন।

—হ্যাঁ। কারণ ওকে যে যা পারতো সেই নামে ডাকতো। সেটা আমার কাছে বড় বিশ্রী লাগতো।

—আচ্ছা, আপনার ঐ নাম দেবার পর বাড়ির কেউ বা অন্যরা অন্য নামে বাচ্চাকে ডাকতো?

—তবে আমার যত দূর মনে হয় না।

—এটা আপনি জানলেন কি করে?

—কারণ আমি জোন্সকে বারণ করে দিয়ে ছিলাম। কেউ বাচ্চাকে অন্য নামে ডাকলে যেন আমায় জানায়। আর আমার এত সাবধানতার কারণ ছিল, তখন থেকে আমি বাচ্চাকে নিজের বলে ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

—স্বাভাবিক, আর শিশুকে সবাই ভালোবাসতে চায়। এবং আপনি তো আবার ওকে পড়াতেন। টান আসবে বই কি!

—সেই বাচ্চা কি না…জুলিয়েটের চোখ দুটো চিক চিক করতে থাকে। আচ্ছা, আপনি বলুন, দুঃখ হয় কি না।

—হবারই তো কথা, পোয়ারো জুলিয়েটের কথায় ইচ্ছে করে পূর্ণ সমর্থন জানায়। কারণ তার কাছ থেকে এখনো অনেক কথা জানতে বাকি আছে।

তারপর পোয়ারো বলে, আচ্ছা, এর আগে বাচ্চাকে কি কি নামে ডাকা হতো?

—এখন কি আর আমার এত শত মনে আছে।

—আচ্ছা, এ ব্যাপারে আমি একটু আপনাকে সাহায্য করি।

—তাহলে তো খুবই ভালো হয়।

—ওর মেরী বলে কোন নাম ছিল?

—না, জুলিয়েট মাথা নেমে নামটা নাচক করে।

—শার্লট?

—উহুঁ। এ ধরণের ওর নাম ছিল না। থাকলেও আমি তা

হতে দিতাম না।

—কেন বলুন তো? পোয়ারো জানতে চায়।

—কারণ ও ধরণের নাম একবারে আমার পছন্দ নয়, আরো বিশেষ করে এমন ফুলের মত মিষ্টি মেয়ের।

—আচ্ছা, মিঃ রবার্ট তো ব্যাঙ্কে ভালো কাজ করতেন। মেয়ের জন্য নিশ্চয়ই কিছু রেখে গেছেন।

—তা আমার জানা নেই, আর এসব নিয়ে কোনদিন আমাদের মধ্যে আলোচনাও হয়নি।

—মিঃ রবার্টের কোন শত্রু ছিল কি না আপনি জানেন? মানে যার সঙ্গে তার মন কষাকষি বা ঝগড়া ঐ জাতীয় কিছু হয়েছিল বা হতে পারতো।

—শত্রু? মিঃ রবার্টের? জুলিয়েট মুখ কুচকে পোয়ারোর দিকে তাকায়। এবং সে মুখ স্বাভাবিক হতে কিছু সময় নেই।

—হ্যাঁ, পোয়ারো বলে। এ জগতে কিন্তু অনেক কিছুই সম্ভব হয়।

—তা হয়তো হতে পারে। কিন্তু মিঃ রবার্টের মত মানুষের কোন শত্রু থাকতে পারে না। মানুষটা বলতে গেলে কারুর সঙ্গে মিশতো না। একমাত্র মিঃ ডিনসমেড ছাড়া।

—মিস জুলিয়েট, ব্যতিক্রম তো থাকতে পারে।

—তা যে পারে না তা বলছি না। তবে মিঃ রবার্টের যে ছিল না সে বিষয়ে আমি আপনাকে সেন্ট পারসেণ্ট গ্যারন্টি দিতে পারি। তবে অন্যদের ক্ষেত্রে এতটা সিওর হতে পারবো না।

—সব কিছু কি আর নিয়ম মেনে চলে! চলে না বলেই তো প্রতি পদে পদে ঝামেলা আর বিপদ।

—হ্যাঁ, তা যে চলে না তার প্রথম নিদর্শন মিঃ রবার্ট। নইলে অমন মানুষ অকালে এ ভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যায়!

কুড়ি

অন্য কয়েকটা কেসের দিকে পোয়ারো তেমন মন দিতে পারছে না। সে গুলো আধা খাচড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অবশ্য সে গুলোর ক্ষেত্রে খুব একটা তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে। আর এই কেসটায় হাত দেবার আগে সে ভেবেছিল কয়েক দিন বিশ্রাম নেবে। শুধু চার্লসের অনুরোধ আর আগ্রহ সে ঠেলতে পারেনি। এবং সব থেকে তাকে অনুপ্রাণিত করেছে কেসের মেরিট, যা আদৌ উপেক্ষা করতে পারেনি। আর এটাই তো কেসের সব চেয়ে বড় কথা, অন্তত একজন গোয়েন্দার ক্ষেত্রে।

পোয়ারো এখন কফির পেয়ালা নিয়ে বসে আছে। কফি থেকে আস্তে আস্তে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে। কফিতে সে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে আর ভাবছে অনেক কথা। সে কথা গুলোর সে যেন চুলচেরা বিচার করে চলেছে।

পোয়ারোর প্রথমে জোন্সের কথা মনে পড়ে। অমনিতে সে খুব ভালো মানুষ। তবে সে কেন এ ভাবে পালিয়ে গেল। এর পিছনে কি রহস্য থাকতে পারে ?

জোন্স বাচ্চাকে ভালোবাসতো। বাবা-মায়ের আদর বলতে গেলে সেইই নাকি দিয়েছে। কিন্তু তা তো এখানে রেখেও বাচ্চাকে সেই ভাবে আদর যত্নের মাঝে মানুষ করা চলতো। শুধু শুধু কেন সে চোয়ের মত গা ঢাকা দিল। আর ঐ বংশের মেয়েকে সে কি ভালোভাবে মানুষ করতে পারবে ? তার জন্য চাই শিক্ষা-দীক্ষা, যার কোনটাই তার মধ্যে ছিল না।

তবে জোন্স ও ভাবে কাউকে না জানিয়ে পালিয়ে গেল কেন ?

শুধু কি অ্যাপার্টমেণ্ট বিক্রিত টাকার লোভে? অ্যাপার্টমেণ্ট আর ফার্ণিচার বিক্রি করে সে কত টাকাই বা পেয়েছে। পেয়েছে মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা, অবশ্য তার কথা যদি সত্যি হয়। নয়তো সে পেয়েছে, ষাট সত্তর হাজার তবে তাড়াহুড়ো করে বেচাতে তাও পেয়েছে কি না সন্দেহ। ধরে নেওয়া গেল নয় সে পেয়েছে, কিন্তু ঐ টাকায় এই বাজারে সে কতদিন চালাতে পারবে এ কথাটা কি সে একবারও ভাবেনি! তবে জোন্স হয়তো ভেবেছে, তার শক্তি সামর্থ আছে। তার উপর এই টাকা দিয়ে কিছু জমি জমা কিনে চাষবাস শুরু করে দেবে। আর প্রয়োজন বোধে পরের বাড়িতে কাজ করতে হয়তো পিছ পা হবে না। এবং দুটো তো মাত্র পেট। তার উপর ও একবারে শিশু। ওর পিছনে খরচই বা কি।

এবং জোন্স হয়তো আরো ভেবেছে, মেয়ে অন্যদের হাতে পড়লে তাকে অবহেলা আর অনাদরের মাঝে মানুষ হতে হবে। প্রথম দিকে না হলেও পরে টাকা ফুরিয়ে গেলে তার উপর অত্যাচার শুরু হতে পারে, যা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। এই সব ভেবে জোন্স হয়তো নিজের কাছে মেয়ের রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পাছে কেউ তার কাছ থেকে মেয়েকে কেড়ে নেয়, তাই সে হয়তো এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

তবে পোয়ারো আর ওর দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত যে, ডিনসমেডের মেয়ে দু'জন কিছুতেই নয়। একজন, তাই এখন প্রশ্ন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে কোন জন—মেরী না শার্লট?

মেরীর সঙ্গে ডিনসমেড পরিবারের তেমন মিল নেই, তা পোয়ারো বেশ খুটিয়ে খুটিয়ে লক্ষ্য করেছে, একবার দু'বার নয়, বহুবার। সে কোন মিল খুঁজে পায়নি। না পেলেও আবার বলা চলেনা যে, সে এই পরিবারের সন্তান নয়। এরকম অমিল অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

ওদিকে শার্লটের সঙ্গে সুশানের দারুণ মিল। তাকে অনায়াসে তার মেয়ে বলে স্বীকার করতে কোন অসুবিধে হয় না। আবার জোর

করেও বলা চলে না যে, শার্লট ও পরিবারের মেয়ে। মিলের মাঝে আবার অমিলের সৃষ্টি হয়। তখনই যত গণ্ডোগোল বাঁধায়। বিচিত্র জগতের বিচিত্র কাহিনীর তো অভাব নেই, তাই এ ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিন্ত হবার জন্য পোয়ারো হেনেসের কাছে ওদের পরিবারের একটা ছবি চেয়েছিল কিন্তু হেনেস তা দিতে পারে নি তার কাছে এমন ছবি ছিল না। বলেছে, জোন্স যাবার সময় কিছু রেখে যায় নি। টুকিটাকি জিনিস পর্যন্ত নিয়ে গেছে। তবু পোয়ারো থেমে যায়নি। সে হাত পা ছেড়ে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, সেই বাচ্চার মত কাউকে দেখলে আপনি এখন চিনতে পারবেন? কথাটা বলেই সে বুঝতে পারে এটা একটা দুরূহ কাজ। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে আবার বলে, মানে কিছু সাদৃশ্যের কথা আমি বলছি।

পোয়ারোর কথা শুনে হেনেস মাথা নেড়েছে, এখন দেখলে কি আর চিনতে পারবো। চোখের কি আর সে দৃষ্টি শক্তি আছে। তার পরেই কার মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে এসেছিলন, যা সাধারণত বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবু পোয়ারো জিজ্ঞেস করেছে আচ্ছা, জোন্সকে দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন?

—হ্যাঁ। তা হয়তো পারলেও পারতে পারি। কারণ পরিণত বয়সের মানুষ বড় একটা তো পাল্টায় না। তবে এ ব্যাপারেও আপনাকে পুরোপুরি ঠিক নিশ্চিন্ত করতে পারছি না।

—আচ্ছা ওকে দেখতে কেমন ছিলো বলুন তো?

—বেশ লম্বা চওড়া চেহারা স্বাস্থ্য ভালো। গায়ের রং খেটে খাওয়া মানুষের মতন হলেও একেবারে কাঠ খোট্টা দেখাতো না। এবং কথাবার্তার মধ্যেও বেশ একটা মার্জিত ভাব ছিল। আর তার মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা।

—জাতে কি?

—মেক্সিকান। এর বেশী ওর সম্বন্ধে আর কিছুই জানি না। এবং এখন যা জানি ক' দিন পরে হয়তো তাও ভুলে যাবো। বয়স

সব দিক দিয়েই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছি।

—কেন স্মৃতি কি আপনার মনে আছে?

—স্মৃতি? হেনেস ভাবতে থাকে।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কিছুটা ঘটনার কথা ভুলতে চাই, কিন্তু পারছি কোথায়। সে কথাগুলো আমায় অহরাত্রি পীড়ন করে চলেছে। আমায় এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পর্যন্ত দেয় না। তখন আমি উদ্‌-ভ্রান্তের মত ঘরের পায়চারি করতে থাকি। দারুণ ভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ি, শেষে আবার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়বড়ে চেয়ারে ফের বসি। কারণ ঐ দেয়ালটা আমায় জানিয়ে দেয় আমার দিন ফুরিয়াছে তুমি চার দেয়ালের মাঝে এক বন্দী বাতিল মানুষ।

হেনেসের মুখ দিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে, স্মৃতি? স্মৃতির হাত দিয়ে কারুর রেহাই নেই।

তারপর পোয়ারো ওখানে আর বসে থাকেনি। চলে এসেছিল।

কফির কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে পোয়ারো আবার ভাবে, মিস জুলিয়েটের বিবাহিত জীবন কেন সুখের হয়নি? এর পিছনে কি রবার্টের স্মৃতি জড়িত ছিল।

জুলিয়েট রবার্টকে ভালোবাসতো। সে কথা সে অকপটে স্বীকার করেছে। কিন্তু রবার্টের ভালোবাসা সোচ্চার হয়ে উঠেনি বলে সে কি চুপ করে ছিল? আরো যেখানে সে নিয়মিত ঐ বাড়িতে যাতয়াত করতো তবে একটা কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রবার্ট নির্বিকার ছিল। বার বার জুলিয়েট তাকে বলেও হয়তো বলতে পারেনি। শেষে কি এক রকম ক্ষিপ্ত হয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে তাকে ধাক্কা মেরে ......।

ঘটনাটা একেবারে অবাস্তব নয়। এখন একটা ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। কারণ মানুষ প্রেমের জন্য সব কিছু করতে পারে। তখন সে অন্ধ হয়ে যায়, তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

হয়তো এক সময় জুলিয়েট বুঝতে পেরেছে, রবার্ট তার হবে না। তখন সে হয়তো না পাবার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে। আর তখনই সে হয়তো মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে, হয় রবার্ট আমার হবে। নয়তো ও কারুর হবে না। আর তার ফলেই হয়তো এই বিষময় পরিণতি, যা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

প্রেমের খেলায় এমন ঘাত প্রতিঘাতের নাটক বহুবার অভিনিত হয়েছে। তবু প্রেম নাকি অমর। স্বাশত।

আর একটা ব্যাপার পোয়ারো কিছুতেই মেনে নিতে পারছেনা তা হলো, রবার্টের ঐ ভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামতে যাওয়া। সে তা বুঝতে পারেনি, ঐ ভাবে নামতে গেলে সে বিপদের মুখোমুখি হতে পারে। সে তো আর বাচ্চা ছিলনা যে, বুঝবে না আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। তবুও কেন সে জেনে বুঝে এমন একটা কাণ্ড করতে গেয়েছিল ?

লোক্যাল ট্রেন। সাধারণত তিন চার মাইল অন্তর ট্রেনের স্টপেজ সে পরের স্টেশনে নামতে পারতো। তাতে তার কি ক্ষতি ছিল। আর সেই মানুষ কি না চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গেল। কিন্তু কেন ? কেন ?

রবার্ট বোকা লোক নয়। যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে। তার উপর সে একজন অফিসার। তাহলে ?

আর রবার্ট যাচ্ছিল অফিসের কাজে। সেখানে তার হয়তো একটু দেরি হতো। ফিরতি ট্রেনে ফিরে আসতো। আর সেই মানুষ কি না……। আর এতো স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ না, এ ব্যাপারটা পোয়ারোর কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়। ধোঁয়াটে লাগছে। একটা কুয়াশার ছায়া যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। হঠাৎ আর একটা চিন্তা পোয়ারোকে পেয়ে বসে। জোন্সের চিন্তা আবার তার মাথার উদয় হয়। ওর মনে তো কোন কু মতলব ছিল ?

—জোন্স নিশ্চয়ই জানতো, ঐ অ্যাপার্টমেন্টটা রবার্টের।

এবং রবার্ট ই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী। সেই রবার্টকে কৌশলে সরিয়ে দিতে পারে। দিলে তারই সব হয়ে যাবে। তাহলে সেই......।

—তারপর পোয়ারো জোন্সকে হটিয়ে দিয়ে আবার ডিনসমেডকে নিয়ে পড়লো। তার নিজের মেয়ে মেরী না শার্লট? তবে স্বামী স্ত্রী দু'জনেই বলছে, ওরা তাদের সন্তান। এবং সন্তানরা পর্যন্ত সেই একই কথা বলছে। এ নিয়ে তাদের মনে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্বও নেই। এতেই প্রমানিত হয়, এরা পর্যন্ত জানে, তারা পরস্পর, বোন তবে এ সব কথা কি ডিনসমেডরা মেয়েদের পড়িয়ে রেখেছে? ধরা যাক্ রেখেছে এবং এতদিন ওরা সেই ভাবেই চলেছে কিন্তু বিপদের দিনে? যেমন সেদিন ওরা এস. ও. এস. লিখতে গেল তখন তো ওরা মুখ খুলতে পারতো। তাও খোলেনি। শুধু বলেছে, একটা ভয়ের সংকেত পাচ্ছে। একটা বিপদ আসতে পারে। তবে কি ধরণের বিপদ সে সম্বন্ধে তারা আবার কিছুই জানে না। আবার এমনও হতে পারে জেনেও সব মুখ বুজে সহ্য করছে।

কিন্তু এখন কি ওদের এত দিনের ভুল ভেঙে গেছে? ওরা কি জানতে পেরেছে। ওরা পরস্পর বোন নয় এবং সেটাকেই একটা বিপদ বলে মনে করছে।

আর শার্লটের পরচুলার ব্যাপারটা? সেটাও একটা রহস্যের ব্যাপার। কেন এবং কি কারণে সে পরচুলা ব্যবহার করে! তারপরই পোয়ারো ভাবে, ও রকম সোনালী চুল তো অনেকেরই থাকে। আর ঐ চুল দেখতেও সুন্দর, অন্তত তার মনে দোলা দেন। শুধু কি সে অবিবাহিত বলে! না, তা নয়। অনেক যুবতীকে এ ধরণের চুলের জন্য গর্ব অহংকার ফাশ করতে দেখেছে। আর শার্লট কি না সেই চুল ডেকে রাখতে চায়। এবং সে জানতে পেরে যখন জেরা করেছে তখন তার একটা হাস্যকর জবাব দিয়েছে। যা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তারপর পোয়ারো ভাবতে থাকে, মেরী এবং শার্লটের মধ্যে কে রবার্টের মেয়ে হতে পারে। আর ভিনসমেডই বা কার কাস্তাকে পালিতা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

হেনেস বলেছে, সে রবার্টের মেয়ের নাম জানে না। তবে শার্লট নয় মেরী হলেও হতে পারে।

আর মিসেস ম্যাকডোনাল্ড ও একই কথা বলেছে, শার্লট নয় মেরী ? হ্যাঁ, ঐ নাম বোধ হয় ছিল।

সর্বোপরি মিস জুলিয়েট জানিয়েছে, শার্লট নয়। আবার মেরী ও নয়। রোজী।

পোয়ারো ভাবে, এমন অনেক সময় দেখা গেছে, নিজের অধিকার বা ব্যক্তিত্ব জাহির করার জন্য, বিশেষ করে মেয়েরা অন্যদের দেওয়া নাম পছন্দ করে না। সে নিজের দেওয়া নামটা দিতে চায়, সেই নাম আবার হট করে মনে ও পড়ে না। তবু সেই জিদ ছাড়তে চায় না। শেষে অনেক ভাবনা চিন্তা করে আগের নামের কিছুটা অদল বদল করে একটা নাম সাড়া করে দেয়। এ ক্ষেত্রেও সম্ভবত এমন ঘটনা ঘটতে পারে, যেমন শার্লট নামের কথায় মিস জুলিয়েট বলেছে, না আবার মেরী নামেরও সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেল রোজী নাম।

মেরী থেকে রোজী নামটা আসা আদৌ আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ রোজ মেরী বলে একটা কথা আছে। তাই দুটো নাম কিছুটা এদিক ওদিক করে এবং একটু ছেড়ে অনায়াসেই রোজী নামটা দাঁড় করানো যেতে পারে।

সেই সঙ্গে পোয়ারো আর একটা কথাও ভাবে, মেরী আঠারোর দিকে এগিয়ে চলেছে এবং তার মধ্যেই একটু বেশী মাত্রাই দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে, সেটা শালর্টের মধ্যে ততটা নেই।

পোয়ারো ভাবে, এদের মধ্যে একজন পালিতা কন্যা হয়েই এবং তাকে কি মিস জুলিয়েট দেখে চিনতে পারবে ? ততদিন পরে তা কি

সম্ভব হবে? তবে মেয়েদের চোখে আবার অনেক কিছুই ধরা পড়ে যায়। ওদের জহুরীর চোখে, যাচাই করতে অনেক সময়ই কষ্টি-পাহারের দরকার হয় না। এক নজরে দেখে অনেক কিছু বলে দিতে পারে। এমন অনেক মিল খুঁজে বার করে পরে ভাবলো মনে হয় হয়তো ঠিক। হলেও হতে পারে।

সেই সঙ্গে পোয়ারো আর একটা কথাও ভাবে, তবে সেই মেয়ে যদি রবার্টের হয়। সেই মেয়ে নিয়ে তো জোন্স উধাও হয়েছে. এখন সে মেয়ে কোথায় তা কে জানে!

সব মিলিয়ে পোয়ারো যেন একটা গোলক ধাঁধায় পড়ে। এ রহস্যের কুল কিনারা সে যেন কিছুতেই করতে পারছে না। তবে একবার হাতে নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তাতে তার আঁতে ঘা লাগে। তাই সে আর একবার চেষ্টা করে দেখতে চায়।

একুশ

পোয়ারো এখন স্থানীয় থানায় উপস্থিত। এখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ ওয়াকার তার বিশেষ পরিচিত। নানা কেসের ব্যাপারে সে তার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে।

ওয়াকার পোয়ারোকে দেখে উষ্ণ আহ্বান জানিয়ে বলে, মিঃ পোয়ারো বসুন। কেমন আছেন?

—ভাল। আপনি?

—চলে যাচ্ছে আর কি। তা এখানে কি ব্যাপারে?

—একটা কেসের ব্যাপারে......।

—সেটা আপনি আসা মাত্রেই অনুমান করেছি। কারুর সর্বনাশ

ঘটতে যাচ্ছে আর কি।

—আমি বুঝি সর্বনাশই ঘটাই।

—পুরোপুরি নয়। বাকিটা অবশ্য আমরা করি।

—আচ্ছা. মিঃ ওয়াকার, বছর পনেরো ষোল আগে এই থানার অফিসার, আপনি ছিলেন না?

—হ্যাঁ, তারপর আবার বছর দুয়েক হয় এখানে এসেছি। আপনার তো অনেক কথাই মনে আছে

—হ্যাঁ, কিছু কিছু মনে রাখতে চেষ্টা করি আর কি।

—এ কথাটা যখন বলছেন তখন আমার মনে হয় কোন পুরানো ঘটনা নিয়ে আপনার মাথায় কিছু আছে, আর তার সন্ধানেই আমার কাছে আসা।

—ঠিক ধরেছেন। পোয়ারো মৃদু হাসে।

—তা ঘটনাটা কি? ওয়াকার জানতে চায়।

—বছর পনেরো আগে মিঃ রবার্ট নামে এক ভদ্রলোক ট্রেনের অ্যাকসিডেণ্টে মারা যায়।

—কোথায় থাকতো বলুন তো?

—ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে।

—আচ্ছা।

—তার বাড়িতে জোন্স নামে একটা লোক কাজ করতো। কিন্তু রবার্ট মারা যাওয়ায় সে অ্যাপেটর্মেণ্ট এবং ফার্ণিচার বেচে তার শিশু কন্যাকে নিয়ে উধাও হয়। আমি সেই জোন্সের খবরা খবর চাই। এই ব্যাপারে আমায় একটু সাহায্য করলে·· ···।

—এত দিনের পুরনো ব্যাপার······। তা জোন্সের কোন ছবি আপনার কাছে আছে?

—না, পোয়ারো চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ে।

—কোথায় যেতে পারে বলে আপনার ধারণা?

—দেশে যেতে পারে।

—ওর দেশ কোথায় ?

—সেটাই আপনার কাছে জানতে চাই।

—যদি থানায় জানিয়ে গিয়ে থাকে তাহালে পাবেন নইলে মাথা ঘুড়ে মরলেও…।

—তা তো ঠিকই।

—তারপর অনেক খোঁজা খোঁজির পর জোন্সের নাম, ধাম, দেশের বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে একটা ছবিও। এসব রবার্ট থানায় এসে জানিয়ে গেছে।

পোয়ারো এসব টুকে নিয়ে ওয়াকারের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করে জোন্সের ছবিটা নেয়। বলে, পরে আবার ফিরিয়ে দেবে, আর তা সে করেও।

—এরপর কফি পান করে পোয়ারো ওয়াকারকে আর এক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে আসে এবং এসে দেখতে পায়, চার্লস তার জন্য অপেক্ষা করছে।

—আরে চার্লস যে! পোয়ারো চার্লসের মুখোমুখি একটা কৌচে বসে দেহের ভার ছেড়ে দেয়।

—কোথায় থাকো আজকাল! চার্লস পানীয়তে চুমুক দিতে দিতে কথাটা পোয়ারোর দিকে ছুড়ে দেয়।

—তার আগে একটু গলাটা ভিজিয়ে নিই।

—তোমার জন্যও বলা হয়ে গেছে।

—কখন বললে ? পোয়ারো কিছুটা অবাক।

—তুমি অ্যাপার্টমেন্টে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি তুমি এসেছে আর তারপরই……।

—থ্যাঙ্ক ইউ! তোমার হবে।

ইতিমধ্যে পানীয় এসে গেছে। পোয়ারো তাতে ঠোঁট ডুবিয়ে বলে এতদিন পরে তোমার হঠাৎ আগমন।

—কাজে দারুণ ভাবে ফেঁসে গেছি ; চার্লস মুখ বেজার করে

জানায়। ফাঁকি মারার আর উপায় থাকছে না।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

—তা কেসের খবর কি ?

—কোন কেসের ? পোয়ারো ইচ্ছে করেই কথাটা বলে।

—মেরী শার্লট রহস্য।

—ও হো. পোয়ারো পানীয় মুখের কাছে এনেও চুমুক দেয় না।

—কি হলো আবার! চার্লস উৎকণ্ঠিত।

—একবারে ভুলে গেয়েছিলাম।

—কোন ব্যাপারে ?

—এই ব্যাপারটায়!

—এটায় ? আমার কি আদৌ মনে হয় না।

—মানে একটু আধটু খোরাখুরি করছিলাম। কেসের তেমন মেরিট নেই দেখে আর তেমন এগোইনি।

—তাহলে তুমি আমায় আসতে বলতে, চার্লস সন্দেহের চোখে পোয়ারোর দিকে তাকায়। অথবা ফোন করে এ কথা তুমি আমায় জানাতে। কারণ তুমি একটা দায়িত্বহীন নও।

চার্লস তার এক চুমুক পান করে বলে, যাক্, ওসব তোমার ব্যাপার তুমি বুঝবে। আমি উঠি।

—উঠবে ? পোয়ারো বুঝতে পারে। তার জবাবে চার্লস ঠিক খুশী হতে পারেনি। হয়তো বা একটু আঘাত পেয়েছে।

—হ্যাঁ, আর এসেছি তাও প্রায় ঘণ্টা খানেক হতে চলেছে।

—তাহলে তোমায় আর আটকাবো না।

.

চার্লস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো ফোনটা কাছে টেনে ডায়াল করে। এনগেজ। দ্বিতীয় বারের। চেষ্টায় সে লাইন পেয়ে যায়।

—হ্যালো। অপর দিক থেকে উত্তর ভেসে আসে।

—হ্যালো মিঃ এমেট, কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ।

—আমি পোয়ারো।

বলুন স্যার অনেক দিন পরে আপনার ফোন পেলাম।

—এ ক'দিন তেমন কাজ ছিল না। এখন হঠাৎ একটা……। যাক্, আপনি ফ্রি আছেন ?

—আপনার জন্য স্যার, সব সময়, ফ্রি।

—তাহলে এখুনি আমার অ্যাপার্টমেণ্টে চলে আসুন।

—এখনি চলে আসছি স্যার।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

এখন পোয়ারো আর এমেট মুখোমুখি বসে। দু'জনের হাতেই পানীয়।

এমেটের বয়স ষাটের কাছে। লম্বা রিগের চেহারা। ফলে সে খুব চটপটে। এবং উপস্থিত বুদ্ধি তার তারিক করার মতন।

এমেট পোয়ারো এবং, এই রকম অনেক গোয়েন্দার নানা রকম তথ্য সে সংগ্রহ করে দেয়, আগে সে পুলিশে ছিল। সেখান থেকে একটু তাড়াতাড়ি অবসর নিয়ে এ সব কাজে সে বেশ ভালোই রোজগার পাতি করছে। এবং এ কাজেও তার যথেষ্ঠ সুনাম।

এক সময় পোয়ারো এমেটকে জোন্সের ব্যাপারে সমস্ত কিছু সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলল, জোন্সের বয়স এখন সাতান্ন আটান্ন হবে। ওর সঙ্গে একটা মেয়ে রয়েছে, মানে থাকার কথা। এবং তার বয়স হবে আঠারোর কাছে।

—হুঁ, এমেট মনোযোগ দিয়ে পোয়ারোর সমস্ত কথা শুনতে থাকে।

—সে মেয়েটি এখন কি করছে এবং জোন্স কেমন ভাবে জীবন

যাপন করছে ইত্যাদি সব খবরা—খবর আমার দরকার। আর প্রয়োজন বোধে এক আধ দিন ওখানে থাকতেও পারেন।

—ঠিক আছে স্যার তাহলে উঠি।

—আচ্ছা।

দিন তিনেক পরে এমেট এসে জানায়, জোন্স নামের কোন লোকের সন্ধান সে পায়নি।

—তা গ্রামেরলোকেরা কি বলছে? পোয়ারো কিছুটা আশাহত।

—বলছে, জোন্সের দেশ এখানে।

—তাহলে? পোয়ারো আবার যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

—তবে সে নাকি শহরে চাকরি করছে।

—চাকরি? শহরে? পোয়ারো বিস্ময় বোধ করে।

—হ্যাঁ, এমেট মাথা নাড়ে।

—তারপর আপনি চলে এলেন?

—হুঁ, কাজটা ঠিক করতে না পারায় এমেট অখুশী। তবে আবার ঠিক চলেও আসেনি।

—কি করেছেন?

—ছোট্ট গ্রাম, বলতে গেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।

—আচ্ছা, জোন্স যে শহরে কাজ করতে গিয়ে ফেরেনি সে কথা কি একজনে বলেছে, না অনেকেই বলেছে।

—অনেকেই বলেছে।

—তাহলে একটা ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে জোন্স ও গ্রামে নেই।

—একবারে ঠিক কথা স্যার।

ঠিক আছে। আপনার বিলটা দিয়ে যাবেন।

—আচ্ছা স্যার আর এরকম কাজ মাঝে মাঝে পেলে খুশী হবো।

—চেষ্টা করবো।

বাইশ

'ডেইলী হ্যারল্ড' স্থানীয় নাম করা একটা পত্রিকা। যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে বছরের পর বছর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে বলতে গেলে এদের প্রতিনিধি রয়েছে।

এই অফিসে মিস লরেন্স কাজ করে। বয়স পঁচিশের নিচে হলেও কাজে দক্ষ। এবং নিজের কাজ সম্বন্ধে সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল আর তার সব চেয়ে বড় গুণ হলো,সে কখনো কাজে গাফলতি দেখায় না। বরং যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে মিষ্টি হাসি ছুড়ে দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

এই লরেন্সের সঙ্গে পোয়ারোর পরিচয় আছে। তার কাছে সে যে কত ভাবে সাহায্য পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই পোয়ারো ওর কাছেই যাওয়া স্থির করলো।

লরেন্সের ডিউটি সাধারণত সন্ধ্যের দিকে, এসময়টা একটু ফাঁকা থাকে। অন্য সময় কাজের চাপ এবং লোকের যাতায়াতের বিরাম থাকে না।

পোয়ারো লিফ্টে করে তিন তলায় উঠে এসে নির্দিষ্ট ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং দেখতে পায়, লরেন্স ধারে রয়েছে আর তার মুখ একটা ফাইলের দিকে।

লরেন্স অদ্বিতীয়া। সে পোয়ারোর উপস্থিতি ঠিক টের পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফাইলের উপর থেকে দৃষ্টি তুলে পোয়ারোর দিকে তাকায় এবং তার মুখখানা হাসিতে ঝলমল করে ওঠে।

ঘরটা আকারে বিরাট, চারদিকে ফাইল, ক্যাবিনেট, আলমারি, ইনডেক্স কার্ড ইত্যাদিতে বোঝাই।

পোয়ারোর দৃষ্টি লরেন্সের দিকে। ওর পরণে একটা মিনি স্কার্ট

তার উপর সাদা রঙের একটা হাই নেকের সোয়েটার। বয় করা এক রাশ ধূসর চুল ওর সারা পিঠময় ছড়িয়ে রয়েছে।

—কি খবর? লরেন্স হাসে।

—তুমি এমন করে হাসবে নাতো! পোয়ারো লরেন্সের সামনের চেয়ারটা অধিকার করে বসে।

—কেন লরেন্সের দু' চোখে দুষ্টুমির ছটা।

—তোমার ও হাসিতে যেন যাদু আছে।

—যাদু? লরেন্স খিল খিল করে হেসে ওঠে, তারপর সে হাসি থামিয়ে বলে, তবুও তো ম্যানেজ করতে পারলাম না!

—তুমিও তো তেমন হয়ে গেলে।

—আপনার বিরহে!

—তোমার কথা আমার মনে থাকবে।

—থাকবে না। অন্তত হাজার দিন মনে করিয়ে দিয়েছি।

—এবার আর ভুলবো না।

—তা এবার কাজের কথাটা শুনি। আমার কাছে তো আর গল্প করতে আসেন না। লরেন্সের কথায় অভিমানের সুর বেজে ওঠে। এবং তার দৃষ্টি কিছুটা নরম।

অমন অপবাদ দিও না। বড় ব্যাথা লাগে।

—ব্যাথা কোথায়? লরেন্স চোখ বড় বড় করে বলে।

বুকে, বলেই পোয়রো ভাবে। এ ধঃণের কিন্তু কথা না বলে হট করে আবার কাজের কথায় আসাও যায় না। এসব ধরণের কথা তার কাজের খাতিরে কিছু বলতে হয় বই কি!

—যন্ত্রণা হয় না।

তা আজ ডিনারে কোথাও যাবে নাকি?

আপনি বেশ ভালো করেই জানেন যে, আমার এখন নাইট ডিউটি চলছে। আমি এখন কাজ ছেড়ে কিছুতেই আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না। তাই অমন অফারটা করে বসলেন।

—আজ নয় অসুবিধে আছে, কিন্তু একদিন লাঞ্চের অফার রইলো পোয়ারো কথাটা বলে মাথাটা নাড়ে।

—তা' নির্দিষ্ট করে লাঞ্চের কথাটা বলতে পারলেন! কথার কথা মত বললেন একদিন হবে।

—আই অ্যাম সো সরি।

—না, না, আপনার এতে লজ্জা পাবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। আমার অদৃষ্টটাই মন্দ। যাক্, এবার আপনার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলে ধন্য বলে মনে করবো।

—ধন্যবাদ। শোন, এবার তোমায় একটু ঘাটাবো।

—আমি আপনার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত আছি।

—আজ থেকে প্রায় বছর পনেরো ষোল আগে মিঃ রবার্ট মানে একজন ভদ্রলোক ট্রেন অ্যাসিডেন্টে মারা যান।

আচ্ছা, লরেন্স পোয়রোর কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে।

—তার মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাদের খবরের কাগজে কি খবর বেরিয়েছে তা আমি জানতে চাই।

—এক মিনিট, কথাটা বলেই লরেন্স চেয়ার ছেড়ে উঠে ইনডেক্স কার্ডের দিকে এগিয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট কার্ডটা বার করে পোয়ারোর দিকে বাড়িয়ে দেয়।

পোয়ারো হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নেয় এবং তাতে সে চোখ বোলাতে থাকে। লেখা রয়েছে—কর্মরত অবস্থায় সিটি ব্যাঙ্কের অফিসার মিঃ রবার্ট চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। তবে এটা আত্মহত্যা কি না পুলিশ তা জানতে পারেনি। পুলিশ এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।

পোয়ারো কার্ডের উপর থেকে দৃষ্টি তুলে লরেন্সের দিকে তাকিয়ে বলে, এর পর এ নিয়ে আরো কোন রিপোর্ট তোমাদের কাগজে বেরিয়েছে কিনা দেখতো?

—এক মিনিট, লরেন্স রেফারেন্স কার্ডটা দেখে এসে জানায়।

না। আসলে এরকম ঘটনা রোজই তো কিছু না কিছু ঘটেছে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পুলিশ এ কেসে কোন রকম সন্দেহ করেনি। করলে নিশ্চয়ই······।

—আমারও তাই মনে হয়। ঠিক আছে আজ উঠি।

—লাঞ্চটা? লরেন্স মিটি মিটি হাসে।

—পরের বারের জন্য তোলা রইলো।

—পরের বার? লরেন্স হাসতে থাকে।

তেইশ

পোয়ারো এখন সিটি ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে। রবার্ট এখানে কাজ করতো এবং সে অফিসার পদে নিযুক্ত ছিল।

এখানকার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে পোয়ারোর আলাপ নেই। তবে এজেন্টের সঙ্গে তার ভাবসাব ভালোই আছে। পরে তার সঙ্গে কথায় কথায় বেরিয়েছে তারা একই স্কুলে পড়তো। আর সেই থেকে পরিচয়ের সূত্রটা গাঢ় হয়েছে।

সিটি ব্যাঙ্কের এজেন্ট ওয়েড। তার বয়স পোয়ারোর মতন বছর পঁয়তাল্লিশে। তবে পোয়ারোকে ততটা বয়স দেখলে মনে হয় না। কিন্তু তার বন্ধুটির বেশ ভারিক্কি ধরণের চেহারা। ফলে বয়সে তার থেকে অনেক বেশীই মনেই হয়।

কামরায় মৃদু করাঘাত করে পোয়ারো সোজা ওয়েডের ঘরে প্রবেশ করে। ওয়েড কি যেন একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, আর পেন দিয়ে খস খস করে লিখে চলেছে।

ওয়েডের পেন থেমে যায়। সে পোয়ারোর দিকে, আরে পোয়ারো যে! কি ব্যাপার!

—তোমাদের এই চাকরিটাই বেশ, আর সংসার ধর্ম করাই দেখছি বেশ ভালো ছিল।

—সংসার করবে নাকি! ওয়েড টিপ্পনী কাটে।

—তেমন পাত্রী পেলে অবশ্য করতে আপত্তি নেই। তা হাতে সে রকম কোন পাত্রী আছে নাকি!

—আছে, ওয়েড হাসতে গিয়েও গম্ভীর হয়ে যায়।

—কেমন? পোয়ারো যেন সিরিয়াস।

—সদ্য বিধবা হয়েছে। প্রচুর সম্পত্তির মালিক।

—তা তুমি আর একবার লড়ে যাবে নাকি। পোয়ারো হাসে।

—ইচ্ছে তো ছিল। বুড়ী বউ আর ছেলে মেয়েরা যে গলার কাছে অক্টোপাসের মত আটকে রয়েছে।

—তা বুড়ী হলো কিসে?

—দশ বছরের পুরনো বউ বুড়ী নয়!

—ও! আচ্ছা ওয়েড, তোমার এখানে কত বছর চাকরি হলো?

—বছর পনেরো বুড়ি তো হবেই।

—তুমি মিঃ রবার্ট বলে কাউকে চেনো?

—মিঃ রবার্ট? ওয়েড চিন্তা করতে থাকে।

—হ্যাঁ, একটু ভালো করে ভেবে বলো তো।

—রবার্ট? রবার্ট? তারপরই ওয়েডের হঠাৎই মনে পড়ে যায়। আমি তখন এই অফিসে প্রথম ঢুকি। ঢুকেই শুনি, তার আগের বছর মিঃ রবার্ট নামে এক অফিসার চলন্ত রেল থেকে পড়ে মারা যান তখন তিনি অফিসের কাজে যাচ্ছিলেন। আর মানুষ হিসেবে তার নাকি তুলনা ছিল না।

—সবই ঠিক বলেছো।

—তা হঠাৎ ওর ব্যাপারে জানতে চাইছো কেন? ওয়েড কিছুটা অবাক না হয়ে পারে না। তাও আবার এত বছর পরে।

—একটা কৌতূহল বটে।

—শুধুই একটা কৌতূহল? এটা আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। পোয়ারো কিছু বলে না। শুধু হাসে।

—বন্ধু, তোমার কৌতূহল তো সহজে জাগে না।

—তা একটু দরকার আছে শোন। তখন ওর সঙ্গে কে বা কারা কাজ করতো? আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—দাঁড়াও, একটু ভাবতে হবে। তার আগে একটু কফি খাও দেখি। বলে সে টেবিলের উপর থেকে ফ্ল্যাস্কটা এনে দুটো কাপে কফি ঢালে। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে ওয়েড বলে, এখানকার ম্যানেজার মিঃ উইলসন মিঃ রবার্টের সহকর্মী।

—ভালো কথা, পোয়ারো এক চুমুকে কফিটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

—বাঃ, কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরলেই পাজি।

—বাঃ সেই বিধবা পাত্রীটিকে দেখতে যেতে হবে না।

—তাই নাকি! ওয়েড মুচকি হাসে।

—হ্যাঁ, এবার মিঃ উইলসনের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।

পোয়ারো দু' পা এগিয়েও যেতে পারে না। পিছন ফিরে তাকায়। বলে, শোন, মিঃ উইলসনের কাছে আমার প্রকৃত পরিচয়টা গোপন রেখো। তাহলে কাজের দিক দিয়ে কিছুটা সুবিধে হবে।

—তথাস্তু, কিন্তু বন্ধু, কোন কারণে আবার ফেঁসে যাবো নাতো। তোমার ব্যাপারে আমার বড্ড ভয়।

—আরে না। না।

—পরে আবার বলবে নাতো, সত্য গোপন করেছিল, তাই আইনের চোখে তুমি মস্ত বড় অপরাধী।

—তুমি তো মহা ভীতু!

—অন্তত তোমার কাছে সাহসী হতে চাই না।

—চলি, পোয়ারো হাসে। আবার পরে দেখা হবে।

—এসো।

পোয়ারো একজন বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করে ইউলসনের কামরার কাছে এসে দাঁড়ায়। ঝাকে ঝাকে পিতলের প্লেটে লেখা রয়েছে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার।

পোয়ারো নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে কামরার টোকা দিয়ে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে বলে, আসতে পারি?

—উইলসন ইন্টার কামে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। সে ইশারায় পোয়ারোকে তার সামনের, গদী আঁটা চেয়ারে বসতে বলে।

পোয়ারো উইলসনের নির্দেশ মত নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে এবং উইলসনের দিকে তাকায়।

উইলসনের বয়স পঞ্চাশের কাছে। ঝকঝকে চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। উচ্চতায় মাঝারী। পরণে নিখুঁত স্যুট।

—উইলসন ফোনটা নামিয়ে রাখতে পোয়ারো বলে, আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম এবং কথাটা ব্যাঙ্ক সাক্রান্তও নয়।

—তাতে কি হয়েছে। কারুর ব্যক্তিগত প্রয়োজনও থাকতে পারে॥

—ধন্যবাদ! আচ্ছা মিঃ উইলসন, মিঃ রবার্টের কথা আপনার মনে আছে?

—মিঃ রবার্ট? নামটা উচ্চারণ করেই উইলসন এক দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

—হ্যাঁ।

—তাকে আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না, উইলসন গাঢ় স্বরে বলে। ও আর আমি একই দিনে অফিসার হই। এবং কাজও করতে থাকি এক সঙ্গে। আর ও যে আমায় কত ভাবে সাহায্য করেছে তা বলে বোধ হয় আপনাকে শেষ করতে পারবো না।

—সত্যি, বড় ভালো ছিল, পোয়ারোর মুখ দিয়ে একটা চাপা বেরিয়ে আসে। আমি আর মিঃ রবার্ট পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। তারপর বেশ কিছু দিনের বাইরে যাই এবং এসে শুনি ও আর নেই। শুনে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। পোয়ারো বড় অভিনেতার মত কথাটা বলে যায়!

—সত্যি, ব্যাপারটা বড় স্যাড।

—মিঃ রবার্টের ব্যাপারে পুলিশী তদন্ত হয়েছিল।

—হ্যাঁ। যেটুকু হওয়া দরকার ছিল তা হয়েছে।

—আচ্ছা, মিঃ রবার্ট সেদিন কি কাজে বেরিয়েছিলেন? আর উনি কি টাকা-পয়সা ক্যারি করছিলেন।

—না।

—তবে? পোয়ারোর দৃষ্টি উইলসনের দিকে।

—একটা পার্টিকে লোন দেওয়া হবে কিনা সেই ব্যাপারে তাদের অ্যাসেট লায়াবিলিটিস্ দেখতে গেয়েছিল।

—ও। আচ্ছা, এটা কি আত্মহত্যা হতে পারে?

—না। না, তা হয়তো নয়। তবে ওর স্ত্রী মারা যেতে ও ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছিল।

—ওর কোন শত্রু ছিল বলে মনে হয়।

—ওর সঙ্গে কারুর শত্রুতার প্রশ্নই ওঠে না।

—ও কি আর কোন মেয়েকে ভালোবাসতো?

—ওর সে সময় কোথায় ছিল! তাছাড়া, ও ওর স্ত্রীকে দারুণ ভাবে ভালোবাসতো।

—মিস জুলিয়েটের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কেমন ছিল?

—মিস জুলিয়েট? উইলসন তার কথা ভাবতে থাকে।

—হ্যাঁ;

—এবার আমার মিস জুলিয়েটের কথা মনে পড়েছে।

—ওর সম্বন্ধে কিছু বলুন।

—ওকে আমিই রবার্টের ওখানে দিই ওর মেয়েকে পড়াবার জন্য, আর ওর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালোই ছিল বলে শুনেছি।

—তবু দয়া করে একটু খুলে বলুন।

—একজন ভদ্রমহিলার প্রতি যতটা সম্মান দেখনো উচিত তা সে দেখাতো।

—স্ত্রী মারা যাবার পর !

—পারত পক্ষে তাকে এড়িয়ে চলতো।

—কারণ ? পোয়ারো সন্দেহ মুক্ত হতে চায়।

—তখন নাকি মিস জুলিয়েটের তাকানো পাল্টে গেছিল ! তবে ভদ্রমহিলা নাকি খুব রিজার্ভড ছিল।

—হুঁ।

—জানেন, রবার্টের একটা বাড়ি করার শখ ছিল। ও বাড়ির কথা আমায় প্রায়ই বলতো।

—তখন আপনি মিঃ রবার্টকে কি বলেছেন ?

—বললাম, তুমি তো একটা ভালো অ্যাপার্টমেণ্টের মালিক। তা শুনে ও বললো, একটা বাড়ি না হলে ঠিক মানায় না। ওর আমি জবাব দিলাম, তা অবশ্য ঠিক। তবে হঠাৎ বাড়ি করার দিকে তোমার এমন ঝোঁক্ চাপলো। ও আমার কথা শুনে হট করে উত্তর দিতে পারে না। ইতস্তত করতে থাকে। শেষে কিছুটা জড়তা কাটিয়ে বলেছে। আসলে লিজাবড্ড বেশী চাপ দিচ্ছে। বলছে, এখন না করলে পরে আর করতেই পারবে না। পরে সংসার আরো বড় হয়ে যেতে পারে। রবার্ট তার স্ত্রীর কথায় সায় জানিয়েছে। কথা শেষ করে উইলসনের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে, তার পরের মাসেই লিজা হঠাৎ মারা গেল।

—ও, তারপর তো আর মিঃ রবার্ট বাড়ি কেনার দিকে আ ঝোঁকেনি। পোয়ারোর দৃষ্টি উইলসনের দিকে।

—না, আর তা করতে যাবেই বা কার জন্য।

—তা তো ঠিকই। আচ্ছা, তখন মিঃ রবার্টের বাড়ি কেনার মত নিশ্চয়ই টাকা-পয়সা ছিল।

—সবটা না থাকলেও কিছু অন্তত ছিল। নইলে সে বাড়ির দিকে ঝুঁকতো না। আর বাকিটা সে ব্যাঙ্ক থেকে লোন করে নিত।

—হ্যাঁ, তা তিনি করতে পারতেন বই কি। তারপর পোয়ারো উইলসনকে প্রশ্ন করে। এরপর তিনি ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তোলেন।

—হ্যাঁ, উইলসন মনে করে কথাটা বলে।

—তা দিয়ে মিঃ রবার্ট কি করেন?

—কিছুই না। তবে টাকাটা আবার ফের ব্যাঙ্কে জমা দেয়।

—তারপর? পোয়ারোর ঠিক হিসেবটা মিলছে না।

—এরপর নাকি রবার্ট আবার ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলেছিল এবং সে টাকা সে আর ব্যাঙ্কে জমা দেয়নি।

—দেয়নি? পোয়ারো কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকায়। এ ব্যাপারে আপনি মিঃ রবার্টকে কোন প্রশ্ন করেছিলেন।

—না। আসলে তখন ও মনের দিক দিয়ে দারুণ ভাবে ভেঙে পড়েছিল। অফিসে এসে গুম হয়ে বসে থাকতো। তাই এ সব ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে আর আলোচনা হয়নি।

—মিঃ রবার্ট টাকাটা কার কাছে রাখতে পারেন?

—ঠিক বলতে পারছি না।

—আচ্ছা, মিঃ রবার্টের কোন ল' ইয়ার বন্ধু বা কোন সলিসিটার বন্ধু-বান্ধব ছিল?

—যতদূর জানি না।

—এই অফিসে মিঃ রবার্টের কোন বন্ধু আসেন?

—হ্যাঁ, উইলসন সায় জানায়।

—কে বা কারা? পোয়ারো একটু ঝুঁকে উইলসনের দিকে তাকায়।

—মিঃ ডিনসমেড বলে একটা ভদ্রলোক, উইলসন ডিনসমেডের নামটা বলতে কিছুটা সময় নেয়। হঠাৎ ওই নামটা মনে পড়ছিল না। তিনি নাকি ওর কলেজের বন্ধু।

—আর কেউ?

—এ ছাড়া বড় একটা কাউকে দেখিনি।

—আচ্ছা, টাকাটা তিনি কি মিঃ ডিনসমেডকে দিয়ে থাকতে পারেন কি? আরো তিনি যখন তার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

—সম্ভবত নয়।

—কিসের উপর ভিত্তি করে এ কথা বলছেন?

—দিলে হয়তো ও আমার পরামর্শ চাইতো, আর তা চাইলে আমি ওকে 'না' বলে দিতাম।

—কেন? পোয়ারো জিজ্ঞাস্য।

--কারা একজনের কাছে ও ভাবে টাকাটা রাখা আমি মোটেই যুক্তি যুক্ত মনে করতাম না, হোক তিনি কলেজের বন্ধু। কার মনে কি আছে তা তো আগে ভাগে বোঝা যায় না। তারপর একটু থেমে উইলসন আবার বলে, আর টাকা? টাকা দিয়ে ও আর কি করতো বউ মরলো। তারপর থেকে ভাবতো, ও নিজেও পট করে মরে যাবে।

—আচ্ছা, ওর মেয়ে সম্বন্ধে কোন খবরা-খবর জানেন?

—না। শুনেছি তো ওর চাকর জোন্স আর মিসট্রেস মিস জুলিয়েটের কাছে মানুষ হচ্ছিল।

—জোন্স মিঃ রবার্টের অ্যাপার্টমেন্ট বেচে মেয়ে নিয়ে উধাও হয়, পোয়ারো তথ্য পরিবেশন করে।

—হ্যাঁ, সে রকম একটা খবর শুনে আমি গিয়ে দেখি ব্যাপারটা সব সত্যি। তখন আর কিছুই করার নেই।

—জোন্স কোথায় যেতে পারে বলে আপনার ধারণা ?

—বলতে পারছি না।

—আচ্ছা, এমন হতে পারে, টাকাটা জোন্সের কাছে ছিল ?

—কে জানে! হলেও হতে পারে। কারণ রবার্ট শেষের দিকে সে কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। এবং তা নিয়ে আমার কষ্টের শেষ ছিল না।

—তবে মিঃ উইলসন, মিঃ রবার্ট ডিনসমেড না দিয়ে টাকাটা কখনো জোন্সের কাছে রাখতে দিতে পারেন ?

—জানি না যখন তখন এ ব্যাপারে কি বলি!

—আচ্ছা, মিঃ রবার্টের মেয়ের কি নাম ছিল তা কি আজ আপনার মনে আছে ?

—না।

—অবশ্য এত দিনে পরে…।

—তাও ঠিক নয়, আসলে মেয়েটির একটা নাম ছিল না। যে যার প্রিয় নাম অনুযায়ী ওকে ডাকতো।

—তার কোন নাম বোধ হয় আপনার মনে নেই ?

—না, উইলসন আগের মত মাথা নাড়ে।

—আচ্ছা, নাম ধরুণ, মেরী হতে পারে।

—মনে নেই।

—শার্লট !

—তাও বলতে পারছি না।

—রোজি ?

—সেই একই জবাব।

—আচ্ছা, সেই মেয়েকে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন ?

—হ্যাঁ, এবং একবার নয় বহুবার। আর রবার্টও ওর কন্যা সহ স্ত্রীকে আমার বাড়িতে বেশ কয়েকবার এসেছিল।

—এটা একটা ভালো কথা, আচ্ছা, সেই মেয়ের নাক চোখ মুখ

এতদিন পরে আপনার মনে থাকার নয়। কিন্তু কোন চিহ্ন ?

—উহুঁ, উইলসন অসহায় ভাবে মাথা দোলায়,

—আচ্ছা, মিস জুলিয়েটের কাছেও কি মিঃ রবার্ট তার টাকাটা গচ্ছিত রাখতে পারেন ?

—এ ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই, তবে আপনি কোন কথার উপর ভরসা করে এ কথা বলছেন ?

—কারণ আমি মিস জুলিয়েটের সঙ্গে দেখা করেছি, সে আগে একটা স্কুলে টেম্পোরারী কাজ করতো তারপরেই সে একটা স্কুল চালাতে শুরু করে দেয় শিশুদের সে স্কুলের মালিক সে নিজে।

ও, তবে নিজের টাকা অথবা লোন নিয়ে করতে পারে।

—হ্যাঁ, তা যে একবারে পারে না তা নয়। তবে আমি ভাবছি অন্য একটা কথা।

—কি বলুন।

মিস জুলিয়েটের প্রতি মিঃ রবার্টের হয়তো কিছু দুর্বলতা ছিল। কারণ ওর স্ত্রী যখন মারা যায় তখন তিনি বয়সে তরুণ। তাই…।

—ঠিক আছে, উঠি মিঃ উইলসন। পরে দেখা হবে। এসে কিছুটা বিরক্ত করে গেলাম। তার জন্য মাফ চাইছি।

আরে না, না,।

চব্বিশ

—হ্যালো।

—মিঃ এমেট কথা বলছেন।

— হ্যাঁ।

—আমি কে কথা বলছি তা বুঝতে পারছেন ?

—হুঁ।

—আপনার এখন কোন জরুরী কাজ আছে?

—থাকলেও আপনার জন্য আমি সব সময় ফ্রি থাকছি।

—থ্যাঙ্ক ইউ তাহলে এখুনি একবার আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে অসুবিধে হবে কি।

—আদৌ নয়।

—তাহলে চলে আসুন।

—আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।

—আচ্ছা।

এখন বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে, পোয়ারোর বৈঠকখানা ঘরে সে আর এমেট মুখোমুখি বসে কথা হচ্ছে। দু'জনের হাতেই পানীয়।

—মিঃ এমেট, এখন আপনার একমাত্র কাজ হবে মিস জুলিয়েটকে ফলো করা, বলে পোয়ারো জুলিয়েটের নাম ধাম সব জানায়।

—ঠিক আছে।

—তাকে অন্তত তিন দিন ওয়াচ করবেন, আর দেখবেন সে যেন আপনাকে কোন কারণে সন্দেহ না করতে পারে।

—আচ্ছা, সে ব্যাপারে আমার চেষ্টায় ত্রুটি থাকবে না।

—সে কোথায় যাচ্ছে। গিয়ে কি করছে। কার সঙ্গে কথা বলছে বা কার সঙ্গেও তার মেলামেশা বেশী। অথচ স্কুলে থাকলে কি করছে এবং কেই বা দেখা করতে আসছে।

—হুঁ এমেট পানীতে চুমুক দেয়।

—আর একটা কথা।

—বলুন, এমেট আগ্রহের সঙ্গে কথাটা শুনতে থাকে।

তারপর পোয়ারো তার পরবর্তী কাজের কথা জানিয়ে দিয়ে বলে, এ সব কাজের মধ্যে দারুণ ভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে চলবেন,

আর একথা কেন বলছি তাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

হ্যাঁ।

—তাহলে ঐ কথাই রইলো।

ঠিক আছে, এমেট বিদায় নেয়।

বেলা একটা। এমেট 'সানরাইজ' স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে, তারপর নিজেকে প্রস্তুত করে সে স্কুলের ভেতর প্রবেশ করে।

খানিকটা এগোতে এমেটের সঙ্গে একজন মিসের দেখা হয়। তাকে সে বলে, আমি একটু মিস জুলিয়েটের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—আপনি সোজা গিয়ে ডানদিকে ঘুরলেই তার ঘর পেয়ে যাবেন।

—ধন্যবাদ।

এমেট মিসের কথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘরের সামনে নীল রঙের পর্দা ঝুলছে। আর ভেতর থেকে মেয়েলী গলা ভেসে আসছে।

এক্সকিউজমি, বলে এমেট পর্দা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে।

জুলিয়েট একজন ছাত্রীর মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। অবশ্য কথা শেষ হয়ে আসছিল। তারপর এমেটকে বসতে বলে তাকে আর দু' চারটে কথা বলে বিদায় দেয়।

—বলুন মিস জুলিয়েট চশমাটা ঠিক করতে করতে এমেটের দিকে তাকায়।

—আমি স্কুলের হেড মিসট্রেসের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—আমিই।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

—আমি ইনাকাম ট্যাক্স থেকে আসছি।

—ও! জুলিয়েট একটু ভয় পেয়ে যায়।

—আপনার স্কুল কত দিনের? বেশ ভারিক্কী চালে এমেট কথা বলে।

—বেশী দিনের নয়, জুলিয়েট মুখে হাসি বজায় রেখে এমেটের কথার উত্তর দেয়।

—তবু কত দিনের?

—এই বছর দশ পনেরো হবে।

—সে তো অনেক দিনের ব্যাপার। আচ্ছা, এখন কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হয়ে থাকে।

—কিণ্টার গার্ডেন থেকে স্টাণ্ডার্ড টু' পর্যন্ত আছে।

—তাহলে তো মোটামুটি বড়ই স্কুল।

—বড় আর কোথায়!

—তাহলে ফেলনা নয়।

—আরো কয়েকটা ঘর হলে ভালো হতো।

—হ্যাঁ ঢোকার মুখে একই ঘরে অনেক ছাত্রছাত্রী দেখলাম, আর আপনি কি এখানেই থাকেন?

—হ্যাঁ, এরই সংলগ্ন বাড়িতে থাকি।

—অন্য মিসট্রেসরা?

—তারা অন্যত্র থাকে।

—বাড়িটা আপনার, না ভাড়া নেওয়া?

—না, আমারই।

—তৈরি করিয়েছেন, না কিনেছেন?

—কিনেছি।

—কত টাকা দিয়ে?

—প্রায় লাখ দিয়ে।

—তার কাগজ-পত্তর আপনার কাছে আছে?

—হ্যাঁ।

—টাকাটা কোত্থেকে পেয়েছেন ?

আমার ছিল, তারপর জুলিয়েট বলে। একটু কফির কথা বলি।

—মিস জুলিয়েটে, মাফ করবেন। ডিউটিতে এসে আমি কখনো কিছু খাই না।

তারপর এমেট জুলিয়েটের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার কাছে টাকাটা কি করে ছিল ?

—আমি প্রথম জীবনে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছি, জুলিয়েট একটু ইতস্তত করে জানায়।

জুলিয়েটের দ্বিধা ভাবটা এমেটের দৃষ্টি এড়ায় না। বলে, তখন এত টাকা জমাতে পারলেন ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় কাজ করতেন ?

—বেশ কয়েক বছর গভরনেস ছিলাম। তাছাড়া, স্কুলে কাজ করেছি। এ ছাড়া, আমার স্বামী কিছু টাকা দিয়েছেন।

—আমরা খবর নিয়ে জেনেছি, গভরনেস ছিলেন মাত্র মাস কয়েক, আর মিঃ রবার্টের বাড়িতে শিক্ষকতা করেন তাও মাস ছয়েকের বেশী নয়। তারপর ওখানে চাকরিটা চলে যেতে আপনি দু' একটা স্কুলে টেম্পোরারী চাকরি করতে করতে মিঃ স্মিথকে বিয়ে করলেন, তাই না ?

—হ্যাঁ, জুলিয়েটের কথায় জড়তা ?

—আপনার সঙ্গে মিঃ স্মিথের বিয়ে হয় তখন তিনি একটা কারখানায় সামান্য একটা কাজ করতেন, পোয়ারো শেখানো কথা এমেট গড় গড় করে আওড়ে যেতে থাকে। তবে তিনি দেখতে সুপুরুষ ছিলেন, আর সত্যি কথা বলতে কি, আপনি সেই জন্যই তাকে বিয়ে করেছিলেন তবে সে বিয়ে আপনাদের সুখের হয়নি, যার পরিণতি শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ গিয়ে দাঁড়ায়।

—হ্যাঁ, আর বাকি টাকাটা আমি ধার করি।

—ধার করেন? কোথা থেকে? ব্যাঙ্ক।

—না, জুলিয়েটের গলাটা কেঁপে ওঠে।

—তবে কোথা থেকে? এমেট তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে জুলিয়েটের দিকে তাকায়, যার মধ্যে ধীরে ধীরে একটা সন্দেহ ছায়া পড়ছে।

—মানে···, জুলিয়েট ইতস্তত করতে থাকে বলুন।

—বলুন? চুপ করে গেলেন কেন? এমেটের চোখের পলক যেন পড়ছে না। সে কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

—আমার—আমার এক বন্ধু দিয়েছে।

—বন্ধু? তার নাম ঠিকানা দয়া করে আমায় জানাবেন।

—জানাতে কোন অসুবিধে নেই। তবে সে আর বেচে নেই।

—মারা গেলেও কত বছর আগে মারা গেছেন। এমেটের চোখের তারা স্থির হয়ে জুলিয়েটের অসহায় দৃষ্টির কাছে যেন আটকে রয়েছে।

—বেশ কয়েক বছর আগে, জুলিয়েটের গলাটা সহসা ভারি হয়ে ওঠে। দয়া করে তার নাম আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। আমি বলতে পারবো না।

—মিস জুলিয়েট, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি, তবু কর্তব্যের খাতিরে সেই নামটা আমায় জানতে হবে।

—তার নাম হলো মিঃ রবার্ট।

মিঃ রবার্ট? এমেট যেন লাফ কিয়ে ওঠে। তা উনি আপনাকে কত হাজার টাকা দিয়েছেন?

—প্রায় হাজার ত্রিশেক টাকা।

—তার রিসিট নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে?

—হ্যাঁ, জুলিয়েট কাঁপা গলায় জবাব দেয়।

—দয়া করে সেটা একবার দেখাবেন? এমেট যেন জুলিয়েটকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে।

—এখানে তো রাখি না। আমার লকারে রয়েছে। জুলিয়েট কিছুটা নিরুপায় ভাবে মিথ্যের আশ্রয় নেয়।

—ও, আর বাকি টাকাটা ?

—বললাম যে······। আর বলেই জুলিয়েট ভাবে। এমেটের কি জেরার শেষ নেই ! একটার পর একটা প্রশ্ন করেই চলেছে।

—বাকি টাকাটা সব ?

—হ্যাঁ।

—আপনি রিটার্ন সাবমিট করেন।

—না। লসে রান করছি। কি আর রিটার্ন সাবমিট করবো।

—লস ? লস তো হবার কথা নয়, আর স্কুলের হাল চাল তো বেশ ভালোই দেখছি।

—হ্যাঁ, উপরে থেকে এরকম দেখতে লাগে। ভেতরটা কিন্তু একবারে ফাপা, যেটা উপর থেকে চোখে পড়ে না।

—তবুও দেখলে কিছুটা বোঝা যায় ! তাই আপনার কথাটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না।

—আপনার কথাটা আমি ঠিক অস্বীকার করছি না।

—এবার থেকে আপনি রিটার্ন সাবমিট করবেন।

—আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

—আর এতদিন রিটার্ন সাবমিট না করে খুবই অন্যায় কাজ করেছেন, এমেট কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলে।

—তার জন্য আমি লজ্জিত।

—ও কথা বললে তো হবে না। কিন্তু পেনাল্টি আপনাকে দিতেই হবে। খুব সহজে রেহাই পাবেন বলে মনে হয় না।

—স্কুলে লসে রান করছে তা সত্বেও ?

—সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ, আর আপনাকে যখন ইনকাম ট্যাক্স কল করবে তখন সব কাগজ-পত্তর নিয়ে অ্যাপিয়ার হবেন।

—ঠিক আছে, জুলিয়েট ভাবে এ তো মহা উঠকো ঝামেলা।

—উঠি।

তারপর জুলিয়েট চেয়ার ছেড়ে উঠে এমেটকে স্কুলের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় এবং এরপর বেশ চিন্তিত মুখে ঘরের দিকে পা বাড়ায়। আর সে দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

এমেট এখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে আসে এবং দ্রুত পোশাক পালটে নেয়। এখন তার পরনে ময়লা ধরণের জামা কাপড়। গালে কাঁচা পাকা দাড়ি। জুতোর উপর এক প্রস্থ ধুলো। অর্থাৎ খুব পরিচিত মানুষও তাকে হুট করে চিনতে পারবে না। এমেট বাড়ি থেকে আবার জুলিয়েটের স্কুলের কাছে চলে আসে এবং একটু তফাতে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য রাখতে থাকে।

পঁচিশ

—হ্যালো।

—হ্যালো। স্যার, কথা বলছেন?

—আমি পোয়ারো কথা বলছি।

—স্যার, আমি উড কথা বলছি।

—তুমি কোথা থেকে আমায় ফোন করছো?

—স্যার, স্থানীয় একটা টেলিফোন বুথ থেকে।

—উড, তুমি ওদের ফোন কখনো ব্যবহার করছো নাতো?

—না স্যার। কখনোই নয়।

—ঠিক আছে, তা তোমায় কেউ সন্দেহ করছে নাতো?

—আদৌ নয় স্যার।

—এবার বলো কি খবর?

—স্যার, মিঃ ডিনসমেডকে ক'দিন ধরে বেশ গম্ভীর দেখছি।

—গম্ভীর? তা কারণটা কি?

—এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছেন ?

—মন্দ নয়।

—মন্দ নয় কেন বলছো ?

—মাঝে মধ্যে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন ?

—ক্ষিপ্ত ? তা কারণটা কি ?

—ব্যবসা নাকি আগের তুলনায় আরো খারাপের দিকে চলেছে।

—ও, আর তার স্ত্রী ?

—সংসারের সামলাতে গিয়ে নাজেহাল, এই আর কি।

—আর তোমার সঙ্গে তার ব্যবহার ?

—ভালো। তবে মাঝে মধ্যে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যান। চোখের দৃষ্টি উদাস হয়ে যায়।

—কেন বলতো ?

—সেই একই। ব্যবসা। আর স্যার, আমি আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, বলে উড চারদিকটা দেখে নেয় কেউ তাকে দেখছে কি না। ধার কাছে কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করে।

—কি বলতো ?

—স্বামী স্ত্রী যখন কথা বলে তখন সেখানে কেউ থাকে না। এমন কি তাদের ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত না।

—আর ওদের কথার মাঝে হাজির হলে ?

—তাদের সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে যায়, আর তখন তারা দু' জনেই সজাগ হয়ে গিয়ে অন্য কথা বলতে থাকে।

—তারা কি ধরণের আলোচনা করে তা কিছু জানতে পেরেছে ?

—না স্যার, বুঝতে পারি না।

—কেন ? পোয়ারো কিছুটা অসন্তুষ্ট। বলে, তোমাকে তো ওই জন্যই ওখানে আমি রেখেছি।

—স্যার, আমি বসে নেই। আসলে ওরা তখন খুব চাপা স্বরে

কথা বলে। আমি নানা ভাবে চেষ্টা করেও জানতে পারিনি। আবার বেশী চেষ্টা করতে ঠিক আবার সাহসেও কুলোয় না। পাছে যদি আবার ধরা পড়ে যাই।

—ঠিক বলেছো, আর তোমায় খুব সাবধানে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

—হ্যাঁ স্যার, আর ওরা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে যা কথা বলে সব শুনতে পাই। সে সব অত্যন্তই মামুলী ধরণের কথা। যেন ওগুলো আগে থাকতে ঠিক করে রেখেছিল।

—আচ্ছা, জর্জের খবর কি?

—এখন জর্জই তো আমার খেলার সাথী। ওর সঙ্গে বাগানে গিয়ে খুব ছুটোপুটি করি।

—ও ল্যাবোরেটরি নিয়ে কি খুব মেতে আছে?

—আছে, তবে নাকি আগের মত নয়।

—কারণ?

—সেটা জানতে পারিনি। তবে এখন পড়া ছাড়া আমার সঙ্গেই বেশী সময় কাটায়।

—মেরীর খবর কি?

—ভালো।

—নিয়মিত কলেজে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ স্যার।

—ওকে নিয়ে মিঃ ডিনসমেড কোথাও বেড়িয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তখন সঙ্গে আর কে ছিল?

—স্যার, আর কেউ ছিল না।

—কোথায় গেয়েছিল তা কিছু জানো?

—তবে কথাচ্ছলে আমি মিস মেরীকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেই উড আর একবার চারদিকটা দেখে নেয়।

—তখন ও কি বললো ?

—বললো, বাবার সঙ্গে একটু ঘুরতে গেছিলাম।

—কোথায় ? বা কার কাছে ?

—বললো বাবার এক বন্ধুর বাড়ি। আবার বেশী জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাইনি পাছে যদি আবার ওরা সন্দেহ করে।

—ঠিক করেছো, আর তোমার সঙ্গে তার ব্যবহার।

—খুব ভালো।

—আর মিস শার্লট ?

—সেও দারুণ।

—ও কি এখনো মাথায় পরচুলা ব্যবহার করছে ?

—প্রথমে করতে। এখন আর করে না।

—কেন করে না বলে তোমার মনে হয়।

—প্রথমটা হয়তো ভেবেছে আমি কে তা দেখা দরকার। তারপর হয়তো খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই···।

—ঠিক বলেছো। আচ্ছা, সে নিয়মিত কলেজ যাচ্ছে ?

—হ্যাঁ স্যার। দু' বোনে এক সঙ্গেই যায়। তবে সেদিন মিস শার্লট খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরেছে।

—খোঁড়াতে খোঁড়াতে ? কেন ?

—তার জুতোর একটা পেরেক বেয়াড়া ভাবে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর সেটা আমি মুচির কাছে নিয়ে গিয়ে সারিয়ে নিয়ে আসি।

—আচ্ছা, আর কোন খবর আছে ?

—না স্যার। তবে স্যার, মিস শার্লেটকে যেন বড় নির্জীব দেখাচ্ছে।

—নির্জীব ? কথাটা ঠিক পোয়ারোর ভালো লাগে না।

—হ্যাঁ স্যার।

—কিন্তু কেন বলতো ?

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ঠিক আছে, তুমি ভালো করে ওয়াচ করে যাও। আর নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আমায় ফোন করার দরকার নেই।

—ঠিক বলেছেন স্যার।

—আর শোন, ঝট করে টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে দেখো তো কেউ তোমার উপর নজর রাখছে কি না!

—হ্যাঁ স্যার।

তারপর পোয়াবোর কথা অনুযায়ী উড রিসিভার নামিয়ে রেখেই হুট করে বাইরে বেরিয়ে আসে, না, ধার কাছে কেউ নেই। পড়ন্ত বেলা। এরপর রিসিভার তুলে এসে সে জানায়, না স্যার, সব ঠিক আছে।

—তাহলে ঐ কথাই রইলো।

—আচ্ছা স্যার।

ছাব্বিশ

পোয়ারো এখন বেরুবার জন্য প্রস্তুত? তার পোশাকের একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

পোয়ারোর পরনে আধ ময়লা জামা কাপড়। মাথায় চুল উস্কো খুস্কো এবং এলোমেলো। গালে আট দশ দিনের না কামানো কাঁচা পাকা দাঁড়ি। পায়ে একটা তাপ্পি দেওয়া জুতো।

এখন সন্ধ্যে। পোয়ারো এমন একটা সময় ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছে। সে চায়, লোক যেন তাকে চিনতে না পারে। পারলে কোথায় যাচ্ছে, এ ধরণের পোশাকের কি বৃত্তান্ত। এরকম হাজারো প্রশ্ন তার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

চাদরটা ভালো করে মুড়ি দিয়ে পোয়ারো রেল স্টেশনে প্রবেশ

করে বেণ্ট উডের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে নির্দিষ্ট ট্রেনের কাছে এগিয়ে যেতে থাকে।

খানিকটা দূরে গিয়ে পোয়ারো চারদিকটা তাকায়। তাকে কেউ লক্ষ্য করছে কি না তা দেখার জন্য। না, সন্দেহজনক ভাবে কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না দেখে সে কিছুটা নিশ্চিত বোধ করে।

তারপর পোয়ারো ভিড়ের মাঝে কোন রকমে একটা কাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে। ভিড়ের ভেতর গিয়ে বসার অন্যতম প্রধান কারণ হলো, লোকে যেন তাকে হুট করে চিনতে পারে। আর আলাদা একটা বেঞ্চিতে বসে থাকলে লোকে নজর তার দিকে যাবে।

এখন পোয়ারোর বসার ভঙ্গিটা দেখবার মতন। অন্য আর পাঁচ জনের মত সে পাতুলে গুটি মেরে বসেছে। যেন শীতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য। তারপর আরো একটা কাণ্ড করে বসলো যা সে কোনদিন করেনি। অন্য সবার মত নিতান্ত সস্তা দামের একটা বিড়ি ধরালো।

বিড়ির উগ্র গন্ধে পোয়ারোর কাশি পেয়ে যাচ্ছে। সে কয়েক-বার খক খক করে কাশলো। তারপর পকেট থেকে নিতান্ত মামুলী ধরণের রুমাল বার করে কাশির বেগ সামলাতে থাকে।

পোয়ারো এখন চলেছে বেণ্টউডে। ওখানে নাকি জোন্স থাকে অন্তত থানায় সেই কথা লেখা আছে। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস। সে ওখানে জোন্সের দেখা পাবে কি না তাতে তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ এমেট বলেছে, জোন্স নামে এবং ঐরকম দেখতে ও গ্রামে কেউ নেই।

তবু পোয়ারো নিজে গিয়ে একবার সারজামিন তদন্ত করতে চায়। আর তার বিশ্বাস, জোন্সকে পেলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তাই ওকে তার সবার আগে প্রয়োজন। তাবপর অন্যদের এবার পোয়ারো বিড়িতে কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছে। তবু বিড়িতে

টান দিয়ে বার কয়েক কাশলো।

যদিও পোয়ারো জানে, ক'টায় গাড়ি তবু সে আর একবার জিজ্ঞেস করে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে চায়। সে পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করে, বেণ্টউডে যাবার গাড়ি ক'টায়?

—ন'টা চল্লিশে। লোকটি জানায়?

—তা বেণ্টউডে পৌঁছুবে ক'টায়?

—তা ধরো সাড়ে পাঁচটার আগে তো নয়। তুমি বুঝি এই বারই প্রথম ওখানে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ, পোয়ারো বোকার মত হাসে।

—তোমার ওখানে কে আছে?

—এক খুড়তোতো ভাই আছে।

তারপর ট্রেন আসতে পোয়ারো আবার ভিড়ের মাঝে গিয়ে বসলো এবং ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একবার ভালো করে সে যাত্রীদের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। না, কেউ তার পরিচিত না, আর কেউ তাকে দেখছেও না।

ইতিমধ্যে গাড়ি গতি নিয়েছে। এরপর সেই গতি কখনো বা বাড়ছে, কখনো কমছে। এরই মাঝে স্টেশনে থামছে। এইভাবে করতে করতে ছ'টা নাগাদ গাড়ি বেণ্টউড স্টেশনে পৌঁছালো।

ছোট স্টেশন। গাড়ি এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। মিনিট দুয়েক থামেই যাবার বাঁশী বাজিয়ে দেয়।

পোয়ারোর মত আরো দু'একজন যাত্রী নেমেছে এবং এখানে কয়েক জন যাত্রী উঠলোও।

যে দু'জন যাত্রী নেমেছে পোয়ারো তাদের দিকে তাকায়। তারা স্টেশনে পা দিয়েই হন হন করে হেঁটে স্টেশনে টিকিট জমা দিয়ে গেট থেকে বেরিয়ে পড়ে।

পোয়ারো আস্তে আস্তে স্টেশন মাস্টারের ঘরকে পিছনে ফেলে স্টেশন অতিক্রম করে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। স্টেশনের লাগোয়ে বড়

একটা চায়ের দোকান। সেখানে গিয়ে চা আর জল খাবারটা সেরে নেয়।

ইতিমধ্যে শীতের আর কনকনে ভাবটা কিছুটা কমেছে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। এমন রোদ বড় একটা দেখা যায় না। চারদিকে যেন মুঠো মুঠো খুশী ছড়িয়ে পড়েছে।

পোয়ারো জল খাবারের পর্ব মিটিয়ে গ্রামের পথে নেমে এসেছে খানিকক্ষণ হাঁটার পর সারি সারি মাটির বাড়ি, কোথাও আবার এক তলা পাকা বাড়িও তার নজরে এলো।

পোয়ারো বাড়ির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকায়। দূরে চাষের জমি। সেখানে কৃষকরা কাজ করছে।

একটা বাড়ির সামনে বেশ কয়েক জন গোল হয়ে কোন কাজের কথা বলছে। পোয়ারো তাদের কাছে গিয়ে ব'লে ভাই, জোন্স কোথায় থাকে বলতে পারো?

—জোন্স? একজন অপর জনের দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ, এই তার ছবি, পোয়ারো পকেট থেকে জোন্সের ছবি বার করে তাদের দিকে তুলে ধরে।

—না ভাই, এ ছবি চিনতে পারছি না। তা গ্রামের নাম কি বলেছে?

—ব্রেন্টউড।

—আর একটু এগিয়ে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করো।

—আচ্ছা।

—আর শোন, তুমি কি এই গ্রামে প্রথম এলে?

—হ্যাঁ, আসলে বাইরে চাকরি করি তো!

—ও। ঠিক আছে।

—আচ্ছা, বলে পোয়ারো অনেকের কাছেই গেল কিন্তু তার যাওয়াই বৃথা হলো। কেউই জোন্সের খবর দিতে পারলো না।

তারপর পোয়ারো একজন বুড়োর কাছে গেল। জোন্সের বৃত্তান্ত

জানিয়ে তাকে ছবি দেখাতে গেল। তাতে বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বলে, ভাই, আমায় ছবি দেখিও না। চোখে কি আর দেখতে পাই!

বলতে গেলে চোখের মাথা খেয়ে বসে আছি।

এরপর পোয়ারো আরো কিছু খোঁজ খবর করে, পোয়ারো শেষে স্থানীর থানায় হাজির হয়। তারাও তাকে কোন ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে না।

তারপর পোয়ারো ঠিক করে, পাশের গ্রামে যাবে, আর করলেও তাই। কিন্তু সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। তবু সে নিরাশ হয় না। তার জোন্সকে চাইই। এখানকার থানাও তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারলো না। তবে বললো, তেমন কিছু খবর পেলে তারা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে।

পোয়ারো ভাবে, তবে কি সে চলেই যাবে? কিন্তু হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ভাবে, রেন্টউডের আগের স্টেশনে গেলে কেমন হয়? ধরেই নিল নয় পাবে না। তারপর নয় সে চলেই যাবে। তবে যাবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে যাবে। কিন্তু এখানে এসেও তেমন কিছু হলো না। আগের মত সবই 'না, না' করলো। অবশেষে একজন লোকের সন্ধান সে পেয়ে যায়।

সে লোকটি বললো, আমি চিনতাম।

পোয়ারো লোকটির দিকে তাকায়। প্রায় পঞ্চাশের কাছে বয়স। মজবুত স্বাস্থ্য। গায়ের রং কালো।

—চিনতাম কেন বলছেন? পোয়ারো হাসি মুখে লোকটির দিকে তাকিয়ে তার দিকে একটা সস্তা দামের সিগারেট এগিয়ে দেয়।

—আসলে অনেক আগের কথা তো। লোকটি সিগারেট পেয়ে খুশী হয়। তাছাড়া, ও তো আর বেঁচে নেই।

—বেঁচে নেই? পোয়ারোর গলা দিয়ে যেন একটা হাহাকারের শব্দ বের হয়ে আসে।

—না, লোকটি সিগারেট ধরায়।

—কবে মারা গেছে ?

—বছর পনেরো হবে, লোকটি একটু ভেবে বলে।

—ও কি এ গ্রামের লোক ?

—না। ও পাশের গ্রামের লোক।

—পাশের গ্রামের ? তবে যে এখানে এসে থেকেছে ?

—আমায় বলেছে, গ্রামে আর যাবো না। আর ওখানে আমার আছেই বা কি। আর আপনার কাছে জমির সন্ধান পেলাম। এখানেই চাষ বাস করবো এবং থেকে যাবো।

—তারপর ? পোয়ারো প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে যাবার পুরো-মাত্রেই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আর ভাবে, তখন জোন্সের জমি কেনার মত অবস্থা ছিল বই কি। তখন তার পকেট গরম। রবার্টের অ্যাপার্টমেন্ট আর ফার্নিচার বেচার টাকা তখন তার সঙ্গে ছিল।

পোয়ারো লোকটিকে জিজ্ঞেস করে, জোন্স আপনার কাছ থেকে ক'বিঘে জমি নিলো ?

—দু'বিঘে নিলো, আর দামও ভালো দিলো। অন্যদের দেবো দেবো করেছিলাম আর দিলাম না। ওকেই দিলাম।

—ওর জমিটা কোথায় ?

—ঐ যে সামনে একটা পাকা এক তলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, তার পরেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা, ওর পরেই যে জমিটা আছে ওটা ওর।

—এখন ওর জমি কে দেখাশুনা করে ?

—ওর এক ভাই।

—ও, তারপর পোয়ারো বলে, ওর সঙ্গে একটা মেয়ে আছে ?

—হ্যাঁ, আচ্ছা, ওটা কি ওর মেয়ে ? আমার তো বিশ্বাস হয় না।

—বোধ হয় ওর, পোয়ারো ইচ্ছে করে ও একথা বললো। নইলে ওর মেয়ে হয়তো কোন রকম সন্দেহ হতে পারে, তার চেয়ে এড়িয়ে

যাওয়াই শ্রেয়। তা সে মেয়ে কোথায়?

—ও আসার পরে তো আর দেখি না।

—আচ্ছা, জোন্স কিভাবে মারা যায়?

হার্ট অ্যাটাকে।

—ঠিক আছে, তোমায় অনেক ধন্যবাদ। চলি।

—আচ্ছা।

পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে বেরিয়ে স্থানীয় থানায় হাজির হয় এবং তার পরিচয় পেয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলতে গেলে সীট ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, বলুন স্যার, আপনার জন্য কি করতে পারি?

আপনি ফোর্স নিয়ে এখুনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন পোয়ারো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—এখুনি স্যার, রওনা হচ্ছি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওরা বেরিয়ে পড়ে এবং তরুণ অফিসার বলে স্যার, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি।

—আরে আমি এমন কিছু লোক নই, তারপর পোয়ারো বলে, আমার মনে হয়, যার কাছে আমরা যাচ্ছি, সেখান থেকে আমরা অতীতের বহু কিছু টেনে বার করতে পারবো। আর এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।

—নিশ্চয়ই স্যার। আমায় যেমনটি বলবেন ঠিক আমি তেমনটি করে যাবো। আর এখন আপনার সঙ্গে যেন দারুণ রোমাঞ্চিত বোধ করছি।

—গিয়ে আপনার ওখানে প্রধান কাজ হবে, লোকটির সঙ্গে এমন ভাবে কথা বললেন সে যেন ভয় না পেয়ে যায়। ভয় পেলে কিন্তু কোন কাজই হবে না।

—কেন স্যার ?

—কারণটা ঘটনাটা দীর্ঘ পনেরো বছর আগেকার।

—পনেরো বছর আগেকার ?

—হ্যাঁ। তথ্য বলতে গেলে কিছুই নেই। জেরায় জেরায় এবং ভয় দেখিয়ে যা কিছু বার করা যায়।

—ঠিক বলেছেন।

ইতিমধ্যে ওরা নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে চলে এসেছে এবং পোয়ারো নির্দেশ অনুযায়ী বাড়ির চারদিকটা ঘিরে ফেলে। আর এ ভাবে গ্রামে পুলিশ আসতে অনেকেই সচকিত হয়ে উঠেছে।

বাড়িটা এক তলা। দু'খানা ঘর। বাড়ির সামনে একটু বাগানের মতন তবে অযত্ন আর অবহেলায় অনেক গাছই মরে গেছে। পড়ন্ত বেলা। একটু আগে সূর্য অস্ত গেছে। তার বেশ আকাশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এক মায়াবী পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে।

ঘরের দরজা বন্ধ। ঘরে লাইট জ্বলছে। তার রশ্মি ঘরের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্ভবত ঘরে কেউ রয়েছে।

দরজায় টোকা দেওয়ায় আগে তরুণ পুলিশ অফিসায় জনের সঙ্গে পোয়ারো চোখা চোখি হতে যেন অনেক কথা হয়ে গেল তারপর জন দরজায় টোকা দেয়।

—কে ? ভেতর থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

—আমরা এ বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—কে আপনারা বার্ট ভেজানো দরজার খুলে ওদের সামনে দাঁড়ায়। তবে সে পুলিশ দেখে এতটুকু বিচলিত বোধ করে না। তার চোখ মুখ স্বাভাবিক দেখাতে থাকে।

পোয়ারো ওদিকে এক দৃষ্টিতে বার্টের দিকে তাকিয়ে থাকে। বয়স পঁয়ত্রিশের কাছে হবে। বেশ মজবুত স্বাস্থ্য। গায়েয় রং

তামাটে। সম্ভবত রোদে পুড়ে পুড়ে। মাথায় এক রাশ চুল।

বার্ট জনের দিকে কিছুটা ক্রুদ্ধ ভাবে তাকিয়ে জানতে চায়। আপনার কাকে প্রয়োজন?

—তোমাকে। জন দৃঢ় ভাবে জানায়।

—আমাকে। বার্ট নিজেকে দেখিয়ে বলে।

—হ্যাঁ। বার্টের গলায় এখনো সেই আগের মত দৃঢ়তা।

—কিন্তু···, বার্ট তো অবাক।

—জোন্স কোথায়? জন সরাসরি কাজের কথায় আসে।

—জোন্স। বার্ট চোখ কুঁচকে জনের দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ।

—সে কে?

—তুমি তাকে চেনো না।

—না।

—আচ্ছা, তুমি তো বরাবরই এ গ্রামে থাকো।

—হ্যাঁ।

—তার কোন প্রমাণ আছে?

—আছে বই কি।

—কি প্রমাণ?

—ঐ জমি, এ বাড়ি সব আমার।

—এটা কি তোমার পৈত্রিম জমি?

—হুঁ।

—না। পোয়ারো সহসা ভিড়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর জোন্স যার কাছ থেকে জমি কিনেছিলো তাকে দেখিয়ে বলে, একে চেনো?

—হ্যাঁ। বার্টের চোখ মুখ কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। তবু তা মুহূর্তের জন্য। আর সে ভাবে। এ ভয়ের কি আছে।

—এবার বলো, জোন্স কোথায়?

—মারা গেছে, আর আমি একটু আসছি।

—কোথায় যাবে? পালাবে? সে চেষ্টা একবার কেন বহুবার করে দেখতে পারো। বাড়ির চারদিকে পুলিশ রয়েছে।

—কিন্তু আপনারা এসেছেন কেন! বার্ট সহসা চেঁচিয়ে ওঠে। আমি তো কোন অন্যায় করিনি।

—তুমি নিজের মুখে সমস্ত স্বীকার করো, নইলে পুলিশের সাহায্য নিতে বাধ্য হবো।

—আমি কিছু জানলে তবেই তো স্বীকার করবো। বার্ট আগের মত গলার জোর বজায় রেখে কথা বলে।

—স্যার, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। জন পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বলে।

—তাই তো দেখছি, পোয়ারো জনের দিকে তাকায়। এখান থেকে ভিড় সরাতে হুকুম, দিন তো।

—আচ্ছা স্যার, সঙ্গে সঙ্গে জনের নির্দেশে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। তবে কৌতূহলী জনতা যায় না। অদূরে আগ্রহভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর বার্টকে অনেক অনুনয় বিনয় করা হোল, কিন্তু সে কিছুতেই মুখ খুলতে চাইলো না। এরপর তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। অবশ্য তার আগে ঘর সার্চ করা হলো। পাওয়া গেল রবার্টের পরিবারের একটা ছবি, কিন্তু টাকা আর কয়েক বোতল কান্ট্রি লিকার। ওদিকে পোয়ারো বাচ্চা মেয়ের ছবির সঙ্গে মেরী বা শার্লটের কোন মিল বার করতে পারে না।

স্থানীয় থানা। কনফেসন রুম। এ ঘরে চার জন লোক রয়েছে —পোয়ারো, বার্ট, জন এবং তার সহকারী এ্যালবার্ট বার্ট এখন রীতিমতন হাঁপাচ্ছে। তার উপর কয়েকদিন ধরে বেশ অত্যাচার চলছে। ফলে সে দারুণ ভাবে কাহিল হয়ে পড়েছে। আর যন্ত্রনা

যেন সহ্য করতে পারছে না।

হঠাৎই বার্টের দিকে তাকিয়ে পোয়ারোর একটা কথা মনে পড়ে যায়। ভাবে, যেন বার্টকে কোথায় দেখেছে। সে দারুণ ভাবে ওকে মনে করার চেষ্টা করতে থাকে। তবু মনে করতে পারে না। তারপরই তার মনে পড়ে যায়, খবরের কাগজে ওর ছবি দেখেছে। এক উত্তেজিত জনতার সামনে দিয়ে পুলিশ ওকে গাড়িতে তুলছে। পরে জেনেছিল, কয়েকটা খুনের ব্যাপারে ছেলেটা জড়িত। কিন্তু তার পর মুহূর্তে পোয়ারো ভাবে, তা কেমন করে হবে? হয়তো সে অন্য কাউকে সেদিন দেখেছিল। আর তা হলেও জোন্সের সঙ্গে বার্টের কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়। বার্ট হলো গিয়ে শহুরে ছেলে, এবং থাকে বলে সে একজন উঠতি মাস্তান। আর জোন্স হলো গিয়ে……। কিন্তু সম্পর্ক তো অনেকের সঙ্গেই অনেকের থাকে না। আবার ঘটনা চক্রে অনেকেই আবার অনেকের জড়িয়ে পড়ে। একেই বলে পৃথিবীর বিচিত্র নজীর। যা আগে ভাগে কিছুই বোঝা যায় না। তবু পোয়ারো নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে, সেদিনের সেই ছবির এই তো নায়ক? না, সে চিনতে ভুল করছে? এত বছর আগেকার ছবি, তা হলেও ও ছবির ঘটনা যেন স্পষ্টভাবে তার মনকে নাড়া দিতে থাকে। হ্যাঁ, এই সেই ছেলে। না হয়ে কিছুতেই যায় না ওদিকের বার্টের উপর সমানে নির্যাতন চলছে। তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে দম নিয়ে বলে, স্যার! সব বলছি। তার আগে একটু জল! মরে যাচ্ছি!

—জল দেবো, তার আগে সব কথা বলবে বলো? পোয়ারো শুধু টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা তুলে ধরে। নইলে গ্লাসের জল বাইরে ফেলে দেবো।

—না! না! জল ফেলে দেবেন না, বার্ট করুণ ভাবে কাকুতি জানায়। সব বলছি। সব।

—এই নাও জল।

বার্ট জল খেয়ে কিছুটা চাঙ্গা বোধ করে এবং নিজের মূর্তি ধারণ করে। বলে, না, না, আমি কিছু জানি না। আমাকে শুধু শুধু এখানে ধরে এনেছেন। আমি মানহানীর মামলা করবো।

—আবার চলবে তোমার উপর অকথ্য অত্যাচার, পোয়ারো চাপা গলায় চিৎকার করে ওঠে। আর তুমি তাই চাও। বলে সে বেল বাজায়।

—না! না! বার্ট সজোরে চেঁচিয়ে ওঠে। আসলে দৈত্যের মত মেক্সিকান লোকটার নির্দয় মারের কথা আবার তার মনে পড়ে যায়। ওটা যেন মানুষ নয়। সাক্ষাৎ যম। যেন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

—তাহলে বলো!

—বলছি! বার্ট আর 'যন্ত্রনা সহ্য করতে পারে না। তারপর সে সমস্ত কিছু স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

সাতাশ

একটু আগে ডিনসমেড অফিসে এসেছে। মন খারাপ। জোন্স যে তাকে এ-ভাবে ফাঁকি দিয়ে যাবে তা সে আদৌ কল্পনা করতে পারেনি।

বাচ্চা মেয়েটার জন্য ডিনসমেড সত্যিই বিচলিত। ভাবে, জোন্স কখনো ঐ পরিবারের মেয়েকে মানুষ করতে পারে! ওর হাতে পড়ে মেয়েটার ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে। তাছাড়া, ডিনসমেড নিজের বিবেকের কাছেই বা এর কি জবাব দেবে? রবার্ট তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে মারা যেতে তার মেয়েটা ভেসে গেল! অথচ রবার্টের কাছ থেকে সে আপদে বিপদে কত সাহায্য পেয়েছে! আর সেই মেয়ে কি না......। না, না, এ কিছুতেই হতে পারে না,

ডিনসমেড ভাবে। আবার নতুন করে জোন্সের খোঁজার চেষ্টায় থাকতে হবে। এবং যে করে হোক তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। নইলে সে সারা জীবন মরমে মরে থাকবে।

কিন্তু তার পর মুহূর্তে ডিনসমেড আবার ভাবে, জোন্সকে গিয়ে সে কোথায় খুঁজবে? স্থানীয় পুলিশের কাছ থেকে ওর ঠিকানা নিয়ে দেশের বাড়ির কোন হদিস করতে পারেনি। বলতে গেলে ওখানের প্রতিটি বাড়ি সে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। তাতে সময় কম কষ্ট করেছে। তার পরিশ্রমই শুধু সার হয়েছে। তাই আবার চেষ্টা করবে বললেই তো আর হলো না। তবে এ কথাও ঠিক, এ খোঁজা থেকে তাকে পিছিয়ে পড়লে চলবে না। এই সব ভেবে একদিন ডিনসমেড ঐ গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং আশে পাশের গ্রাম খুঁজতে খুঁজতে সে জোন্সের দেখা পেয়ে যায়। তাকে দেখে সে একটুও রাগ করলো না। শুধু একটা উত্তেজনা তার মধ্যে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এবং খুব শান্ত ভাবে বলে, আরে জোন্স! তুমি?

—আপনি আবার আমার খোঁজে এখানেও এসেছেন? জোন্স ডিনসমেডকে দেখে রীতিমতন রেগে যায়।

—আরে এ সব কথা পড়ে হবেখন, ডিনসমেড খুব সহজ ভাবে কথাটা বলো। আগে আমায় একটু বসতে দাও। তোমার দেখা পেতে আমায় অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে।

—ঘরে বসুন, জোন্স অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডিনসমেডকে ঘরে এনে বসায়।

বাচ্চা মেয়ে ডিনসমেডকে কয়েকবার দেখেও চিনতে পারে না। বরং ভয় পায়। তারপর টলতে টলতে গিয়ে জোন্সের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ লুকোয়।

—ওকে দেখে কে? ডিনসমেড মুখে হাসি ফুটিয়ে জোন্সের দিকে তাকায়।

—কে আবার দেখবে। জোন্স অসংকোচ ভাবে জবাব দেয়। আমিই।

—তুমি কখনো পারো।

—না পারার কি আছে। আর দেখছেনই তো আগে থেকে ওর চেহারা ফিরেছে।

—চেহারা? না, না, এ তোমার চোখের ভুল। বরং……। যাক্, সে কথা। এ দু' কামরার বাড়িটা কি তোমার?

—হ্যাঁ।

—তা এখানে কি করছো?

—জমি কিনে চাষবাস করছি।

—খুব ভালো কথা। টাকা নয় ছয় না করে এসব করে খুব ভালোই করেছো। তা মেয়েকে নিয়ে চাষবাস কেমন করে করছো?

—একটা লোক রেখেছি। সেটা যেমন চোর, তেমনি আবার ফাঁকিবাজ। এটা একটা অসুবিধে হয়েছে। তবে সেটা……। ডিনসমেড জোন্সকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বলে, চাষবাস আর মেয়ে দেখাশুনো কখনো একভাবে চলতে পারে। এবং এখানে মেয়েকে মানুষ করবেই বা কোথায়। একটা ভালো স্কুল আছে! আর রবার্টের মত মেয়ে বলে কথা।

—মোট কথা আমি এ মেয়ে আপনাকে কিছুতেই দেবো না। এ আমার সাফ কথা। জোন্স স্পষ্ট ভাবে জানায়, ওকে আমি একদিন বয়স থেকে মানুষ করে আসছি।

—আমি তোমার কথা অস্বীকার করছি না, কিন্তু বাচ্চাও তো স্নেহ ভালোবাসার কাঙাল। বাবা মার কত আদর চায়। আর আমার সংসারে গেলে ওসব পাবে। শুধু নয়, মানুষের মত মানুষ হতে পারবে, যা তোমার কাছে থাকলে কিছুতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু জোন্সের সেই এক গোঁ, আমি এ মেয়েকে কিছুতেই দেবনা।

কিন্তু রবার্টের বন্ধু হিসেবে আমারও তো কিছু কর্তব্য আছে।

—ওসব তত্ত্ব কথা আমি বুঝি না।

—তাহলে তুমিও শুনে রাখো, তুমি এ মেয়ে না দিলে আমি পুলিশের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবো।

—পুলিশের যাবেন ? যান। আমি তো আপনাকে বারণ করছি না।

—তুমি আমার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলছো! ডিনসমেড বেশ ভালো করেই জানে। থানায় গেলে ও সে বাচ্চার অধিকার পাবে না। কারণ সে বাচ্চা তাকে দেখে ভয়ে ছিটকে সরে গিয়ে কাঁদতে থাকে, সে বাচ্চার অধিকার তাকে কিছুতেই দেবে না। উল্টে জোন্সের অধিকারই কায়েম হবে।

—কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি।

—কিন্তু তুমি একটা কথা ভাবে দেখো, আমি তো বাচ্চার ভালোর জন্যেই ওকে কাছে রাখতে চাইছি।

—আমি আগেও বলেছি এবং এখনো বলছি, আপনি দয়া করে এ অনুরোধ আমায় করবেন না।

—তুমি কি চাও ?

চাইবো আর কি কিছুই নয়। মোট কথা, বাচ্চা আমার কাছে থাকবে।

—তোমাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

—পাঁচ হাজার ? জোন্স বিস্ময় বোধ করে।

—হ্যাঁ, আর তার বিনিময়ে আমায় মেয়েকে দাও। আসলে রবার্টের প্রতি আমার দুর্বলতার খবর তুমি বেশ ভালো করেই জানো।

—আমি এতটা পিশাচ নই। টাকার বিনিময়ে আমি মেয়েকে বেচতে পারবো না।

—তোমাকে আমি আরো পাঁচ হাজার দিচ্ছি।

—তাও নয়।

—আমি আর বাড়তে পারবো না। ব্যবসার অবস্থা খুব সঙ্গীন।

—আমি এক পয়সাও চাই না।

—জোন্স! প্লীজ!

—আমি আপনার কথা রাখতে পারবো না, আর আপনি এখন চলে গেলে আমি খুশী হবো।

আরও ডিনসমেড নানা ভাবে জোন্সকে অনুনয় বিনয় করে, কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয় না এবং জোন্স তাকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয়, এ মেয়ে আমার কাছেই থাকবে।

—ঠিক আছে, দেখি ও মেয়ে কেমন করে তোমার কাছে থাকে। যদিও কথাটায় বেশ জোর দিয়ে ডিনসমেড বললো, কিন্তু সে বেশ ভালো করেই জানে, এটা একটা বৃথা আস্ফালন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এতে কোন কাছ হবে বলে মনে হয় না। কারণ ওকে এভাবে কোনদিন কথা বলতেও দেখিনি।

ডিনসমেড চলে আসে মেয়ের জন্য সে দারুন ভাবে উতলা বোধ করতে থাকে। ভাবে, যাওয়া কি জোন্সের কাজ পেলে। তাতেও কোন কাজ হলো না। জোন্সের গোঁই বজায় রইলো।

ডিনসমেড দিশেহারা হয়ে অফিস ঘরে পায়চারি করতে থাকে। কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। হঠাৎ দেখে, দরজার সামনে বার্ট এসে দাঁড়িয়েছে।

বার্টকে ডিনসমেড বেশ ভালো করেই চেনে, এ পাড়ার এক উঠতি মস্তান, হিপিদের সঙ্গে মিশে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। একবার তার কাছে এসে ভয় দেখিয়ে একশো টাকা নিয়ে গেছে। ডিনসমেড বার্টের দিকে তাকায়। বার্টের বয়স বেশী নয়। কুড়ির

কাছে। ,মজবুত স্বাস্থ্য। লম্বা লম্বা দাড়ি গোঁফ চুল।

—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল, বার্টের কথায় দৃঢ়তা।

—বলো কি বলবে? ডিনসমেড মনে মনে ভয় পেলেও একটু সহজ ভাবে কথা বলে।

—আমার একটা চাকরি চাই।

—চাকরি? ডিনসমেডের মাথায় হাত।

—হ্যাঁ।

—আমার ব্যবসা লাটে ওঠার দাখিল হয়ে উঠেছে।

—আমায় যে কোন কাজ দিন করতে রাজি আছি। পাড়ায় বেপাড়ায় কোন কিছু হলে পুলিশ এসে আমায় টানা হ্যাচড়া করে। এ আর ভালো লাগে না। তাছাড়া, কয়েকবার জেলও খেটেছি। তবু ডিনসমেড 'না, না' করতে থাকে, তারপর তার হঠাৎ জোন্সের কথা মনে পড়ে যায়। ভাবে, বার্টকে দিয়ে কাজ হলেও হতে পারে, কাঁটা দিয়ে সে কাঁটা তুলবে।

তাই ডিনসমেড বলে, একটা লোককে শায়েস্তা করতে পারবে?

—পারবো, কিন্তু কত টাকা পাবো?

—পাঁচশো টাকা দেবো।

—রাজি, কিন্তু কাজটা কি?

—তারপর ডিনসমেড সত্যি মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে বার্টকে ঘটনা বুঝিয়ে দিয়ে বলে, ঐ মেয়ে আমার চাই।

—ঐ মেয়েকে চান? বার্ট ডিনসমেড বাজাতে চায়।

হ্যাঁ।

—তাহলে তো পাঁচশো টাকায় হবে না।

—হবে না? তা কত দিতে হবে?

—দশ হাজার, আর আমার মনে হচ্ছে ওর মধ্যে কিছু ব্যাপার লুকিয়ে আছে, যা আপনি আমার কাছে সম্পূর্ণ চেপে গেছেন, বলে বার্ট স্থির দৃষ্টিতে ডিনসমেডের দিকে তাকায়।

—ব্যাপার আবার কি থাকবে। ডিনসমেড স্বাভাবিক ভাবে কথাটা বলে।

—কিছু নেই? বার্টের বিশ্বাস হয় না।

—না।

—আছে নইলে……। যাক্, কত দেবেন তাই বলুন? টাকার আমার দারুন দরকার।

হাজার টাকার বেশী কিছুতেই দিতে পারবো না।

—হাজারে হবে না।

শেষে দু'হাজারে রফা হলো এবং বার্ট ডিনসমেডের কাছ থেকে জোন্সের পূর্ণ বিবরণ নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

বার্ট কি ভাবে জোন্সকে আক্রমণ করবে তা একটা খসড়া মনে মনে তৈরি করে নেয়। তারপর সে ভাবে, সবার আগে প্রয়োজন জোন্স কোথায় থাকে সেটা দেখে নেওয়া। এবং এরপর কি করা দরকার ওখানে কি ভাবে ঢুকবে এবং বেরুবে।

তারপর একদিন বার্ট বেরিয়ে পড়ে এবং গিয়ে দেখে আসে কোথা দিয়ে ঢুকবো আর মেয়ে নিয়ে কি ভাবে পালাবো।

আর দিন তিনেক পরে বার্ট আবার ওখানে গিয়ে হাজির. তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বেশ একটা কালো ভাব চারদিকে ছেয়ে রয়েছে।

ওদিকে ডিনসমেড আসার পর থেকে জোন্স কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ডিনসমেড মেয়ের জন্য আবার আসবে। তবে সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, ডিনসমেড নেবার জন্য এত পেড়াপেড়ি করছে কেন।

জোন্স ভাবে, শুধু বন্ধুর প্রতি কর্তব্য করতে চাইছে? না, এর পিছনে অন্য কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, যেটা অতি মাত্রায় কদর্য।

তবে জোন্স ডিনসমেডের সম্বন্ধে আবার এসব ভাবতে পারে না। কারণ কোনদিন খারাপ ব্যবহার অথবা বেচাল হতে দেখিনি। কর্তামা

মারা যেতে মেয়ে তার কাছে নিয়ে রেখেছিল। হয়তো মেয়েটার মায়ায় পড়ে গেছে।

কিন্তু সে? জোন্স ভাবে। সে তো মেয়েটাকে ছাড়া বাচবে না। এখন এই মেয়েই তার ধ্যান ধারণা। আর এই মেয়ের জন্য করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই।

তবে ডিনসমেড সেদিন আসায় জোন্স বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে। নিজের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে এলো। তাও সে ডিনসমেডের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলোনা। ঠিক ধরা পড়ে গেল। কিন্তু এখন উপায়? আর সে বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছে। একবার ডিনসমেড যখন মেয়ের সন্ধান পেয়েছে তখন সে আবার আসবে।

হঠাৎ ডিনসমেডের চিন্তা জোন্সের মনে চিড় খেয়ে যায়। একটা শব্দ তার কানে ভেসে আসে। এবং সে লক্ষ্য করতে থাকে, শব্দটা কোথাকে এসেছে।

জোন্সের আশে পাশে কোন বাড়ি নেই। বেশ ফাঁকাই বলা চলে। বাড়ির একদিকে বুনো লতা, এবং অন্য দিকটা কাঁটা ঝোপ ঝাড়ে ভর্তি।

আবার একটা পায়ের শব্দ হলো। কে যেন বাড়ির পিছন দিকে উঠলো। ওখানে একটা ছোট্ট লোহার সিঁড়ি রয়েছে। ছাদে ওঠা যায়।

জোন্স আওয়াজ লক্ষ্য করে সেদিকে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একজনের অস্তিত্ব সে টের পেয়ে যায় বেশ ভালো করেই বুঝতে পারে, ও কোন ভালো মতলবে এখানে আসেনি। হয়তো চোর, নয়তো ডিনসমেডের দূত।

তবে ও চোর নয়, জোন্স ভাবে। আর চোর কোন আশায় তার ঘরে চুরি করতে আসবে? আর কাছে আছেই বা কি! যা আছে তা সে ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছে। প্রয়োজন মত তুলে নিয়ে কাজ চালায়।

সুতরাং ও ডিনসমেডের লোক, উদ্দেশ্য মহৎ নয়। জোন্স বুকের কাছে শক্ত করে মেয়েকে আঁকড়ে ধরে। এবং ঘরের কোন থেকে একটা পাথর এনে আপষ্ট ছাদের আলোয় শব্দ লক্ষ্য করে সেদিকে পাথরটা ছুড়ে মারে।

পাথরটা গিয়ে বার্টের মাথায় লাগেনি। একটুর জন্য লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে। তবে গিয়ে লেগেছে তার হাতে। ওখানে লাগালেও সে প্রচণ্ড আঘাত পায়, এবং আচমকা বসে আরো চোট লাগে।

অ্যাঁ! আওয়াজ তুলে বার্ট ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়তে থাকে। ভাবে, লোকটা হয়তো ডাকাত। নয়তো একটা খুনে। না, এ ভাবে কাজে নামা যাবে না। কৌশলে কাজটা হাসিল করতে হবে।

তারপর ডিনসমেড বার্টের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে গম্ভীর হয়ে রইলো। তবে একটা আশার কথা যে, বার্ট জোন্সের হাতে নাতে ধরা পড়েনি। পারলে ঠিক থানায় দিতো। আর দিলে তখন জেরায় জেরায় তার নালটা বেরিয়ে পড়তো।

বার্ট বলে, কিছু ভাববেন না। আমি একটা উপায় বার করবোই।

—আর বার করতে পেরেছো তবুও ডিনসমেড মেয়ের আশা কিছুতেই ছাড়তে পারে না।

—দরকার হলে ওর লাশ ফেলে দেবো।

—লাশ ফেলে দেবে? না, না, ও কাজ করতে যেওনা।

—আপনি কিছু ভাববেন না। ও আমার বাঁ হাতের কাজ। কেউ টের পাবে না। সঙ্গে আমার এক বন্ধুকে নেবো।

—সে বিশ্বাসী? হঠাৎ ডিনসমেড বলে।

—হ্যাঁ।

—সে কি করে।

—ওর বাবা মরে যেতে একটা ল্যাবোরেটরিতে কাজ পেয়েছে।

—ল্যাবোরেটরিতে? ডিনসমেড কথাটা বলেই ভাবতে থাকে।

—হ্যাঁ।

—ওর কাছ থেকে আরসেনিক যোগড় করতে পারবে, যেটা বিষ।

—ল্যাবোরেটরিতে আছে যখন তখন পাবে বই কি। তা শুদিয়ে করবেন কি?

—শোন, জোন্স মরিয়া হয়ে উঠেছে। ও মেয়েকে কিছুতেই দেবে না বুঝতে পারছি। তা তুমি একটা কাজ করতে পারবে?

—হ্যাঁ পারবো। তা কাজটা কি?

—এখন থেকে দাড়ি গোফ কামাবে না এবং একটু বাড়লে জোন্সের কাছে যাবে। আর প্রয়োজনে তার পায়ে ধরে ওর কাছে থাকার চেষ্টা করবে। বলবে। আমি অনাহারে মরতে চলেছি। আর কোথায় থাকো জিজ্ঞেস করলে ওখানকার একটা গ্রামের পথ বলে দেবে। আর বলবে, আমি ঘর দোর মেয়ে সব সামলাবো। এবং ওর একটা কাজের লোক খুবই দরকার।

—ঠিক আছে।

—ওখানে গিয়ে তোমার প্রধান কাজ হবে, 'জোন্সের খুব তোয়াজ করা এবং প্রতি বার ওর মদের সঙ্গে কিছুটা পরিমান করে আরসেনিক মিশিয়ে দেবে।

—তাহলে কি হবে?

—এতে স্লা পয়জানে ও মারা যাবে। লোকে তোমায় সন্দেহ করতে পারবে না। সাপও মরবে অথচ লাঠি ভাঙাবে না। এবং আমি তাই চাই।

—এতো খুব সোজা কাজ।

—সোজা ঠিকই, তবু একটু চোখ কান খুলে চলবে।

—তাই হবে, আর সেই সঙ্গে আমারটাও একটু বিবেচনা করবেন।

—আমার কাজে লাগবে তুমি বঞ্চিত হবে না।

—আচ্ছা, ঐ মেয়ে আপনার কাছে আনতে পারলে আপনি কত টাকা পাবেন?

—টাকা? আমি।

—হ্যাঁ।

—আরে না, না, ডিনসমেড হাসে। ও হলো গিয়ে আমার এক বন্ধুর মেয়ে। এর মধ্যে টাকা-পয়সার কোন প্রশ্ন নেই।

—আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না।

—তোমরা শুধু টাকার কথাটাই ভাবো।

—যাক্, আপনার মামলা আপনি বুঝবেন। আমার আরো তিন হাজার টাকা চাই।

—তিন হাজার! ডিনসমেড আঁতকে ওঠে।

—হ্যাঁ, আর একটা লোককে খুন করবো তার বিনিময়ে ঐ টাকাটা দেবেন না!

—তোমায় এত টাকা দিতে গেলে আমায় ধার করতে হবে।

—তাই নয় করবেন। কারণ স্থানীয় থানায়ও তো আগে ভাগে কিছু ছেড়ে রাখতে হবে। কখন কোন বিপদে ফেঁসে যাবো তার তো কিছু ঠিক নেই।

—ঠিক আছে, ঐ তিন হাজারই পাবে। তবে আমার কাজ চাই।

—জেনে রাখুন হয়ে গেছে।

—কিন্তু কি ভাবে জোন্সকে বশ করবে?

—তার প্লান আমি করবো। এবার আর শুধু হাতে ফিরছি না।

মাস খানেক পরে বার্ট আবার জোন্সের কাছে হাজির। এখন বার্টের অন্য চেহারা। তার মুখ গোঁফ দাড়ির জঙ্গলে ভর্তি। ওর আড়ালে তার আসল মুখই চেনা দায় হয়ে পড়েছে।

দূর থেকে বার্ট দেখতে পায়, জোন্স নিজেই জমিতে কাজ করছে এবং মেয়েটাকে পাশে বসিয়ে রেখেছে। ও মাটি নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে।

একটা কাজের লোক না থাকায় জোন্সের খুবই অসুবিধে হচ্ছে। এখন তার একটা সব সময়ের লোক না হলে আর কিছুতেই চলছে না। তবে যাকে তাকে আবার রাখা চলবে না। বিশ্বাসী লোক চাই।

বার্ট জোন্সের কাছে গিয়ে করুণ গলায় বলে, ভাই আমায় একটা কাজ দেবে?

—কাজ? জোন্স বার্টের দিকে তাকায়। তার লোক দরকার তবু সে বলে, কাজ চাইলেই হলো। এ বাজারে কাজ কি এত সহজে পাওয়া যায়।

—আ—আমায় একটু জল দেবে! বলে সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

—কি হলো? জোন্স তো মহা মুশকিলে পড়ে যায়। ভাবে, মরে ফোরে গেল নাকি! শেষে আবার পুলিশ কেসে জড়িয়ে পড়বে নাতো! বার্ট এই ভাবে পড়ে যেতে আশে পাশের জমির লোকেরা এসে ওখানে জড় হয় এবং উদবিগ্ন মুখে জিজ্ঞাস করে কি হয়েছে! কি হয়েছে? বেঁচে আছে তো?

—দেখো না ভাই! ওরা আসতে জোন্স আরো ভয় পেয়ে যায়। কাজের কথা বলতে বলতে একটু জল চাইলো। তারপরই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

—ও আমার কাছের কাজ চাইতে এসেছিল, ওদের মধ্যে একজন বলে ওঠে। এখুনি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।

তারপর একজন ডাক্তার এলো। পরীক্ষা করে বললো, ভয়ের কিছু নেই, অনাহারে ও অবস্থা হয়েছে। ওকে এখুনি কিছু খাওয়ানো দরকার। কাছেই জোন্সের বাড়ি। সবাই বার্টকে ধরাধরি করে ওখানে নিয়ে গেল এবং সেই থেকে বার্ট ওখানে বহাল হলো।

তবু জোন্স সজাগ। সে প্রথমটা ঠিক যেন বার্টকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাবে, ডিনসমেডের চর নয়তো। তাই একটু পরীক্ষা করে দেওয়া প্রয়োজন। তাই সে মেয়েকে কাছে কাছে রাখে। বার্টের সঙ্গে একা কোথাও যেতে দেয় না। এবং ওকে বেশ সন্দেহের চোখে দেখছে।

কিন্তু মাস খানেকের মধ্যে বার্ট মেয়ের মন জয় করে নেয় এবং মধুর ব্যবহারের জন্য জোন্সও ওকে আর সন্দেহের চোখে দেখছে না। আর তাতেই করলো সে বিরাট একটা ভুল ; যা এর ভবিতব্যে লেখা ছিল।

এখন এ সংসারের বার্ট একবারে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বার্ট না হলে যেন কোন কাজই হয় না।

বার্টের মূলধন সংগ্রহ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সে বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছে। আর ও আসায় জোন্স যেন হাত পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিতে পারছে। এবং আগের তুলনায় বেশী মাত্রায় জমির দিকে ঝুঁকেছে। ফলে জমির আয়ও বেড়ে চলেছে। যেটা আগে অন্যরা নয় ছয় করতো।

এতে জোন্স খুশী। এখন সন্ধ্যা হলেই ঘরে মদের আসর বসে যায়। জোন্সের এক গ্লাসের বন্ধু এখন বার্ট। আর সারা দিনের হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পর একটু মদ না হলে যেন আর চলে না।

সেদিন বার্ট সঙ্গে করে আণ্ডারওয়ারের তলায় পলিথিনের ব্যাগে করে আরসেনিক বিষ নিয়ে এসেছিল। তারপর কৌশলে তা গোপন জায়গায় রেখে তা থেকে একটু একটু করে নিয়মিত জোন্সের মদের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে লাগলো। এবং দুপুরে যে মাঠে খাবার নিয়ে

যাও তাতেও তা করতে লাগলো।

এরপরই ঘটলো একটা ঘটনা। যার জন্য বার্ট একবারে প্রস্তুতি ছিল না। হঠাৎ জোন্স যন্ত্রনায় কুঁকড়ে যেতে থাকে। তখন সে মাঠে কাজ করছিল।

সঙ্গে সঙ্গে বার্ট এ খবর পেয়ে একবারে ডাক্তার নিয়ে হাজির। ডাক্তার জোন্সকে পরীক্ষা করে বললো, হার্ট অ্যাটাক। হাসপাতালে এখুনি নিয়ে যাওয়া দরকার। এবং তাকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনার জন্য বার্টকে ধন্যবাদ দিলো। নইলে ওকে হয়তো বাঁচানো যেত না। তবে এখনো কিছুটা ভয়ের কারণ আছে।

সবাই বার্টকে ধন্য ধন্য করলো। এতে সাপে বর হলো। লোকে আর তাকে সন্দেহ করতে পারবে না। এবং সে এটাই চাইছিল। আর সত্যি কথা বলতে কি, যে পরিমাণে সে আরসেনিক চালছে। তাতে জোন্স মৃত্যু পথ যাত্রীও। ও ঐ ভাবে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তে তার বিবেক যেন নাড়া দিয়ে উঠলো। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে ধিক্কার দিয়ে বললো, এখন তার জন্য অন্তত কিছু করো। দিন কুড়ির মাথায় জোন্স বাড়ি ফিরে এলো, কিন্তু আগের শক্তি যেন আর কিছুতেই ফিরে পাচ্ছে না। তার শরীরে ভাঙ্গন ধরেছে।

আর জোন্স বাড়ি ফিরে আসতে বার্ট নিশ্চিন্ত। কারণ জোন্স হাসপাতালে ভর্তি হতে সে দারুণ ভয় পেয়ে গেছিল। ভেবেছিল, আরসেনিকের কথাটা না আবার বেরিয়ে পড়ে। তাহলেই সে গেছে। তার ভেগ ধরা পড়ে যাবে। যাক্ এখন সে নিশ্চিন্ত। তবে এ ভাবে জোন্সকে মেরে ফেলার পিছনে বার্টেরও কিছুটা স্বার্থ রয়েছে। যেমন সে টাকা পাবে, তেমনি জোন্সের অবর্তমানে সেই এই জায়গা' জমির মালিক হবে; তাতে ডিনসামেড কখনো হাত বাড়াবে না। সে কথা আগেই দু'জনের মধ্যে হয়ে রয়েছে আর বার্ট আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছে। বেইমানি করা

ভালো হবে না। একবারে খতম করে দেবে। আর এ জীবন বার্টে'র আর ভালো লাগছে না। গুণ্ডামি, বদমাইসি, থানা পুলিশ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। এ জীবন সে আর সহ্য করতে পারছে না।

এখন এসব জায়গা-জমির মালিক হয়ে যাওয়া অনেক শ্রেয়। যদিও এর মধ্যে একটু ঝুঁকি নেই তা নয়। আর ঝুঁকি না নিলে কাজই হয় না। যত ঝুঁকি তত লাভ। সেই সঙ্গে বিপদের কথাও এসে যাচ্ছে তবে সে রকম কিছুতে জড়িয়ে পড়লে কয়েক বিঘে জমি বিক্রী করে টাকাটা পুলিশের মুখে ছুড়ে মারবে। ব্যাস তাহলেই সব ঠিক আছে। চাঁদির জুতোয় কেনা শেষ।

তারপরেই একদিন সকালে উঠে বার্ট দেখলো, জোন্স আর কথা বলছে না। কয়েক বার ডাকে ও কোন সাড়া মিললো না এরপর ঠেলতে গিয়ে দেখে গা বরফের মত ঠাণ্ডা।

সঙ্গে সঙ্গে বার্ট আশে পাশের দু' একজন লোককে খবর দিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটে। এবং ডাক্তার নিয়ে আসে।

বৃদ্ধ ডাক্তার। তেমন পসার নেই, চোখেও তেমন ভালো দেখে না। গ্রামের লোকই তার ভরসা।

বার্ট ইচ্ছে করে সেই ডাক্তারকে নিয়ে এলো এবং পথে আসতে আসতে বললো, আপনি জোন্সকে বাঁচিয়ে দিন আমি আপনাকে পুষিয়ে দেবো। আর বার্ট বেশ ভালো করেই জানে, জোন্স আর কোনদিন কথা বলবে না।

কথা শুনে ডাক্তার খুশী। বৃদ্ধ বয়স। বড় অসহায়। এখন তার টাকার সবচেয়ে প্রয়োজন।

ডাক্তার জোন্সকে পরীক্ষা করে বলে, আমার আর কিছুই করার নেই। ও মারা গেছে।

বার্ট কাঁদো কাঁদো গলায় জানতে চায়, কি হয়েছিল?

—হার্ট ফেল করেছে।

—আপনি আর কি করবেন। বলে বার্ট পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে ডাক্তারের হাতে দেয়, নিয়ে যান একশো টাকা। আমি এখন কি করবো। একজন এসে বার্টকে সান্ত্বনা দেয়, বার্ট তোমায় এভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। তোমার কাঁধে এখন অনেক দায়িত্ব। মেয়েকে এখন তুমি ছাড়া আর কে দেখবে।

ও দিকে ডাক্তার এত টাকা পেয়ে খুশী। সে বেশ ভালো করে একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দেয়, যা বার্ট চাইছিল।

কেউ কোন রকম সন্দেহ করলো না। নির্বিঘ্নে জোন্সকে কবরস্থ করা হলো। তার কিছু দিন পরে বার্ট এসে মেয়েকে ডিতসমেডের হাতে দেয়।

আঠাশ

বার্টের জবান বন্দী শেষ হতে পোয়ারো বলে, মিঃ জন টেপটা বন্ধ করে নিন।

—হুঁ, বলে জন তার কাজটা সমাধা করলো।

—এবার মিঃ ডিনসমেডকে অ্যারেস্ট করতে হবে।

—হ্যাঁ, আর আমি ভাবছি, এত দিনের পুরনো ঘটনা টেনে বার করলেন কি ভাবে। জন মনে মনে পোয়ারোর প্রশংসা করে।

—এখনো পুরোটা হয়নি, আর কিছু বাকি আছে।

—সেট কি?

—এখন বলবো না। কারণ আমার অনুমান পুরোপুরি সত্য নাও তো হতে পারে।

—ও।

তারপর জন তার সহকারীকে কিছু জরুরী নির্দেশ দিয়ে তার

অফিসে ফিরে যায়। সঙ্গে পোয়ারো। এরপর পোয়ারোকে তার সামনের চেয়ারে বসতে বলে রিসিভার তুলে নেয়।

—হ্যালো।

—আমায় একটু গ্রীনউড থানার লাইনটা দিন। এখনি ভীষন জরুরী ব্যাপার।

—আচ্ছা স্যার, টেলিফোন অপারেটার সায় জানায়। একটু পরে লাইন বেজে ওঠে। জন ব্যস্ততার সঙ্গে রিসিভার তুলে নেয়, হ্যালো!

এখানকার টেলিফোন অপারেটর গলা ভেসে ওঠে, স্যার, অনেকবার ট্রাই করলাম। এখনো কেন রেসপন্স পাচ্ছি না।

—বার বার ট্রাই করে যাও।

—ইয়েস স্যার।

ইতিমধ্যে ওদের জন্য কফি এসেছে। এখন পোয়ারোকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে। সে কফিতে চুমুক দিয়ে জনের দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ জন, বার্টের দিকে একটু বিশেষ ভাবে নজর দেবেন।

—নিশ্চয়ই স্যার।

—কারণ ও আমাদের প্রধান সাক্ষী হিসেবে কাজ করবে।

—আর একজন অপরাধী ও এবং টেপটা খুব সাবধান যদি পোয়ারা ও এ কথা বললো সে নিজেও একটা ছোট্ট টেপ রেকর্ডারে বার্টের কথাবার্তা টেপ করে নিয়েছে। কারণ পুলিশ লাইনে তার অনেক কুকীর্তির কথা কার জানা আছে। ওরা পয়সার জন্য রাতকে দিন করে দিতে পারে। তবে আবার এ কথাও ঠিক যে, সবাই এক অপরাধে অপরাধী নয়। কিছু দুষ্ট লোকের জন্য আজ এই অবস্থা।

জন পোয়ারোর কথায় মাথা নাড়লো ও সে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছে না। কারণ বার্ট হলো গিয়ে দাগী আসামী। তেমনি ছল চাতুরীতে পারদর্শী। এবং তার কীর্তিকলাপ সে কথা বার বার জানিয়ে দিচ্ছে। আর সে যথেষ্ট বুদ্ধিও ধরে। তাই সে তার দিক

দিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তার উপর এটা আবার পাড়া গাঁয়ের থানা। এখানকার ব্যবস্থা তেমন জোরদার নয়। একবার কোন রকমে পালিয়ে গেলেও ধরা মুশকিল।

তারপর পোয়ারোর হঠাৎ এমেটের কথা মনে পড়ে। হ্যাঁ, সেই এখন উপযুক্ত লোক। যাকে এ-কাজের ভার দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, সাবধানের মার নেই।

ইতিমধ্যে ফোনটা বেজে উঠলো। জন কফিতে চুমুক দিতে যাচ্ছিল। তা থেকে সে বিরত থেকে রিসিভারটা তুলে নেয়, হ্যালো।

—স্যার, বার বার চেষ্টা করার পর লাইনটা পেলাম। স্পিক হিয়ার প্লিজ।

—থ্যাঙ্ক ইউ হ্যালো।

—হ্যালো।

—গ্রীন ইউ থানা ?

—হ্যাঁ।

—আমি অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন ?

—সিয়টো থানা থেকে।

—ধরুণ।

—হ্যালো।

—হ্যালো। অফিসার কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনি গ্রীন উডের মিঃ ডিনসমেডকে চেনেন ?

—মিঃ ডিনসনেড ? থানায় ভারপ্রাপ্ত অফিসার ভাবতে থাকে।

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার তাকে চিনতে পারছি। এখানকার একটা বাংলো বাড়ির মালিক। বেশ কয়েক বছর ধরে আছে।

—তাকে অ্যারেস্ট করুণ।

—অ্যারেস্ট করবো ? অফিসারের অবাক হবার কারণ আছে।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তার বিরুদ্ধে চার্জ কি ?

—অনেক চার্জ আছে, আর মিঃ আরকুল পোয়ারোর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন ?

—ও নিশ্চয়ই।

—তিনি এ ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেশন করছেন।

—তাহলে তো এখনই গিয়ে মিঃ ডিনসমেডকে অ্যারেস্ট করতে হয়।

—হ্যাঁ তাই করুণ।

—আপনার নামটা জানতে পারি কি ?

—জন, আর আপনার।

—স্টিফেন।

—আর শুনুন, অ্যারেস্ট করে দয়া করে আমায় ম্যাসেজটা পাঠাবেন কারণ মিঃ পোয়ারো একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

—স্যারকে চিন্তা করতে বারণ করে দিন। মিঃ ডিনসমেড এ চত্তরে থাকলে তিনি ঠিকই অ্যারেস্ট হয়ে যাবেন।

—ঠিক আছে, ছাড়ছি।

—হ্যাঁ।

পোয়ারো এখান থেকে বেরিয়ে একটা পাবলিক টেলিফোন বুথের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর চারদিকে একটু সজাগ দৃষ্টি বুলিয়ে টেলিফোন বুথে প্রবেশ করে দরজাটা ভেতর থেকে ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে ডায়াল করে।

—হ্যালো।

—মিঃ এমেট ?

—হ্যাঁ। আপনি কে কথা বলছেন ?

—আমি পোয়ারো।

—গুড মর্নিং স্যার।

—গুড মর্নিং। আপনাকে এখন যে আমার ভীষণ প্রয়োজন।

—বলুন স্যার, আপনার সেবায় কি ভাবে লাগতে পারি।

—আপনি এখনি একবার সিয়াটো থানায় চলে আসতে পারবেন।

—সিয়াটো মানে···।

—হ্যাঁ, ট্রেন কয়েক ঘণ্টার পথ।

—স্যার, আপনি ওখান থেকে কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ। তা আপনি আসছেন তো ?

—নিশ্চয়ই স্যার।

—শুনুন, এখানে এসে আমার দেখা পাবেন না। আসবেন ছদ্মবেশে, যাতে কেউ আপনার চিনতে না পারে। এবং ভালো করে শুনুন, ওখানে গিয়ে আপনার কি করতে হবে।

—বলুন স্যার।

বার্টের চেহারার বিবরণ দিয়ে পোয়ারো বলে, এ থানায় আছে, কিন্তু একটি দারুণ বীজ। ও যাতে পালিয়ে যেতে না পারে এবং গেলেও কোথায় যায় সেটা আপনাকে ওয়াচ রাখতে হবে। ওকে কাল আদালতে হাজির করবে। সুতরাং আপনি থানা আদালত সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

—ইয়েস স্যার।

—আর হ্যাঁ, পালিয়ে গেলে স্থানীয় থানায় যেমন জানাবেন, সেই সঙ্গে আমায়ও জানাতে ভুলবেন না।

—ঠিক আছে স্যার। ছাড়ছি।

—আচ্ছা।

উনত্রিশ

—হ্যালো।

—হ্যালো চার্লস?

—হ্যাঁ।

—আমি পোয়ারো।

—সে তোমার কথায়ই আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু তুমি এখন কোথা থেকে কথা বলছো।

—সিয়াটো? : সে তো অনেক দূর।

—কিছুটা। হ্যাঁ শোন, তোমার কি আজ অফিস যাওয়া খুবই জরুরী? পোয়ারো জানতে চায়।

—কেন বলতো?

—তোমায় এখুনি একবার মিঃ ডিনসমেডের ওখানে যেতে হবে।

—প্রথমত গিয়ে দেখবে মিঃ ডিনসমেড অ্যারেস্ট হয়েছে কি না।

—অ্যারেস্ট? মিঃ ডিনসমেড?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন?

—মিঃ রবার্টের মেয়েকে নিজের হেফাজতে রাখার জন্য।

—তাতে কি হয়েছে? বন্ধুর নিঃস্ব মেয়েকে...।

—সোজা পথে রাখলে কিছু বলার ছিল না। সে যে পথটা নিয়েছে সেটা বাঁকা।

—তোমার কথার মাথা মুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—জোন্সকে হত্যা করে...।

পোয়ারোকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বলে, মিঃ ডিনসমেড?

—না সে নয়। তবে লোক লাগিয়ে এ কাজ করেছে।

—কাকে দিয়ে?

—তাকে তুমি চিনবে না।

—তা নয় বুঝলাম, কিন্তু আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, চার্লস একটু দিশেহারা।

কিন্তু ঘটনাটা তাই। শোন, তোমার এখন অনেক কাজ।

—তার আগে বন্ধু, আমায় দয়া করে একটু ধাতস্থ হতে দাও। তোমাদের ডিটেকটিভগিরির গোলক ধাঁধা বড় জটিল।

—আমাদের কাজ কারবার তো মানুষকেই নিয়ে।

—তারা বড় প্যাঁচালো মানুষ, আর তুমি তাদের সঙ্গে মিশে তুমিও একটি ·

—গালাগালি দিয়ে যাও, আর তোমার ধারণাই ঠিক।

—কোনটা?

—মেরী আর শার্লট দু' বোন নয়।

—কে ডিনসমেডের মেয়ে?

—সেটা এখনো ঠিক বলতে পারছি না। তবে মিস জুলিয়েটের কথায় মেরীর নামের মধ্যে একটা সাদৃশ্য পাওয়া গেছে যেটা শার্লটের মধ্যে নেই। দ্বিতীয়ত মিঃ হেনেস এবং মিসেস ম্যাকডোনাল্ডের কথায়ও মেরীর নামের মধ্যে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। তবে···।

—তবে আবার কি?

—আমার মন কিন্তু অন্য কথা বলছে।

—কি বলছে?

—সম্ভবত শার্লট ডিনসমেডের মেয়ে নয়। অবশ্য এটা আমার অনুমান মাত্র। সঠিক ভাবে কিছু বলছি না।

—কারণ ওর মাথায় পরচুলা আছে তাই দেখে বললে?

—তা ঠিক নয়।

—কিন্তু ও একটু আড়ষ্ট সেটা লক্ষ্য করেছো?

—করেছি, কিন্তু ওটা ওর স্বভাব

—হয়তো তাই।

—আর ঐ মেয়েকে নিয়ে ডিনসমেড গ্রীন উড়ে পালিয়ে এসেছে, যাতে কেউ তাকে কোন রকম সন্দেহ করতে না পারে।

—কথাটার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।

—এবং সেই রবার্টের মেয়ে হোক ও নাম তাদের আসল নাম নয়। পোয়ারো বলে।

—হঠাৎ এ কথা বলছো?

—সব সন্দেহের অবসান ডিনসমেড ঘটাতে চেয়েছে।

—তবে শেষ রক্ষা করতে পারলো না এই যা। তা নামটার কথা কি যেন বলছিলে?

—হেনেস এবং মিসেস ম্যাকডোনাল্ডের কথা ছেড়ে দিলেও মিস জুলিয়েটের নামের মধ্যে মধ্যে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

—হয়তো তাই।

—হয়তো নয়, তাই। আর এস. ও. এস. কথাটার মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে।

—যেমন? চার্লসের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

—দু' বোন কিছু একটা অনেক দিন ধরে আঁচ করতে পেরেছিলো

—কার বা কাদের ব্যাপারে?

—ওদের বাবা মার কথায়।

—কেন এ কথা বলছো?

—নইলে কখনো এস. ও. এস. লিখতে যেত না এবং লিখেছে কিছুটা নিজেদের অজান্তে, যেখানে অবচেতন মন খেলা করেছে। আর এ কথাটা যেই লিখে থাকুক না কেন।

—তাহলে তো ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্টকে দিয়ে পরীক্ষা করালে ঠিক হতো, চার্লস বলে।

—না, পোয়ারো মাথা নাড়ে।

—কেন ?

—তাহলে ওরা সজাগ হয়ে যেত। আমরা দ্বিতীয় বার ওখানে যেতে পারতাম না।

—তা অবশ্য ঠিক।

—আর আমার মনে হয়, ওখানে সত্যি কোন 'বিপদ ঘটতে যাচ্ছে।

—বিপদ ? ওখানে ?

—হঁ্যা।

—তুমি কোন বিপদের ইঙ্গিত করছো বলতো ?

—মৃত্যুর।

—মৃত্যু ? চার্লস চমকে ওঠে।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কার ?

—তা সঠিক ভাবে বলতে পারছি না। দু'জনের মধ্যে একজন কেউ—মেরী নয় শার্লট।

—নিজের মেয়ের কথা নয় ছেড়ে দিলাম। বন্ধুর মেয়েও তো নিজের মেয়ের মতন। আর সেখানে বলছো কি না...

—হ্যাঁ বন্ধু, সেটাই রহস্য। বড় বিচিত্র এই জগৎ

—কিন্তু......

—ডিনসমেড কেন ঐ মেয়েকে পাবার জন্য এত লালায়িত হয়ে উঠেছিল ? শুধু কি বন্ধুর মেয়েকে কাছে পাবার জন্য, যাতে সে ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারে !

—হয়তো তাই।

—কিন্তু বন্ধু, আমার মত কিন্তু অন্য কথা বলছে।

—কিন্তু কু ভাবছো তো ?

—হ্যাঁ, স্বভাবদোষ যাবে কোথায়!

—তা ভাবছোটা কি ?

—এর পিছনে হয়তো ডিনসমেডের বিরাট কিছু স্বার্থ রয়েছে।

—স্বার্থ? ডিনসমেডের?

—হ্যাঁ এবং যেটা সেই একমাত্র জানে। আর পরে জেনেছে—সম্ভবত মিসেস ডিনসমেড অর্থাৎ সুশান।

—সেটা কি?

—লোভ।

—কিসের?

—সম্ভবত অর্থ, যেটা প্রায় সময়ই অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন না পারে গিলতে, না পারে ওগরাতে। ফলে নিজের বেছানো জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে। এবং সেটাই ক্লু খেলে যায়।

—হ্যাঁ, তোমার কথাব মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। সত্যিই তো নইলে মেয়ে পাবার জন্য এত কাঠ খড় পোড়াতে যাবে কেন!

—যাক্ শোন, তুমি প্রথমে ডিনসমেডের ওখানে যাবে। গিয়ে দেখবে, মেরী ও শার্লট কেমন আছে। যদি দেখো সব ঠিক আছে, তাহলে অবশ্য করার কিছুই নেই।

—আচ্ছা।

—না, তবু একজন ডাক্তার দেখিয়ে ওদের চেক-আপ করাবে!

—চেক-আপ করাবো? চার্লস বিস্মিত, হঠাৎ একথা কেন বলছো? তোমার মনে হয় কে অসুস্থ হতে পারে?

—এদের দুজনের মধ্যে একজন এবং তার সত্যি বিপদ।

—কে?

—ডিনসমেড হয়তো নিজের মেয়েকে রবার্টের মেয়ে বলে সাজাতে চাইবে। ফলে অন্য জনের ভাগ্য বিপদ ঘটবে।

—রবার্টের মেয়ে? চার্লস আরো উৎকণ্ঠিত।

—হ্যাঁ।

—তাতে ডিনসমেডের লাভ?

—লাভ হ্যাঁ, তা আছে বইকি!

—সেটাই তো শুনতে চাই

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মধ্যে হয়তো টাকা-পয়সার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আর যেই রবার্টের মেয়ে হোক, সে টাকাটা হাতে পেয়ে হয়তো বেঁকে বসবে। এতগুলো টাকার মোহ সে নিশ্চয়ই ছাড়তে রাজি হবে না। সে দিক দিয়ে নিজের মেয়ে হলে কিছুটা স্বস্তি। পরের মেয়ে হয়তো দিতে চাইবে না। আর দিলেও হয়তো সামান্য কিছু হাতে ঠেকাবে।

—তাহলে তুমি এর পিছনে অর্থের ব্যাপার আছে বলে বলছো?

—আগেই বলেছি আমার অনুমান মাত্র। হয়তো আমার ধারণাটা মিথ্যে নয়, নইলে ডিনসমেড মেয়েকে পাবার জন্য কাণ্ড-কারখানা করতে যাবে কিসের জন্যে!

—হয়তো তাই, চার্লস ভাবে, হলেও হতে পারে।

—তোমার মনে আছে, ডিনসমেড কয়েক মাস অন্তর অন্তর মেরীকে নিয়ে কোথায় যেন যেত।

—হ্যাঁ।

—সেই ব্যাপারে মেরীকে প্রশ্ন করা হলে সে বলেছিল, রাস্তাটা সে গুলিয়ে ফেলেছে। প্রথমবার বাবা একই রাস্তায় দু' তিন বার গাড়ি ঘুরিয়েছে। তারপর বৃদ্ধ মতন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে তাকে পাশের ঘরে যেতে বলেছে। আবার ফেরার পথে ঘুর বাড়ি ফিরেছে।

একটু থেমে পোয়ারো আবার বলে, যাতে মেরী রাস্তাটা চিনতে না পারে।

—হ্যাঁ, তা তুমি সেদিন বলেছিলে বটে।

—এখন শুধু প্রশ্ন, ডিনসমেড এ রকম কেন করতে গেছিল?

—ঠিক কথা।

—আর সেই বিশেষ বৃদ্ধ লোকটিই বা কে, যার জন্য ডিনসমেডের এ লুকোচুরি খেলা। এবং চার্লস, তোমার মনে আছে, মেরী বলে-

ছিল, ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক হয়তো কোন একজন ল' ইয়ার হবে। কারণ ওখানে অনেক মোটা মোটা বই দেখেছে।

—সলিসিটারও হতে পারে।

—আমার মনও সেই একই কথা বলছে। রবার্ট হয়তো তার কাছে টাকা গচ্ছিত রেখেছে, যেটা হয়তো একমাত্র ডিনসমেড জানতো। সে হয়তো কথা প্রসঙ্গে ডিনসমেডকে বলে থাকবে।

—যা দেখছি তোমার ধারণা ঠিক না হয়ে কিছুতেই যায় না।

—তোমার সঙ্গে আরো অনেক কথা আছে। যেমন রবার্টের অ্যাকসিডেন্ট। আর শোন, ওখানে গিয়ে টম নামের একটা ছেলে কাজ করছে দেখতে পাবে। তাকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবে। তবে এখন নয়। এখন থেকে ঘণ্টা চায়েক পরে। আমি এর মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবো।

—ঠিক আছে।

ঘণ্টা তিনেক পরে পোয়ারো বাড়ি ফিরে ডিনসমেডের স্থানীয় থানায় ডায়াল করে। সঙ্গে সঙ্গে সে লাইন পায় না। বার তিনেক ডায়াল করার পর যে লাইন পায়।

—হ্যালো।

—গ্রীন উড থানা?

—হ্যাঁ।

—মিঃ ডিনসমেডকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে

অপর প্রান্ত সে কথার জবাব না দিয়ে উল্টে পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কে কথা বলছেন?

—আরকুল পোয়ারো।

—গুড মর্নিং স্যার। আর মিঃ ডিনসমেডকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

—ঠিক আছে। তাদের বাড়ির সবাই ভালো আছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—আর দু' মেয়ে ?

—হ্যাঁ, তারাও তো বেশ সুস্থ আছে বলে দেখলাম। তবু পোয়ারো জিজ্ঞেস করে, আপনি নিজে ওখানে গেয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ স্যার।। তবে······।

—তবে কি ?

—ওদের বাড়িতে একটা ছেলে কাজ করতে সে মিসিং।

—মিসিং ? পোয়ারো বুঝলো ও ছেলে টম। তবু সে ইচ্ছে করে একটা অবাক হবার ভান প্রকাশ করলো।

—হ্যাঁ স্যার।

—কখন থেকে ?

—নাকি সকাল থেকে।

—খোঁজ করেছেন ?

—হ্যাঁ স্যার, আমরা ভীষণ ভাবে খুঁজে যাচ্ছি।

—খবর পেলেই আমায় সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন।

—নিশ্চয়ই, আর স্যার, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম

—বলুন।

—মিঃ ডিনসমেডকে অ্যারেস্ট করার পিছনে কি চার্জ রয়েছে। যদি একটু দয়া করে বলেন।

—এখন একটু বলতে অসুবিধে আছে, তবে আপনাকে এটুকু বলতে পারি, লোকটি মোটেই সুবিধের নয়।

—অথচ স্যার, দেখলে বোঝাই যায় না।

—আপনি তাকে চেনেন নাকি ?

—আমার কাছে মাঝে মধ্যে আসতেন।

—একা ?

—না স্যার, বলেই অফিসার বাকি কথাটা শেষ করতে পারে না।

—তখন তার সঙ্গে আর কে থাকতো ?

—তার ছোট মেয়ে মিস শার্লট।

—মেরী নয়তো?

—না স্যার। অবশ্য তাকেও আমি চিনি।

—আপনার কাছে মিস শার্লটকে নিয়ে আসতে কেন?

—সম্ভবত আমার সঙ্গে যাতে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

—শার্লটও কি এগিয়ে এসেছিল?

—না স্যার।

কেন?

—শার্লট বড় সাই। সব সময় যেন গুটি সুটি মেরে রয়েছে।

—আচ্ছা, প্রতিবারই কি শার্লটই আসতো অফিসার। এটা ঠিক মনে করে বলবে তো।

—হ্যাঁ স্যার।

—আপনি কি শার্লটকে ভালোবাসেন?

—হুঁ।

—আর শার্লট?

—ওর মনের কথা এখনো জানাতে পারিনি।

—হাব ভাবে?

—আমাকে যে ও অপছন্দ করে তা কোনদিনই বলেনি।

—শার্লটের আর কোন প্রেমিক আছে?

—তা আমার জানা নেই।

—আছে কি না একটু খোজ নেবেন তো?

—স্যার, এ কথা বলছেন কেন?

—একটু প্রয়োজন আছে।

—দয়া করে আমায় একটু হিন্স দিন। নইলে আমার মনে সন্দেহ কাঁটা ছড়িয়ে থাকবে এবং আমি ভেবে ক্ষত বিক্ষত হবো।

—না, কথাটা এমনিই বললাম, পোয়ারো এড়িয়ে যেতে চায় এবং সে ভাবে। হয়তো শার্লটই র‍্যাটের মেয়ে। বিয়ে হয়ে

গেলে প্ল্যাটা ঢুকে যেত। তারপর পুলিশের চাকরি। আজ এখানে কাল সেখানে। একটা তোফা চাল ডিনসমেড চেলেছিল। আর শার্লটকে কেন্দ্র করে অফিসারকে হাতও করেছিল। এবং তেমন কিছু বিপদে পড়লে ঐ অফিসারই তাকে গার্ড দিতো। নিখুঁত প্ল্যান সে চেয়েছিল। তবুও শেষ রক্ষা করতে পরালো না। ঘরের কাছে এসে যেন আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো। পাপ কাউকে ছাড়ে না। সাময়িক ভাবে তা চাপা থাকলেও একদিন তা বেরিয়েই পড়বে। শাস্ত্রেই বলে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

—আর স্যার,…।

—অ্যাঁ। পোয়ারো সম্বিৎ ফিরে পায়।

—আমাকে মিঃ ডিনসমেড মাঝে মধ্যে নেমন্তন্নও করতেন।

—আচ্ছা।

— তখন একটা জিনিষ লক্ষ্য করতাম।

—সে ব্যাপারটা মিস শার্লট কি? পোয়ারোর কৌতূহল বাড়ে।

—তখন মিস শার্লট ছাড়া বড় একটা কেউ আমার কাছে আসতো না। যদিও ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লাগতো, তবু মিস শার্লটের উষ্ণ সান্নিধ্য কম আকর্ষণীয় ছিল না।

পোয়ারো ভাবে, এইভাবে অফিসারের সঙ্গে শার্লটকে জড়িয়ে দিতে ডিনসমেড চাইছিল। এতটা এগিয়েও শেষ পর্যন্ত তাকে হার স্বীকার করতে হলো, যাকে বলে একবারে শেষ সময়ে। এর মধ্যে হয়তো টাকার ব্যাপার রয়েছে। আর রবার্টের মেয়ে যে হোক, সে আঠারোতে পা দিতে চলেছে। এবং তখনই কি না……। ডিনস-মেডের পোয়ারোর কৃত্তিম দুঃখ হয়। ইস! তার বাড়া ভাতে এভাবে ছাই পড়লো! আর যত গণ্ডোগোল বাধালো চার্লস। সে ঝড় জলের রাতে গ্রীনউড থেকে মেরী শার্লট সংবাদ পরিবেশন করে তার মনে রহস্যের জাল বুনে দিলো। শুধু তাই নয়, অনুসন্ধানের ব্যাপারে

তাকে বার বার অনুরোধ করলো, রহস্য সন্ধানে, যার মূলে রয়েছে এস. ও. এস.।

ত্রিশ

পোয়ারো রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায়, টম একরকম ধেয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে। সে দারুণ ভাবে হাঁপাতে থাকে, তার বুক হাঁপড়ের মত ওঠা নামা করছে। এবং তার মুখে একটা আতঙ্কের চিহ্ন।

পোয়ারো তাড়াতাড়ি চেয়ার চেড়ে উঠে টমের কাছে এসে দাঁড়ায় এবং সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, সে নিশ্চয়ই তার জন্য কোন খবর নিয়ে এসেছে, যে সংবাদটা তার কাছে খুবই জরুরী বিবেচিত হতে পারে। আর সেই জন্যই বোধ হয় ওর ওখান থেকে উঠাও হওয়া।

—টম। তুমি একটু বিশ্রাম করো, পোয়ারো টমকে হাত ধরে একটা গদী আঁটা চেয়ারে বসায়। আর আমি তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি। বলে সে কিচেনে গিয়ে ফ্রিজ খুলে গোটা কয়েক শূয়রের সাণ্ডউইচ আর দুধে কিছুটা ব্রাণ্ডি মিশিয়ে ওর জন্যে নিয়ে আসে। নাও, নাও বলেই পোয়ারো ভাবে, কেন এভাবে টম ওখান থেকে পালিয়ে এলো? আর চলে আসা মানে তার ওখানকার চাকরির পাট চুকলো। এবং এসে যখন তার জন্য বিশেষ ধরণের কিছু খবর নিয়েছে। আর সেই খবরটা কি?

টম কি যেন বলতে যাচ্ছিল। তাকে পোয়ারো বাধা দেয় ঠিকই তবু সে ভেতরের কৌতুহলটা কোন রকমে দমন করে বলে, টম আগে তুমি খেয়ে নাও। তারপর তোমার সব কথার শুনছি এরপর টমের খাওয়া শেষ হতে পোয়ারো বলে, বলো তুমি আমায় কি বলার জন্য ছুটি এসেছো।

—স্যার, আপনাকে এর আগে একদিন ওখান থেকে ফোন করে বলেছিলাম, মিস শার্লটের জুতোয় একটা বড় পেরেক উঠেছে ?

হ্যাঁ, পোয়ারো মাথা নাড়ে। এবং সেটা পরে গিয়ে তুমি সারিয়ে নিয়ে এসেছিলে।

—এরপর দেখা গেল, মিস শার্লটের জুতোয় আরো কয়েকটা পেরেক বেরিয়ে পড়েছে। তাতে তার বড় লাগেছে, তখন সে আমায় ডেকে বললো, টম, আবার পেরেক বেরিয়েছে এবং এবার অনেক-গুলো। তারপর সে একটু রাগত ভাবে বলে, আগের বার কি সারালে বলতো !

পোয়ারোর উত্তর উত্তর কৌতূহল বাড়ছে, তারপর ?

—তখন আমি বলি, মিস শার্লট, আমি তো মুচিকে ভালো করে সারাতে বলেছিলাম। বলে আমি মাথা চুলকাই, যেন অপরাধটা আমিই করে বসে আছি।

দুধের গ্লাসটা আরো একটু দূরে সরিয়ে টম রেখে ফের বলে। আমার কথার উত্তর শুনে মিস শার্লট বললো, এবার খুব ভালো করে করতে বলবে।

টম মাথা নাড়ে, আচ্ছা।

—তোমায় যেতে হবে না। হঠাৎ কোত্থেকে ডিনসমেড এসে কথাটা বলে, যত সব অকাজের মোষাই।

—মিস শার্লট যে পরতে পারছে না, টম আমতা আমতা করে জবাব দেয়। তার বড় কষ্ট হচ্ছে।

—আমি শহর থেকে ভালো করে সারিয়ে নিয়ে আসবো, ডিনসমেড বলে। আগের বারই তো দেখলি এখানকার মুচিরা ভালো করে সারতে পারে না। শুধু ফাঁকি দিয়ে পয়সা নেবার মতলব।

—সেটাই ভালো হবে বাবা, শার্লট বলে।

—আর টম, তুই জুতোটা প্যাক করে গাড়িতে তুলে দে, ডিনসমেড বলে। এখুনি। নইলে পরে আবার ভুলে যাবি।

—এখুনি যাচ্ছি স্যার।

তারপর সন্ধ্যের মুখে ডিনসমেড জুতো এনে শার্লটকে দেয়, এই নাও, তোমার জুতো ভালো করে সারিয়ে এনেছি।

শার্লট খুশী, বলে, বাবা, চমৎকার সারানো হয়েছে। বলতেই বলে শহর। শহরের সঙ্গে কি গ্রামের তুলনা করা চলে।

টম জুতোর দিকে তাকায়। সত্যি, দারুণ সেরেছে। কোথাও এতটুকু পেরেক উঠে নেই। সে হাত দিয়ে দেখেও একটা ওঠা পেরেক বার করতে পারলো না।

তারপরই এক ঘটনা ঘটলো, যার জন্য টম আদৌ প্রস্তুত ছিল না, ফলে সে রীতিমতন হকচকিয়ে যায়।

শার্লট আর মেরী একই ঘরে শোয়। তার পাশে একটা ছোট ঘর। সেই ঘরে টম থাকে।

হঠাৎ একদিন টম লক্ষ্য করলো, একটা ছায়া মূর্তি ওদের ঘরের কাছে যে জুতো র‍্যাক, তার কাছে এগিয়ে যায়। এবং জুতোর সামনে হাত দিয়ে কি যেন করে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি ভাবে চুপিসারে ফিরে যায়।

টম বাথরুমে যাবে বলে দরজা খুলেছিল, কিন্তু ঐ ছায়া মূর্তি আসতে দেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সামান্য একটু ফাঁক থেকে তার কীর্তিকলাপ দেখতে চায়।

আর টম ভাবে, ও ছায়া মূর্তি কে হতে পারে? এবং কেনই বা ওখানে এসেছিল? কোন মতলবে?

টম যেন নিজের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তার বুকের মাঝে যেন ট্রেন ছুটে চলেছে।

তারপর ছায়া মূর্তি চলে গেলেও টম কিছুক্ষণ ঠায় ভেজানো দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। দরজা খুলতে তার সাহসে কুলোয় না। ভাবে, যদি ছায়া মূর্তি আবার এসে পড়ে, তাকে দেখে ফেলে। তাহলে সে যেমন সজাগ হয়ে যাবে, তেমনি তার বিষ নজরে সে পড়ে যাবে।

এরপর আরো কিছু সময় পার হতে টম ভেজানো দরজা অতি সাবধাতে খুলে, বেড়ালের চলার নিঃশব্দতা নিয়ে সে আস্তে আস্তে জুতোর র‍্যাকের কাছে এসে দাঁড়ায় এবং বার বার পিছন ফিরে তাকায়, ঐ ছায়া মূর্তি তাকে লক্ষ্য করছে কি না, বা অন্য কেউ।

না, আর ছায়া মূর্তির আর হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে টম দারুণ নিশ্চিন্ত বোধ করে এবং তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কার করতে পারলো না।

তবে টম বুঝতে পারছে, ঐ চাদরে জড়ানো ছায়ামূর্তি ডিনসমেড না হয়েই যায় না। কারণ ছায়ামূর্তির যা উচ্চতা তা বাড়িতে একমাত্র তারই রয়েছে। এবং হাঁটা চলার ভঙ্গিও তার মতন।

কিন্তু টম কিছুতে বুঝে উঠতে পারছে না ওখানে ডিনসমেড এসেছিল কিসের জন্য? আর চাদরেই সারা শরীর ওভাবে জড়িয়ে নিয়ে ছিল কোন কারণে? শুধু কি শীতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য? তবে এ কথা ঠিক, ক'দিন ধরে শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে।

তারপর টম খানিকটা নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে আসে। ভাবে, ওখানে নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটবে। নইলে এত রাতে ওখানে ডিনসমেড কেন গেছিল? আর পোয়ারো হয়তো এ সব কারণেই তাকে এখানে রেখেছে। এবং উদ্দেশ্য ছাড়া সে কোন কাজ করে না।

বিছানায় গা ছেড়ে দিড়ে টম ভাবে, কাল আবার দেখতে হবে কিছু ঘটে কি না। তার পর মুহূর্তে ভাবে, আজ রাতেও তো কিছু ঘটতে পারে। ফলে সে সজাগ হয়ে রইলো এবং তার দৃষ্টি সামান্য ফাঁক করা দরজার দিকে।

না, তেমন কিছু ঘটলো না। তারপর টম কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপরের রাতেও টম ওৎ পেতে রইলো, কিন্তু তার জেগে থাকাই বৃথা হলো। তেমন কোন ঘটনা ঘটলো না। শুধু তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলো। আবার সে শুয়ে পড়ে।

শুয়ে শুয়ে টম ভাবে, তাহলে ডিনসমেড কাল কোন কারণে ওখানে এমনিই গেছিল। এর মধ্যে হয়তো কোন উদ্দেশ বা মতলব ছিল না। নিছক কোন কারণ হয়তো।

এর মাঝে কয়েক দিন পার হয়ে গেল। কোন ঘটনা ঘটলো না, কিন্তু সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো দিন দশেক পরে। তাও টমের নজরে পড়তো না। সে জানালা দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেট ফেলতে গেছিল এবং পিছন ফিরে তাকাতে দশ্যটা তার চোখের সামনে সিনেমার ফ্রিজ কাঠের মত যেন আটকে রইলো।

এবার সেই একই দৃশ্য নয়। দৃশ্য পটের এবার কিন্তু পরিবর্তন ঘটেছে। ডিনসমেড পকেট থেকে কিছু বার করে জুতোর র‍্যাকের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে যায়।

তারপর সেদিন যা করেছিল আজও টম তাই করলো। সে শুধু ছায়ামূর্তির চলে যাওয়ায় অপেক্ষায় ছিল। এরপর চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে ওখানে যায়।

টমের যেন বিশ্বাস গাঢ় ভাবে পড়ছে। আসলে সে ভীষণ ভাবে উত্তেজিত হয়ে পরেছে।

টম জুতোর র‍্যাকের কাছে এসে পেনসিল টর্চ মারে। এটা সে গতরাতে সরিয়ে রেখেছিল। ওটা সম্ভবত জর্জের। জর্জের হলে ভয়ের কিছু নেই। না গেলেও বড়জোর তাকে এক আধ বার জিজ্ঞেস করবে। বাড়ি মাথায় তুলবে না। এ স্বভাব মেরীর। কিছু না পেলে আর কথা নেই। তবে শার্লট এতটা নয়।

পেনসিল টর্চের ফলার মত আলো তীক্ষ্ণ ভাবে গিয়ে জুতোর র‍্যাকে পড়লো এবং এই আলোটা যাতে বাইরের দিকে ততটা ছড়িয়ে না পড়তে পারে তার জন্য টম সাবধানতা অবলম্বন করলো। সে আলোর দিক থেকে নিজেকে কাছে নিয়ে গেল। ফলে আলোটা আর ততটা ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

না। তেমন কিছুই টমের চোখে পড়ালা না সে, খানিকটা

হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল, আর তখনই তার নজরে ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়। সে ঝুঁকে সে দিকে তাকায়।

টম দেখতে পায়, শার্লটের জুতোর পেরেকের কয়েক জায়গায় একটু জলের মত দাগ তা দেখে সে ভাবে, হয়তো এটা কোন গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার নয়। হয়তো শিশির গড়িয়ে জুতোয় উপর পড়েছে আর ঠিক তার উপরে ছাদে জ্যাম্পের মত দাগ। বর্ষাকালে নাকি ওখান থেকে চুইয়ে চুইয়ে জল গড়ায়।

ফলে টম আর ততটা গা দেয় না। বিছানায় ফিরে আসে। এবং ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকে।

কিন্তু হঠাৎ টমের মনে হয় ডিনসমেড কেন ওখানে মাঝ রাতে সবার অলক্ষ্যে যায়, কই, দিনের বেলা সে তো ওখানে যায় না। রাতটা কেন সে বেছে নিয়েছে? দিনের বেলা ব্যস্ত থাকে বলে তাই?

কিন্তু টম আবার উল্টো দিক দিয়ে ভাবে, যে মানুষ সারা দিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে তার তো রাতে মরার মত ঘুমিয়ে থাকার কথা! আর সেই মানুষ কি না…।

টম সারারাত বিছানায় ছটফট করতে থাকে, আর সে ভাবে পোয়ারোর কথা। কিছু ঘটবে। কিন্তু কি ঘটতে পারে বা চলেছে?

অন্য দিন টম ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পরে, আর্জ তা পারলো না। একটা চাপা উত্তেজনায় সে শুধু বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে থাকে। এবং রহস্যের জল যে রেশমী সুতোর রূপধরে তাকে আষ্টে পৃষ্টে বাঁধতে চেষ্টা করছে।

তারপর টম ভাবে, কাল এমন ঘটনা ঘটলে সে ডিনসমেডকে জড়িয়ে ধরে 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করে উঠবে, তাতে তার কপালে যা থাকে থাকবে। আর এখানকার চাকরি তো তার বরাবরের জন্য নয়। পোয়ারোর কার্য সিদ্ধি হলে তাকে এখান থেকে পত্রপাঠ বিদায় নিতে হবে।

টম ভাবে, আর সে যখন রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে তখন তো সে আর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। থাকলে তার তো এখানে থাকাই বৃথা। আর এ সব কথা পোয়ারো জানতে পারলে…।

তারপর মুহূর্তে টম ভাবে, না। না। কালই তাকে যা হোক একটা কিছু করে ফেলতে হবে—নয় এসপার নয় ওসপার।

আবার আর একটা চিন্তা টমকে পেয়ে বসে। ভাবে, না ডিনসমেডকে হাতে নাতে ধরা ঠিক বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে না। তাহলে সে সজাগ হয়ে উঠবে এবং যে ঘটনাটা সে ঘটাতে চেষ্টা করছে তা থেকে সে বিরত থাকবে। আর শুধু তাই নয় সাবধানও হয়ে পড়বে। ফলে ঘটনাটা আর ঘটবে না।

টম মনে মনে আর একটা কথাও ভেবে নিল, এ কথা সে এ বাড়ির কাউকে বলবে না, এমন কি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, জর্জ—শার্লটকে ও নয়। আসলে তার কথায় কেউ সন্দেহ প্রকাশ করুক তা সে চায় না।

জর্জ হয়তো কাউকে কিছু বলেবে না। সে টমকে ভালোবাসে, তার শার্লট ও ভালো, কিন্তু সে মেয়ে কথাটা হয়তো সরল মনেই তার পাঁচকাণ করে বসবে, আর মেয়েদের পেটে কি কথা পচে। আর একটা ব্যাপার টম লক্ষ্য করেছে, র‍্যাকে মেরী, শার্লট এবং জর্জের জুতো রয়েছে, আর র‍্যাকটা বেশ বড়। ফলে জুতোও বেশ সরিয়ে সরিয়ে রাখা আছে শার্লটের জুতো থাকে এক কোণে সে ছায়ামূর্তিকে রোজ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। কখনো মাঝে বা এ পাশে এসে দাঁড়ায়নি। কিন্তু কেন? এটা নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাপার, আর এসব কথা ভাবছে সে পোয়ারোর জন্য। পোয়ারোর মনে এমন একটা ধারণা ছিলই বলে সে এখানে তাকে এনে রেখেছে।

যাক্ তার পরের দিন টম ঘুম থেকে উঠে ঘরের কাজকর্ম সেরে নেয় এবং ডিনসমেড কাজে বেরিয়ে যেতে একটা প্লাস্টিকের কভারে

এবং খবরের কাগজ যোগাড় করে টেবিলের উপর রেখে দেয়, যাতে কেউ তাকে কোন রকম সন্দেহ করতে না পারে, লুকিয়ে রাখলে তাকে হয়তো জেরার মুখে রাখতে হতে পারে।

তার পরেই রাতেও একই ঘটনা ঘটলো এবং ছায়ামূর্তি চলে যেতে টম বিছানা ছেড়ে উঠে দেখলো, শার্লটের জুতোর পেরেকে জায়গায় জলের মত দাগ।

সঙ্গে সঙ্গে টম জুতোর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দাগের দিকে তাকায়। সেখানে সে জলের চিহ্ন মাত্র দেখতে পাচ্ছে না। এবং সেই বৃষ্টির পর আর বৃষ্টিও হয়নি, তাহলে? টর্চের আলো টম দেয়াল থেকে সরিয়ে এনে শার্লটের জুতোর পাটিটা নাকের কাছে তুলে ধরে। কেমন যেন একটা গন্ধ পায়। উত্তেজনার বশে ঠিক আবার বুঝতেও পারে না। তার উপর সে আবার অশিক্ষিত। বুঝবেই বা কি করে। তারপর টম দ্রুত ঘরে গিয়ে পাস্টিকের কভার আর খবরের কাগজ শার্লটের এক পাটা জুতো পেঁচিয়ে ঘরে ফিরে আসে এবং একটু আলো ফুটবার প্রতীক্ষায় সে অপেক্ষা করতে থাকে এরপর চারদিকে একটু আলের রেশ ছড়িয়ে পড়তে না পড়তে জুতো নিয়ে পাঁচিল টপকে পোয়ারোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

টম তার কাহিনী শেষ করে বলে, স্যার এই সেই জুতো।

পোয়ারো ইচ্ছে করেই তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। তবে টমের কথা থেকে তার যা বুঝবার তা বোঝা হয়ে গেছে। তারপর নিরুত্তাপকণ্ঠে টমের দিকে তাকিয়ে পোয়ারো বলে, কই দেখি? কথার মধ্যে তেমন একটা ব্যস্ত ভাব নেই।

—এই যে স্যার, বলে টম জুতোয় হাত দিতে যাচ্ছিল।

পোয়ারো বাধা দিয়ে মুখ কুঁচকে বলে, থাক্, থাক্, আর খুলতে হবে না। ওটা বরং দরজার কাছে দাও।

কথাটা বলেই পোয়ারো বুঝতে পারে, সে ব্যাপারে তেমন কোন

আগ্রহ প্রকাশ না করায় টম কিছুটা মুষড়ে পড়েছে। তাই সে টমের পিটে হাত বুলিয়ে বলে, তুমি তোমার কাজ বেশ ভালো ভাবেই করেছো। সবাস টম।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। সঙ্গে সঙ্গে টমের মুখখানা হাসিতে ঝলমল করে ওঠে। তারপর সে বলে, স্যার, আমি যে আবার আজ থেকে বেকার হয়ে গেলাম।

—তার একটা ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।

—কি ব্যবস্থা স্যার ?

—তোমার ঐ কলেজেই আবার চাকরি হবে। গিয়ে পিটারের সঙ্গে দেখা করো। তাকে আমার সব বলা আছে।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ।

—যাও, এবার গিয়ে একটু কোণের ঘরটায় ঘুমাও।

—আচ্ছা স্যার।

—আর শোন, রাস্তায় বেরুবে না।

—কেন স্যার ?

—তাহলে অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারো।

—অ্যারেস্ট ? টম বেশ ভয় পেয়ে যায়।

—হ্যাঁ। কারণ পুলিশ তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—তাহলে স্যার, আমার কি হবে।

—ধরা পড়লে তখন দেখা যাবে।

—আচ্ছা স্যার, টম ভয়ে ভয়ে বলে।

টম শুতে যেতে পোয়ারো জুতোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং সোজা হাজির ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে। এখানকার মিঃ সাটক্লিফ তার বিশেষ পরিচিত। এবং সে তাকে নানা ব্যাপারে সাহায্য করে।

সাটক্লিফ তার ল্যাবোরেটরিতে ছিল। পোয়ারো সেখানে হাজির হয়।

সার্ট্‌ক্লিফ কি একটা টেস্টে যেন ব্যস্ত ছিল, পোয়ারো প্রবেশ করতে সে তার দিকে তাকায়, আরে মিঃ পোয়ারো যে।

—আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম। পোয়ারো বলে।

—বিরক্ত কিছু না। তার আগে বসুন। তা আপনার হাতে ওটা কি? সার্ট্‌ক্লিফ প্যাকেটটার দিকে তাকায়।

—জুতো।

—জুতো? সার্ট্‌ক্লিফ অবাক না হয়ে পারে না।

—হ্যাঁ।

—তাহলে এবার জুতোর রহস্য সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন? বলে সার্ট্‌ক্লিফ হাসতে থাকে।

—কিছুটা।

—তা এটাকে কি করতে হবে?

—এর পেরেকের জায়গা গুলো টেস্ট করতে হবে, দেখতে হবে ওখানে কি রয়েছে।

—ঠিক আছে, আপনি একটু বসবেন না তাড়া আছে?

—তা একটু বসতে পারি।

—ততক্ষণে একটু কফি খান, আর আমি জুতোটাকে নিয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ি, কি বলেন?

—উত্তম প্রস্তাব, পোয়ারো হাসে, আর সে জানে, সার্ট্‌ক্লিফ খুব দক্ষ। সে একাজ পনেরো মিনিটও সময় নেবে না।

পোয়ারোর ধারণাটাই ঠিক হলো। মিনিট দশেকের মধ্যে সার্ট্‌ক্লিফ একটা রিপোর্ট এনে পোয়ারোর হাতে দেয়। তাতে আরসেনিকের সন্ধান পাওয়া যায়।

—ইতিমধ্যে পোয়ারোর কফি পান শেষ হয়ে গেছে। সে সার্টক্লিফকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসে।

পোয়ারো গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ভাবে, তার ধারণাটাই ঠিক হলো জুতোটা পাবার পরই সে বুঝতে পেরেছিল, ওতে আরসনিক রয়েছে

এবং তা দিয়ে শার্লটকে স্লো পয়জন হচ্ছিল। তাই তাকে নিজ দেখাচ্ছে, যা সেদিন সেখানে টম তাকে জানিয়েছিল। অবশ্য তখন সে এটা ভাবতে পারেনি।

আর এখন পোয়ারো নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, শার্লটই রবার্টের মেয়ে এতে আর কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। একবারে সুনিশ্চিন্ত যে, শার্লটই ডিনসমেডের পালিত কন্যা।

এবার পরচুলার রহস্যটা পোয়ারোর কাছে জল হয়ে আসে। কারণ শার্লটের চুল সোনালী, যা ডিনসমেড পরিবারে কারুর নেই। পাছে এ নিয়ে কারুর মনে সন্দেহ জাগে তাই ও ব্যবস্থা। তাহলে হয়তো আসল ব্যাপারটা তখন বেরিয়ে পড়তো। আর ডিনসমেড হয়তো শার্লটকে বুঝিয়েছে, তোমার সোনালী চুল দেখে বন্ধুরা পিছনে লাগতে পারে তার চেয়ে একটা পরচুলা ব্যাবহার করো। ব্যাস এনিয়ে আর কোথা উঠবে না। তখন শার্লট তা মেনে নিয়েছে এবং সরল মনে ভেবেছে, হয়তো তার ভালোর জন্য বলেছে, এর পিছনে কেনে রহস্যের কথা আদৌ মনে হয়নি।

হঠাৎ পোয়ারোর একটা কথা মনে হয়, ডিনসমেড এতদিন কেন শার্লকে বাঁচিয়ে রাখতে গেল? বার্টের কাছ থেকে এনে তো মেরে ফেললেই পারতো। ল্যাটা চুকে যেত।

তারপর পোয়ারো ভাবে, অবশ্য তাতে একটা অসুবিধে ছিলো, যদি কোনক্রমে ফাঁস হয়ে পড়ে রবার্টের মেয়ে জীবিত নয়, তাহলে টাকাটা তার হাতে আসবে না। এখন কোন বিষয় সম্পত্তি টাকা পয়সার কথা তার মনে হচ্ছে। আর শার্লট জীবিত রেখে মেরীকে দিয়ে কাজটা হাসিল করার চেষ্টায় ছিল। অন্যদিকে একটু একটু করে শার্লটকে সরিয়ে দিচ্ছিল।

সুশান কি এ কথা জানতো? রবার্টের মেয়ে যে শার্লট তা তার নিশ্চয়ই অজানা নয়, তবে ডিনসমেডের হত্যা করার প্লান সম্ভবত সে জানে না।

সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারোর আর একটা কথা মনে হয়, রবার্টের মৃত্যুটা রহস্যপূর্ণ তার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। এর পিছনে হয়তো ডিনসমেডের কালো হাত রয়েছে। এবং সম্ভবত সেই রবার্টের টাকার কথা জানতো।

হঠাৎ পোয়রো ভাবে, একবার স্থানীয় থানায় যাওয়া দরকার। অর্থাৎ ডিনসমেডের অফিস সংলগ্ন এলাকা, হয়তো ওখানে এর কিছু হদিস মিললেও মিলতে পারে যা বাড়িতে সে রাখতে সাহস পায় নি। কারণ সেখানে অনেক লোকের বাস। তাছাড়া, সেদিন চার্লস যাওয়ায় যদি বাড়িতে কিছু থেকেও থাকে তাও এনে ডিনসমেড সম্ভবত অফিসে রেখেছে, কারণ ব্যবসা ভালো চলে না। সেখানে লোকের আনাগোনা খুবই কম। আর একটা কথা, যদি রবার্টের ব্যাপারে ডিনসমেড জড়িত থাকে তবে সেদিন সে নর্থ রোড স্টেশনে গেছিল এবং সে একজন ব্যবসায়ী, তার হিসেব সে কি কাগজে কলমে রাখবে? হয়তো না। আর রাখলেও অন্যভাবে রাখবে। অথবা কোন সংকেতিক উপায়ে, যা একমাত্র সেই বুঝতে পারে।

আর সেদিন যদি রবার্ট সত্যি ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়, সেদিন সকালের দিকে আবহাওয়া ভালোই ছিল। তারপর দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ তেড়ে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। এ সব খবরা-খবর পোয়ারো আবহাওয়া অফিস থেকে জেনে এসেছে। এবং সেদিন একটু থেমে থেমেই বৃষ্টি হচ্ছিল।

তাই এমন দিনে, বিশেষ করে লোক্যাল ট্রেনে লোক একটু কম থাওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া, সেদিন ট্রেনে করে রবার্ট যে দিকে যাচ্ছিল সে দিকটা অফিস পাড়া নয়। স্বাভাবত ফাঁকা থাকার কথা। এটা পোয়ারোর অনুমান মাত্র ছিল। পরে তার কথার যৌক্তিকতা আছে কি না সে সম্বন্ধে সে নিজে গেছিল। গিয়ে নর্থ রোড স্টেশনে স্টেশনে মাস্টারের সঙ্গে কথা বলেছে,। এবং সেও তাকে একই কথা জানিয়েছে। আর বৃষ্টি বাদলার দিনে গাড়িতে প্রায় লোক থাকে না

বলেই চলে।

আর পোয়ারোর দৃঢ় বিশ্বাস, রবার্টের বাইরে যাবার কথা ডিনসমেড জানতো। হয়তো সেই ডিনসমেডকে বলেছিলো। অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে কথাটা সে সাদা মনেই বলে থাকবে। অথবা এমনও হতে পারে ডিনসমেড জোন্সের কাছে থেকে জেনেছে।

তবে এটা ডিনসমেডের কাজ কি না পোয়ারো তাতে নিঃসন্দেহ হতে চায় সুতরাং সবার আগে ডিনসমেডের অফিস ঘরটা সার্চ করা দরকার। হয়তো সেখানেই রহস্যের চাবি কাঠি লুকিয়ে আছে।

একত্রিশ

ডিনসমেডের দোকান যেখানে পোয়ারো সেখানকার স্থানীয় থানায় এসে গাড়িটা পার্ক করে। তারপর সে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কামরায় গিয়ে হাজির হয়।

এখানকার অফিসার পোয়ারোর আদৌ পরিচিত নও। তা হলেও বয়স্ক অফিসার পোয়ারোকে বেশ ভালো করেই চেনে। কারণ এ কাজে যেমন তার অভিজ্ঞতা আছে। আছে তেমনি ব্যাপক পরিচিতির গণ্ডী। তাই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমে বলে, মিঃ পোয়ারো। আমার এখানে?

পোয়ারো বয়স্ক অফিসারের দিকে তাকায়। এবার তাকে পোয়ারোর চেনা চেনা লাগছে। তারপর সে বলে, আমায় একটু সাহায্য করতে হবে।

নিশ্চয়ই, আর আপনার দিকে আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বসে আছি, অফিসার হেসে বলে।

—হিল ভিউ রোড তো আপনার এরিয়ার মধ্যে, তাই না।

—হ্যাঁ।

—ওখানের একটা দোকান সার্চ করতে হবে।

—আচ্ছা, দোকানটা কি এখন খোলা পাবো?

—এখন একটা বাজে। এ সময় তো বন্ধ থাকার কথা নয়।

—তা অবশ্য ঠিক। তাহলে দয়া করে আপনি একটু অপেক্ষা করুণ। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

। ঠিক আছে।

তারপর মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা বেরিয়ে পড়লো। থানা থেকে ডিনসমেডের দোকান গাড়িতে মিনিট পাঁচেক লাগালো। তাও ট্রাফিক জ্যাম ছিল বলে, নইলে তাও লাগতো না।

ওরা দোকানের সামনে দেখে, দোকানের একটা পাল্লা ভেজানো এবং টুলে হেলান দিয়ে দারোয়ান বেচারা ঝিমচ্ছে।

—এই। অফিসার পুলিশী মেজাজে রুল দিয়ে দারোয়ানকে একটা গোত্তা মারে।

—স্যার! বলে দারোয়ান ঘুম চোখে লাফ দিয়ে ওঠে। সে প্রথমটা ভেবেছিল, ডিনসমেড এসেছে। তার বদলে পুলিশ দেখে তার ভিমরি খাবার যোগাড়। এবং কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, স্যার। আমি চুরি করিনি।

—মানছি তুমি চুরি করোনি, অফিসার বলে। আমরা এ দোকান সার্চ করতে এসেছি।

—ও, দারোয়ানের ধরে যেন প্রাণ ফিরে আসে। কিন্তু স্যার সার্চ করবেন কেন!

—দরকার আছে।

—কিন্তু···, দারোয়ান ইতস্তত করতে থাকে।

—কিন্তু কি? পুলিশ মিক।

—স্যার তো এখনো আসেনি।

—অন্য দিন কখন আসে?

—বেশ তাড়াতাড়িই আসে।

—তবু ক'টায়?

—এই ধরুণ, দশটার মধ্যে।

—যাক্ ঠিক মত মাসের মাইনে পত্তর পাও?

—না স্যার।

—কত মাসেন মাইনে বাকি?

—ছ' মাসের।

—তাও এখানে পড়ে আছে কেন?

—স্যার, চাকরির বাজার যে বড় মন্দা।

—হিসেবের খাতা গুলো কোথায়?

—স্যার, আমি মিথ্যে বলছি না। সত্যি আমি ছ' মাসের মাইনে পাইনি। হিসেবেও তাই লেখা থাকবে।

—না, না, আমি সে জন্য বলছি না। অন্য কারণে দরকার। তা হিসেবের খাতা কোথায় থাকে?

—ঐ আলমারিতে।

—চাবি দাও।

—চাবি তো আমার কাছে থাকে না।

—তবে কার কাছে আছে?

—স্যারের কাছে।

—সত্যি বলছো?

—হ্যাঁ স্যার!

—তাহলে? অফিসার পিছন ফিরে পোয়ারোর দিকে তাকায়।

—এটা একটা চিন্তার কথা বই কি! তারপর পোয়ারো দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলে। এখানের চাবির দোকানটা কোথায়?

—কয়েকটা দোকানের পরই।

—চাবিওয়ালাকে আমাদের কথা বলে ডেকে নিয়ে এসো, বলে

পোয়ারো দারোয়ানের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অফিসারের দিকে তাকায়। ওর সঙ্গে একজন পুলিশ দিন।

—নিশ্চয়ই, অফিসার সায় জানায়।

একটু পরে চাবিওয়ালা মাস্টার কি নিয়ে এলো এবং বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই আলমারিটা খুলে দেয়। আর তার মজুরী নিয়ে বিদায় হয়।

এবার আলমারির কাছে পোয়ারো এগিয়ে যায়। ওখানে বেশ কিছু ফাইল এবং কয়েকটা খাতা পত্তর রয়েছে। তবে আলমারির চারদিকে অপরিষ্কার আর অব্যবহারের চিহ্ন। এবং ব্যবসার অবস্থা যে সঙ্গীন সে কথা যেন বার বার জানিয়ে দিচ্ছে।

—এর মধ্যে কোথায় খুঁজবেন? অফিসার মুখ কুঁচকে বলে। এতো দেখছি, খড়ের গাদার মধ্যে আলপিন খোঁজার মত ব্যাপার।

—তা ঠিকই, তবু একবার চেষ্টা করতে হবে।

পোয়ারো তারপর দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলে, গত বছরে তোমার মাইনে বাকি আছে?

—না স্যার।

—মাইনে নেবার সময় কি করো?

—মাইনের পাশে খাতায় স্ট্যাম্প দিয়ে সই করে মাইনে নিই।

—তাহলে সে খাতা তো নিশ্চয়ই চেনো?

—হ্যাঁ স্যার। রোজই তো বলতে গেলে দেখছি!

—বার করতো।

—স্যার, এখুনি বার করে দিচ্ছি।

—এই কারণেই আপনার সঙ্গে অনেকের তফাৎ। অফিসার পোয়ারোর বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকতে পারে না।

—দাঁড়ান মশাই, আগে ও বার তো করুক। পোয়ারো জানায়।

তারপর পোয়ারো ভাবে, রবার্ট মারা গেছে দশই মার্চ। সেদিন

ছিল সোমবার। তাহলে মার্চ মাসের হিসেবটা দেখা দরকার।

এরপর দারোয়ান এদিক ওদিক খুঁজে একটা বার করে। তারপর সে আবার নিজেই বলে স্যার, এটা নয়। এ খাতাটা বছর তিনেক আগেকার পুরানো খাতা।

—এই রকমই একটা পুরনো খাতা তোমায় বার করতে হবে। পোয়ারো বলে। এবং সেটা এক আধ বছরের নয়।

—স্যার, কত বছরের?

—বছর পনেরো ষোল আগেকার।

—ওরে বাবাঃ।

—তবে তোমায় বেশী খুঁজতে হবে না।

—কেন স্যার? দারোয়ান ভয় ভয় বলে।

—আমার মনে হয়, একটা হিসেবের খাতায় বছর তিন চারেকের হিসেব পত্তর রয়েছে।

—হ্যাঁ স্যার, তা ঠিকই বলেছেন।

—তাহলে সেইভাবে খুঁজে যাও।

—ইয়েস স্যার, দারোয়ান পোয়ারোকে খুশী করার জন্য যেন কতকটা মরিয়া হয়ে খুঁজে চলে।

তারপর বেশ খানিকটা খোঁজা খুঁজির পর দারোয়ান ময়লা ও ঝুলে ভর্তি একটা খাতা নিচ থেকে টেনে বার করে, স্যার, এটা হতে পারে বলে সে ডস্টার দিয়ে মুছে পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দেয়।

—থ্যাঙ্ক ইউ। পোয়ারো একটা টেবিলে বসে। আর এ দোকানে আসবাব বলতে দুটো চেয়ার এবং ঐ টেবিল।

পোয়ারো খাতা উল্টায়, এটা একটা আয় ব্যায়ের হিসেবের খাতা এবং সে যে খাতাটা চাইছিল এটা হলো গিয়ে সেই খাতা। ফলে সে বেশ আগ্রহের সঙ্গে খাতার পাতা উল্টাতে থাকে।

পোয়ারো জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী করে মার্চ মাসে এসে সে থমকে যায়। এই মাসটাই তার একান্ত প্রয়োজন এবং এ মাসের দশ

তারিখে কি লেখা আছে সেটাই তার জানা দরকার।

পোয়ারো এখন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং সে পাতা উল্টে দশ তারিখের কাছে এসে থেমে যায়। সেখানে ব্যায়ের জায়গায় মাত্র একটাই হিসের লেখা রয়েছে। তা দেখে প্রথমটা সে নিরাশ হয়ে পড়েছিল।

তারপর পোয়ারো একটু ঝুঁকে তাকিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করতে সে দেখতে পায়, সেই একমাত্র খচরের জায়গায় লেখা রয়েছে —টি. এক্সপেন্স-বাইশ টাকা দশ পয়সা।

পোয়ারো ভাবে, এটা ট্যাক্সি ভাড়াও বোঝাতে পারে, আবার রেলের ভাড়াও। অথবা অন্য কিছুর জন্য।

তবে পোয়ারোর তীক্ষ্ণ নজরের কাছে আর একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠলো, যেটা তার কাছে একটা বিরাট ক্লু হয়ে দাঁড়ালো।

'টি. এক্সপেন্স' লেখাটা সঙ্গে সঙ্গে হয়নি। হয়েছে বেশ কয়েক দিন পরে, কারণ দশ তারিখে যে কালি ব্যবহার করা হয়েছে সেই কালির দাগ এগারো, বারো, তের, চোদ্দ ইত্যাদিতে নেই। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কয়েকদিন পরেই লেখা হয়েছে।

পোয়ারো মন সন্দেহে ভরে ওঠে। সে ভেবেছিল, এই রকম কিছু একটা পাবে। এবার তাকে বাইশ টাকা দশ পয়সার রহস্য ভেদ করতে হবে। অবশ্য এটা যে তার একবারে অজানা তা নয়।'

খাতার দিক থেকে পোয়ারো দৃষ্টি ফিরিয়ে অফিসারের দিকে তাকায়, এই খাতাটা সিজ করুণ।

—কিছু পেয়েছেন বুঝি? বলেই অফিসার ভাবে, আর কিছু জিজ্ঞেস করা বাতুলতা। সে ঠিক মুখ খুলতে চাইবে না। তার চেয়ে এর বেশী আর কিছু জিজ্ঞেস না করাই শ্রেয়।

—হ্যাঁ, আর একটা 'সিজার্স লিষ্ট' তৈরী করে দারোয়ান এবং স্থানীয় কয়েকজন রেসপেক্টটেবেল লোক দিয়ে সই করিয়ে দিন। তারপরই পোয়ারো বলে, অবশ্য আপনার ডিউটি আপনি বেশ ভালো

করে জানেন। তার উপর আপনি একজন অভিজ্ঞ অফিসার।

—থ্যাঙ্ক ইউ। আর দোকাটাও সীল করছি।

—হ্যাঁ, এবং আপনাকে আর একটা অনুরোধ করবো।

—অনুরোধ কেন বলছেন। বরং সঙ্গে কাজ করতে পেরে নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি।

—এই খাতার আটই মার্চ থেকে নয় দশ এগারো বারো করে যে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত হিসেব লেখা রয়েছে, তার একটা ফটোষ্টাড কপি তুলে আমায় দেবেন।

—কালই আমি নিজে গিয়ে আপনার বাড়িতে দিয়ে আসবো, অফিসার এ কাজের ভার পেয়ে যেন বর্তে গেছে।

—তবে তো খুবই ভালো হয়, আর আপনাকে সঙ্গে পেয়ে আমি খুবই খুশী।

—এ কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না।

—ঠিক আছে, তাহলে ঐ কথাই রইলো। চলি।

আচ্ছা।

পোয়ারো এসে গাড়িতে বসেও গাড়ি ষ্টার্ট দেয় না। সে পকেট থেকে ছোট ডায়েরীটা বার করে একটা বিশেষ জায়গা হাতড়ে চলতে থাকে।

তারপর পোয়ারো নির্দিষ্ট জায়গাটা পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটো এক অনাবিল আনন্দে চিক চিক করতে থাকে।

পোয়ারো ভাবে, ডিনসমেডই যে রবার্টের খুনী তার প্রমাণ হয়ে গেল। তার একমাত্র প্রমাণ অথবা ক্লু যাই বলা যায় তা হলো ঐ টি. এক্সপেন্স—বাইশ টাকা দশ পয়সা।

পোয়ারোর স্থির বিশ্বাস, রবার্ট হিল রোড স্টেশন থেকে উঠেছে, আর নেমেছে নর্থ রোডে, অবশ্য যদি নামতে সেদিন পেরেছিল। কারণ এর মধ্যে নাকি একটা অ্যাকসিডেন্টের প্রশ্ন জড়িত ছিল।

হয়তো ডিনসমেড তার পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছে, কিংবা নিজেই এ কাজটা ঘটিয়েছে। যাক্, সেটা পরের কথা।

পোয়ারো ভাবে, হিল রোড থেকে নর্থ রোড় স্টেশনের দূরত্ব খুব একটা বেশী নয়। মাত্র এগারো মাইল পথ। আর তার প্রথম শ্রেণীর যাতায়াত ভাড়া হলো গিয়ে ঐ বাইশ টাকা দশ পয়সা। এটা সেদিন স্টেশন মাষ্টারের কাছ থেকে জেনে ডায়রী টুকে রেখে ছিলাম।

সুতরাং এতে আর কোন সন্দেহ রইলো না এবং পোয়ারোর দৃঢ় বিশ্বাস, এতে বড় রকমের টাকার ব্যাপার জড়িয়ে আছে, নইলে ডিন-সমেড কখনো এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারতো না, পোয়ারো ডিমসমেডের ব্যাপারে স্থানীয় থানায় অনেক খোঁজ-খবর নিয়েছে। কোন আজে বাজে ব্যাপারে সে জড়িত নয়। আর সেই মানুষ কি না মরিয়া হয়ে সেদিন কাণ্ডটা করে বসতে পারলো। তাহলে স্বভাবত প্রশ্ন আসছে, কেন করেছে? এর পিছনে তার কি উদ্দেশ্য রয়েছে? আর এই রবার্ট কি না তার প্রাণের বন্ধু ছিল।

তারপর পোয়ারো ভাবে আর রবার্টের সেই টাকা কোন উকিল অথবা সলিসিটারের গচ্ছিত রয়েছে। যার দরুণ সে মেরীকে নিয়ে তার কাছে মাঝে মধ্যে যেত। অর্থাৎ যাতে একটা যোগাযোগ থাকে আর কি। এবং মেরীকে সে ব্যাপারটা যেমন জানতে দিতে চায়নি, তেমনি আবার তাকে একা সঙ্গে করে নিয়ে বেরুতো অর্থাৎ প্রথম থেকে অতি সাবধানের সঙ্গে সে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেছে।

পোয়ারো মিষ্টি মিষ্টি হাসে, কিন্তু ভবিতব্য? চার্লসই বা কেন সেই দুর্যোগের রাতে ডিনসমেডের বাড়িতে হাজির হবে কেন? একেই বলে শাস্ত্রের বিধান। কেউ ভাঙতে পারে না।

বত্রিশ

পোয়ারো জানে, বেনিকে পাবে না পেলে ভালো হতো অবশ্য ওকে না পেলেও কোন ক্ষতি নেই।

পোয়ারো এখন খবরের কাগজের অফিসে উপস্থিত, দুপুরের দিক, এখন বেশ একটা জম-জমাট ভাব।

পোয়ারো ভাবে রোজিকে পেলে ভালো হয়। এ মেয়েটিও বেশ কাজের। আর খবরের কাগজে অফিসে কাজের লোক না হলেও কিছুতেই চলে না। এখানে ঢিমে তালের কোন ব্যাপার নেই, সবকিছু দুরন্ত গতিতে করে যেতে হবে।

আরে! এ যে মেঘ না চাইতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। পোয়ারো মনে মনে বলে ওঠে। ঐ তো রোজি বসে আছে।

পোয়ারো রোজির দিকে তাকায়, বয়স তেইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে হবে। মুখে উগ্র প্রসাধন। পরনে হাল্কা গোলাপী রঙের একটা মিনি স্কার্ট, যা তাকে আরো যৌবনবতী করে তুলেছে। তার উপর একটা ফুল স্লীভের সাদা সোয়েটার। তার উপরের বোতামটাই শুধু আটকানো। বাকি গুলো খোলা, যা লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

—আরে রোজী যে। পোয়ারো রোজীকে খুশী করার জন্য একটু চিৎকার করে ওঠে।

—আপনাকে কিন্তু আমি মোটেই আশা করিনি, রোজী হেসে সামনের চেয়ারটায় পোয়ারোকে বসতে বলে।

—কেন?

—আপনি এলে তো আর আমার কাছে আসবেন না।

—কথাটা কিন্তু ঠিক নয়, পোয়ারো রোজীর সামনের গদী আঁটা চেয়ারে বসতে বসতে বলে। আসলে আমি যখন আসি তখন তোমাকে পাই না।

—পান না? পেলে কি করতেন? রোজী খিল খিল করে হেসে ওঠে।

—কি করতাম? পোয়ারো মিটি মিটি হাসে। তোমায় কিন্তু আজ দারুণ লাগছে। ডেটিং আছে নাকি?

—উহুঁ, রোজী ঠোঁট ওল্টায়।

—বিশ্বাস হয় না। যাক্ আমার একটা সামান্য কাজ করে দেবে।

—নিশ্চয়ই নইলে আমারি কোন গোপন কেচ্ছা হয়তো কোন কাগজে বেরিয়ে পড়বে।

—না, না, আমি এতটা খারাপ লোক নই, অন্তত তোমাদের ক্ষেত্রে তো নয়ই, আমি অনেক লিবারাল।

—তা নয় বুঝলাম, কিন্তু কাজটা কি।

—শোনো, এমাসের আট তারিখ থেকে এগারো তারিখ পর্যন্ত বাইরে নিলাম। এর মাঝে কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে।

—আট থেকে এগারো? এক মিনিট। রোজী ইনডেক্স কার্ডের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর ফিরে এসে জানায়। জন মুখ মারা গেছেন

—যাক্ ভালোই হয়েছে, আশী বছর বয়সে ভুগে ভুগে দারুণ কষ্ট পাচ্ছিলেন, আর?

—কতগুলো হিপ্পি শেষ রাতে বারে ঢুকে ক্যাবারে ড্যান্সারকে ছিনতাই করতে গিয়ে স্পটেই দু'জন পুলিশের গুলি খেয়ে মারা গেছে।

—আপদ বিদায় হয়ে ভালোই হয়েছে।

—ফুটবল সম্রাট পেলে বলেছেন, দেশের খেলাধুলোর মান বজায় রাখতে হলে আগে ছোটদের নজর দিতে হবে।

—তাঁর প্রতি আমার অগাদ শ্রদ্ধা রইলো, আর কিছু?

—আর পথ দুর্ঘটনা, ছিনতাই ইত্যাদি।

—থ্যাঙ্ক ইউ!

—এবার বিদায় তো?

—বলো তো, সন্ধ্যের পর আসতে পারি।

—ইউ আর এ লায়ার! রোজীর মুখটা সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। এর আগে দু'বার কথা দিয়েও আসেননি।

—আই অ্যাম সো সরি! আর সে কথা তোমার মনে আছে!

—মনে আবার থাকবে না! তখন আপনার জন্য অনেকগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করতে হয়েছিল।

—রিয়েলি আই অ্যাম সরি, তারপর পোয়ারো হাওয়া বেগতিক দেখে এখান থেকে মানে মানে কেটে পড়ে।

তেত্রিশ

গ্রীনউড থানা, এখন সময় দুটো। খানিকক্ষণ আগে ডিনসমেড কে গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

—ডিনসমেড কিছুতেই তার দোষ স্বীকার করছে না। বার বার বলছে, আমি কিছু জানিনা এবং এ ভাবে আমায় হেনস্থ করার জন্য আমি মান হানির মামলা করবো। চাইবো মোটা রকমের টাকা।

ডিনসমেড একটু থেমে আবার বলেছে আমার ল' ইয়ার বন্ধু আছে। আমাকে ছেড়ে দেওয়া না হলে তাকে ফোন করে সব জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।

তারপর থানার ভারপ্রাপ্ত তরুণ অফিসার টমসনের দিকে তাকিয়ে ডিনসমেড আরো বলেছে তুমি অন্তত ওসব আজে বাজে কথায় কান দিও না। এটুকু তোমার কাছে আমার অনুরোধ?

—স্যার, আমি নিরুপায়, অসহায় টমসন হাত কঁচলাতে থাকে। যেখান থেকে হুকুম এসেছে তা শুনতে আমি বাধ্য। অন্যথায়

আমার চাকরি পর্যন্ত চলে যেতে পারে।

—সে কি! ডিনসমেড বেশ ভয় পেয়ে যায়।

—আপনি বিখ্যাত গোয়েন্দা আরকুল পোয়ারোর নাম শুনেছেন তো?

—শুনেছি বই কি! আর আমার মেয়েরা তো তার প্রশংসায় সব সময় পঞ্চমুখ হয়ে রয়েছে।

—সেই আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বলেছে।

—কিন্তু কেন? আমি তো সেটাই কিছুতে বুঝতে পারছি না।

—তবু মিঃ ডিনসমেড, আপনাকে বলছি, আপনি আপনার সমস্ত অপরাধ অকপটে স্বীকার করুণ। নইলে……।

—নইলে কি? অসহায় ডিনসমেড ভয়ার্ত দৃষ্টিতে টমসনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

— আমি বাধ্য হয়ে অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।

—ব্যবস্থা নেবে? ডিনসমেড আরো কাহিল।

—হ্যাঁ।

—কি ব্যবস্থা নেবে? ডিনসমেড ফ্যাকাসে মুখে জানতে চায়।

—সেটা আপনার এবং আমারও পক্ষে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার। নেহাত আপনি মিস শার্লটের বাবা বলেই এ কথা বলছি।

—টমসন! তুমি আমার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলছো? তোমাকে আমি নিজের ছেলের মত ভেবে কি না শার্লটের সঙ্গে অবাধে মেশার সুযোগ করে দিয়েছি। আর শেষে তুমি কি না……

—মিঃ ডিনসমেড, তবু আমি নিরুপায়। দয়া করে এসব কথা বলে বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। আমার হাতে দারুণ সময় কম। অনেক জরুরী ফাইল হাতে পড়ে রয়েছে।

—আমি কিছু জানি না, ডিনসমেডের সাফ জবাব।

—জানাবে না? টমসন তো মহা ফ্যাসাদে পড়ে।

—না।

তারপর আর একবার ডিনসমেডকে অনুরোধ করা হলো। তবু সে মুখ খুললো না। এরপর কেস সাজিয়ে তার পরের দিন তাকে আদালতে পাঠানো হলো।

দু'দিন পরের ঘটনা। কনফেশন রুমে গিয়ে ডিনসমেডের উপর অত্যাচার শুরু হলো। প্রথমে খুবই কম। তবু সে দাঁতে দাঁত চেপে কোন রকমে পড়ে রইলো। তারপর চললো আর একটু বেশী। তখন সে 'বলছি। বলছি।' বলেও আর বললো না।

পোয়ারো পাশের ঘরে রয়েছে। ওখানে চার্লসও হাজির। পোয়ারো টমসনকে বলে দিয়েছে, মুখ খুললেই আমায় ডাকবেন।

এক সময় চার্লস বলে, এখন আমার ডিনসমেডের কাছে যেতেই লজ্জা করছে।

—হ্যাঁ, তা তোমার একটু হবার কথা, পোয়ারো বলে, সেদিন ও তোমায় আশ্রয় না দিলে বাঁচতে না। তার উপর আবার সেদিন উপরি পাওনা হিসেবে ছিল মেরীর উষ্ণ সান্নিধ্য।

—সত্যি, সব মিলিয়ে তুমি মার্ডার করলে!

—আমি না তুমি?

—আমি আবার কিসে!

—ভেবেই দেখো না।

—আসলে ঐ এস. ও. এস. কথাটাই আমার মনে সন্দেহের ছায়া ঢুকিয়েছে। তাই তোমাকেও বলতে বাধ্য হয়েছি।

—আর শার্লটের পরচুলা?

—তাও ঠিক, কিন্তু তুমি যে কেঁচো খুড়তে সাপ বার করবে তা কে ভাবতে পেরেছিল, অন্তত আমি তো পারিনি।

—আমার যে বদ মদ স্বভাব।

—এই জন্য কেউ বেচিলারদের দেখতে পারে না।

পোয়ারো এর একটা মোক্ষম জবাব দিতে যাচ্ছিল। তা আর দেওয়া হলো না।—হঠাৎ টমসন হাজির হয়ে পোয়ারোর দিকে

তাকিয়ে বলে, স্যার, মুখ খুলেছে।

—আমি আসছি, পোয়ারো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—আমি সঙ্গে আসতে পারি! চার্লস পোয়ারোর কাছে অনুমতি চায়। অবশ্য যদি·····।

—হ্যাঁ, আসাত পারো।

—থ্যাঙ্ক ইউ!

ওদিকে ডিনসমেড কতক্ষণ মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে! সে তো আর চোর চোট্টা বদমাইস নয়। আর কতক্ষণই বা সে অত্যাচার সহ্য করে থাকতে পারে! তার মুখ দিয়ে গাজ্জা বেরুচ্ছে। যন্ত্রনায় বার বার মুখ কুঁচকে উঠছে।

—আপনারা? ডিনসমেড পোয়ারো আর চার্লসকে দেখে কঁকিয়ে ওঠে। এখান থেকে দয়া করে চলে যান।

—উনি হল্লেন গিয়ে আরকুল পোয়ারো, টমসন জানায়। এবং সঙ্গে বন্ধু মিঃ চার্লস।

—মাপ করবেন মিঃ ডিনসকেড, পোয়ারো বলে।

—এবার বলুন কি জানেন? টমসন ডিনসমেডের দিকে তাকায়। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট করে দিয়েছেন।

—আ—আমি কিন্তু জানি না। ডিনসমেড শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর সে দারুণ ভাবে হাঁপাতে থাকে।

—মিঃ ডিনসমেড! অবুজের মত কথা বলবেন না। এবং আবার বলছি, আমার নির্দয়ের মত ব্যবহার করতে বাধ্য করাবেন না।

তারপর আর এক দয়বা অত্যাচারের করে ডিনসমেড মুখ খুলতে বাধ্য হলে। এরপর সে বলে চলে।

স্ত্রী মারা যাবার পর রবার্ট দারুণ ভাবে ভেঙে পড়ে। তখন মেয়ের নিরাপত্তার কথা সে দারুণভাবে ভাবতে থাকে। এবং তাকে

বেশ চিন্তিত দেখাতে থাকে।

আর রবার্টের মনের মধ্যে একটা ধারণা জন্মেছে যে, সে আর বেশী দিন বাঁচবে না। তার অবর্তমানে মেয়ের কি হবে!

একটা দিশেহারা ভাব তার শরীর এবং মনকে তোলপাড় করে চলতে থাকে। এজন্য সে ক্ষত বিক্ষতও।

ডিনসমেড রবার্টকে সান্ত্বনা দেয়। বলে, এসব চিন্তা মন থেকে চিরতরের জন্য বিদায় করতে।

—না ডিনসমেড, আমি কিন্তু ভালো বুঝছি না।

—কেন? তোমার কি হয়েছে?

—কে জানে! বরার্টের মধ্যে একটা হতাশার ভাব।

—তোমার এটা মরে যাবার বয়স মোটেই নয়।

—লিজার মরে যাবার কি বয়স হয়েছিল।

—তা অবশ্য ঠিক। তবে কি জানো, ভাগ্যের হাতে আমরা সবাই বাঁধা। আর জানবে, তুমি একাবত্তি। তোমার সঙ্গে আমিও আছি।

—তা আমি জানি।

—তাহলে এত মুষড়ে পড়ছো কেন?

—যত ভাবি এসব ভাবনা ভাববোনা, না তবু চিন্তা গুলো যেন কিলবিল করে আমার সামনে নেচে বেড়াতে থাকে, আর নিঃসঙ্গ নির্জন রাতে ওগুলো যেন আমার বুকে জমাট পাথরের মত চেপে বসে থাকে কিছুতেই যেন ঠেলে সরাতে পারি না। আমায় কান্না পেয়ে যায়। তখন শুধু ভাবি, হে ঈশ্বর, তাড়াতাড়ি ভোর করে দাও। নইলে আমি মরে যাবো।

রবার্ট একটু থেমে আবার বলে, বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে না পারলে তার যে কি জ্বালা তা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

—রবার্ট, আমার একটা কথা রাখবে?

—কি কথা?

—আগে বলো রাখবে ?

—রাখার হলে নিশ্চয়ই রাখবো।

—তুমি মিস জুলিয়েটকে বিয়ে করো। দেখতে শুনতে সে সব দিক দিয়ে তোমার উপযুক্ত হবে।

—বিয়ে ? বিয়ে আর নয়।

—কেন ?

—আমি লিজার জায়গায় অন্য কাউকে বসাতে পারবো না।

—জানি তুমি তাকে ভালোবাসো, কিন্তু যে নেই··· !

—না, ও আছে।

—রবার্ট পাগলের মত কথা বলো না। তুমি জুলিয়েটকে বিয়ে করো দেখবে তখন আর এসব চিন্তা তোমার মনে আসবে না। এবং নতুন জীবন দেখতে কত মধুর লাগে।

—না, না, তা আজ আর সম্ভব নয়।

—না কেন ? তাছাড়া, তোমার মেয়ের কথাও তো ভাবতে হবে। জোন্স কি কখনো তাকে মানুষ করতে পারে।

—সে ভার তো মিস জুলিয়েটের হাতে দিয়েছি।

—তা হয় না, এদিকে ডিনসমেড রবার্টের কাছে কিন্তু সাহায্যের জন্য এসেছিল। কিন্তু এ অবস্থায় কথাটা সে কিছুতেই তাকে বলতে পারছে না। অথচ আবার না বললেও নয়। সে টাকা নিয়ে যেতে না পারলে এ বেলা তার হাঁড়ি চড়বে না। সংসারের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। নিজের কথা নয় ছেড়ে দিলেন, কিন্তু এতগুলো মুখকে সে কি করে অনাহারে রাখবে। তার উপর মেরী আর জর্জ শিশু।

ডিনসমেড বাজারে ধার পাচ্ছে না। ফলে কোন কাজে হাত দিতে পারছে না, এতে ভালো ভালো কনট্রাক্ট হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আর পরিবারের গহনাও নেই, যা বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা পয়সা যোগাড় করতে পারে।

—আমি একটু বেরুবো, হঠাৎ রবার্ট বলে ওঠে।

—অ্যাঁ! ডিনসমেডের চিন্তায় ছেদ পড়ে।

—বলছি, আমায় একটু বেরুতে।

—বেরুবে! তা কোথায়?

—একটু দরকার, রবার্ট চেপে যেতে চায়।

—তা যাবে কার কাছে? চেপে যাওয়ায় ব্যাপারটা ডিনসমেডের কাছে বড় বিসদৃশ্য ঠেলে। তাকে আগে তো এমন কখনো করতেন না।

—বলতাম তো একটু প্রয়োজন আছে, রবার্ট ডিনসমেডের কাছে কথাটা আদৌ ভাঙতে চায় না।

—ও, ডিনসমেড একটু দুঃখ পেলো। ভাবে, যে কি এমন কথা থাকতে পারে যে রবার্ট তাকে কথাটা বললো না।

—ঠিক আছে, তুমিও আমার সঙ্গে চলো, রবার্ট একটু ভেবে ডিনসমেডের দিকে তাকায়। তা তোমার এখন সময় হবে তো?

—এখন তো আমার হাতে অফুরন্ত সময়, ডিনসমেড তার সংসারের কথা তোলে। ব্যবসা বাড়ির অবস্থা খুবই···।

—ডিনসমেডকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রবার্ট ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং একটু পরে একটা অ্যাটাচি নিয়ে ফিরে আসে।

ডিনসমেড অ্যাটাচির দিকে তাকিয়ে বলে এখন আবার অ্যাটাচি নিয়ে আবার কোথায় বেরুবে।

—লিজার দাদার কাছে।

—তার কাছে গিয়ে আবার কি করবে?

—দরকার আছে রবার্ট বেশ চিন্তিত ভাবে কথাটা বলে।

—তা ওকে আছে কি?

—কিছু শেয়ারের কাগজ পত্তর আছে।

—শেয়ার? ডিনসমেডের কথাটা ঠিক বিশ্বাস হয় না। কারণ রবার্ট আগে বলতো শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বণ্ড ইত্যাদির ব্যাপারে নেই। যে কোন সময়ে দাম পড়ে যেতে পারে। আর নেই মানুষ

কি না শেয়ারের কথা বলছে। সুতরাং কথাটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়, অন্তত তার কাছে।

—হ্যাঁ, রবার্ট মাথা নাড়ে। চলো, বেরিয়ে পড়ি।

—হুঁ।

তারপর ওরা গাড়িতে গিয়ে বসে এবং রবার্ট গাড়ি চালিয়ে বার্জের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বার্জের বাড়িতে ওরা মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে গেল। বেশ কাছেই বলা চলে।

বার্জ বাড়িতে আছে, তা আগে রবার্ট ফোন করে জেনে নিয়েছে বার্জের বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। এক কালে সলিসিটর ছিল। ছেড়ে দিলেও আইনের বই পত্তর নিয়ে এখনো নাড়া চাড়া করে।

বার্জের এক তলা বাড়ি। তেমন সাজানো গোছানো নয়। চারদিকে একটা অগোছালো ভাব। ব্যাচিলার মানুষ তো!

বাড়িতে প্রবেশ করে রবার্ট ডিনসমেডকে বলে, তুমি বৈঠক খানা ঘরে একটু বসো। আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলেই চলে আসছি।

—ও, ডিনসমেড আবার মনে ব্যথা পায়। বুঝতে পারছে না। রবার্ট তার কাছে ব্যাপারটা গোপন করতে চাইছে কেন! এর পিছনে কি কারণ থাকতে পারে? অথচ অন্য সময়ে তো কখনো এমন ব্যবহার করে না। উল্টে নিজে যেচে সব কথা বলে, বিশেষ করে তার কাছে না বলতে পারলে যেন তার পেটের ভাত হজম হয় না। আর আজ সেই মানুষ কি না…।

ডিনসমেড আর কথা না বাড়িয়ে বলে, ঠিক আছে।

বৈঠকখানা ঘরের লাগোয়া ঘরেই বার্জের স্টাডি রুম। রবার্ট অ্যাটাচি হাতে সেদিকে এগিয়ে যায়।

—এসো রবার্ট, বার্জ রবার্টকে আহ্বান জানায়। আমি তোমার জন্যেই ততক্ষণ অপেক্ষা করছি।

—ধন্যবাদ! আর আপনার কাছে একটু বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।

—আগে বোস দেখি।

—হ্যাঁ, বসছি। এই অ্যাটাচিটা আপনার কাছে রাখতে হবে।

—সে নয় রাখলাম, কিন্তু এতে আছে কি?

—আমার জীবনে সর্বস্ব।

—তবু কি আছে শুনি?

—ক্যাস টাকা লাখ তিনেক। আর পরিবারের গহনা পত্তর, হ্যাঁ তাও প্রায় লাখ দুয়েক হবে।

—কিন্তু এসব তুমি আমার কাছে রাখতে চাইছো কেন?

—কারণ আমি জানি না। তবু এটা আপনার কাছে দয়া করে রাখুন। মেরী বড় হলে ওকে দিবেন। আর এর মধ্যে একটা উইল রয়েছে, তাতে লেখা আছে ও সাবালিকা হলে এর উত্তরাধিকারী হবে।

—আমাকে আবার কেন এ সবের মধ্যে জড়াতে চাইছো! তুমি তো জান আমার নিজের বলতে গেলে কিছুই নেই।

—তাই তো আপনার কাছে রাখতে চাই। আপনি নির্লোভ। চার্চে সব কিছু দান করে দীন দারিদ্র্যের মত জীবন যাপন করছেন। একটু থেমে রবার্ট আবার বলে, আমার শরীরের অবস্থা ভালো নয়। যে কোন মুহূর্তে……।

না, না, ওকথা বলো না। আর লিজাও যে এভাবে চলে যাবে তা আগে……।

—আমি উঠি।

—যাবে? আচ্ছা।

—আর আপনার কাছে রাখার অর্থ হলো, এ বিষয়ে কেউ কিন্তু জানতে পারবে না। জানলে টাকার লোভে……।

—তা অবশ্য ঠিক।

—চলি।

—এসো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুণ।

—ডিনসমেড প্রথম থেকেই এ রকম একটা কিছু সন্দেহ করছিল, ওরা কথা শুরু করতেই সে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে, এবার সে বুঝতে পারছে রবার্টের এত গোপনীয়তা রক্ষা করার কারণ যাতে সে টাকার কথাটা আদৌ জানতে না পারে, আর শুধু ভাবতে থাকে, রবার্ট তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলো কি করে।

ডিনসমেড বাড়ি ফিরে আর কিছুতেই দু' চোখের পাতা এক করতে পারছে না। বিছানায় শুধু শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে থাকে এবং অ্যাটাচিটা যেন তার চোখের সামনে নেচে বেড়াতে থাকে।

না, অ্যাটোচিটা তার চাই, ডিনসমেড যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই অ্যাটাচির সাহায্যে সে তার ব্যবসা সংসার সব বাঁচতে পারবে। তাই ডিনসমেড সকালে উঠে সুশানকে বলে, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

সুশান তখন কিচেনে। বললো, একটু পরে যাচ্ছি।

—না, এখনি শুনে যাও।

তারপর সুশান এলে ডিনসমেড চাপা গলায় বলে, আজ থেকে মেয়েকে সোফিয়া বলে ডাকবে না।

—কেন? সুশান তো অবাক।

—ওটা বড্ড বড় নাম।

—ও নাম তো তুমিই দিয়েছিলে।

—তখন এতটা বুঝতে পারিনি।

—তা হঠাৎ আজ একথা বলছো কেন?

—হঠাৎ মনে হলো তাই, আর ও নামটাও বড্ড বড়।

—তা মেয়েকে কি নামে ডাকতে চাও?

—'মেরী' বলে।

ওটা বড্ড কমন নাম। সুশান মুখ কুঁচকে বলে।

—তা হোক। ছোট্ট দু' অক্ষরের নাম, ভালোই হবে।

—তা ও নাম নয় রাখা গেল, কিন্তু এ কথা বলার জন্য সাত

তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে এলো কেন।

—তাড়াতাড়ি আর কি। ডিনসমেড একটু ইতস্তত করে বলে। ভাবে, পাছে জেরায় আসল কথাটা না আবার বেরিয়ে পড়ে, তাই সে বলে, এবং জর্জকেও একথা বলে দিও।

—সুশান সায় জানিয়ে চলে যায়, তার কিচেনে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। একার হাতে সংসার।

ডিনসমেড এখন আর দোকানে স্থির ভাবে বসতে পারছে না। সারাক্ষণ সে অ্যাটাচির কথা ভাবতে থাকে। তার ঐ অ্যাটাচিটা চাইই চাই। কিন্তু কি ভাবে?

একদিন ডিনসমেড নিজেই বার্জের বাড়ির চারদিকটা একটু ভালোভাবে ঘুরে আসে এবং কোথা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে তারও একটা ছক সে সঙ্গে সঙ্গে করে নেয়।

তারপর একদিন মাঝ রাতে ডিনসমেড বার্জের বাড়ির পাঁচিল টপকে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তাতে তার খুব একটা কষ্ট হলো না। আর অ্যাটাচির লোভে তাকে একাজ করতে সাহায্য করলো।

কিন্তু মানুষ তো অনেক কিছুই ভাবে। করেও অনেক পরিকল্পনাকে কিন্তু বাস্তবে অনেক কিছুই হয় না। ডিনসমেডের ক্ষেত্রেই আমোঘ সত্য ঘটলো, যাতে সে রীতিমতন হকচকিয়ে যায়।

ডনিসমেড ভেতরে ঢুকেই অদূরের অস্পষ্ট আলোকে যাকে দেখলো তাতে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা বুল ডগ এবং ছাড়া অবস্থায়।

আর কোন কথা নয়। প্রাণের মায়া ওসব বড্ড বেশী ডিনসমেডকে কাতর করে তোলে। ফলে যেমন চুপিসারে পাঁচিল টপকে ভেতরে প্রবেশ করেছিল, তেমনি নিঃশব্দে আবার বাইরে এসে দাঁড়ায়। টু শব্দ হলে কি আর রক্ষে ছিল। তার টুঁটি চেপে ধরে ঐ হিংস্র কুর ঝুলে থাকতো। এবং বদ্যতেই যাপে বুল ডগ।

রাস্তায় এসে ডিনসমেড নিজেকে বড্ড অসহায় বোধ করে আর ভাবে, এ বাড়িতে গিয়ে চুরি করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না। গেলে বেঘোরো মারা পড়বে। ও কুকুর বাঘের সমান। সাক্ষাৎ যেন যম।

তারপর ডিনসমেড অনেক ভাবনা চিন্তার পর স্থির করলো, এ কাজ তার দ্বারা হবে না, এ কাজ অন্যের উপর দিয়ে হবে, নইলে জীবনের উপর বড্ড ঝুঁকি নেওয়া যাবে। আর তাকে সামান্য কিছু দিলেই চলবে। এবং তেমন লোকের এ জগতে অভাব নেই। সুতরাং যেচে নিজের বিপদ বাড়াবার কোন মানে হয় না।

তেমন একজন লোকও সাথে সাথে পাওয়া গেল। লোকটার সঙ্গে আগে ডিনসমেডের পরিচয় ছিল। লোকটা মাঝে মাঝে কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতো।

লোকটা আগে একটা সার্কাস পার্টিতে কাজ করতো। বাঘের খেলা দেখাতো। সম্ভবত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওখানের চাকরি গেছে। তার গায়ে এখনো অসুরের শক্তি ধয়ে।

লোকটার চাকরি নেই। ওর এখন টাকার দারুণ প্রয়োজন।

লোকটার নাম ডিকি। তাকে ডিনসমেড কথাটা বলতে সে লুফে নিলো এবং জুলু জুলু চোখে ডিনসমেডের দিকে তাকিয়ে বললো এ কাজ করতে পারলে কত দেবেন?

—তিন হাজার পাবে, ডিনসমেড ইচ্ছে করেই কম বলে। বেশী বললে ও-ও টাকার অঙ্কটা সাথে সাথে বাড়িয়ে দিবে।

—তিন বড্ড কম হয়ে রয়েছে। তার উপর আবার ঐ কুকুরটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

—ঠিক আছে, সাড়ে তিন পাবে এবং আমার অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখছো।

ডিকি ভাবে, সত্যি, এর পর দরাদরি করা চলে না। করলেও সেটা ঠিক শোভন হবে না। আবার পাছে যদি ডিনসমেড বেঁকে

গিয়ে অন্য কাউকে নিয়োগ করে তাহলে এ সাড়ে তিন ও গেল। যাক্, এই ভালো।

তারপর ডিকি বলে, ঠিক আছে, তাই দেবেন। আর এখন কিছু অ্যাডভান্স করুণ।

ডিনসমেড জানতো, যাকেই সে কাজের কথা বলবে সেটা এটা আগে ভাগে চাইবে। তাই সে ধার দেনা করে কিছুটা টাকা যোগাড় করেছে। তাই ওর হাতে তুলে দিয়ে বললো, বাকিটা পরে পাবে। আশা করি আমায় বিশ্বাস করো।

—ঠিক আছে, শ পাঁচেক টাকা হাতে পেয়ে ডিকির জিব দিয়ে লালা যেন ঝরছে।

ডিকি তার পরের দিনই রাতে বার্জের বাড়ি গেল এবং চারদিকটা বেশ ভালো করো ঘুরে ফিরে দেখে এলো। এরপর কিছু মতলব এঁটে ফের গেল ওখানে। এবং তারপরই ঘটনাটা ঘটলো।

পরের দিন ভোরে ডিনসমেড স্বচক্ষে ঘটনাটা দেখলো। দেখে তার সারা গা যেন থর থর করে কাঁপতে থাকে। মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। সামনে পোষ্টটা না থাকলে সে হয়তো রাস্তায় মাঝে টলেই পড়ে যেত।

ডিমির বিরাট দেহটা ওখানে পড়ে রয়েছে। তার দেহটা কুকুর ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। তারপর প্রচুর রক্তপাতে ও মারা গেছে।

একটু ধাতস্ত হতে ডিনসমেড কপাল চাপড়াতে থাকে, হায়! হায়! ধার ধোনা করে টাকাটা আনলাম তাও গেল!

ওদিকে বার্জ অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলো এবং এটা ডিনসমেডও ভেবেছে। পরের দিন সন্ধ্যের মুখে গিয়ে দেখে, একটা বছর পঁচিশের শক্ত সামর্থ ছেলে হাতে রাইফেল নিয়ে বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং সঙ্গে বুল ডগ কুকুরটা রয়েছে।

এতে ডিনসমেডকে বুঝতে পারে, খরচের ব্যাপারটা হয়তে রবার্ট দেবে। এ কথা বার্জ নিশ্চয়ই তাকে বলে নিয়েছে। আর বললেও

রবার্টের অরাজি হবার কিছু থাকবে না।

তবু ঐ অ্যাটাচির নেশা ডিনসমেড কিছুতেই ছাড়তে পারছে না এবং কি ভাবে ওটা হাতে পাবে সে বুদ্ধিও আবার মাথায় যোগাচ্ছে না। ফলে সে একটা অস্থিরতায় ভুগছে।

এরই মাঝে ডিনসমেড রবার্টের একদিন বাড়ি যেতে সে কিছু কথা বার্তার পর বললো, কাল আমায় বাইরে যেতে হবে।

—বাইরে? কোথায়? ডিনসমেড জানতে চায়।

—নর্থ রোড স্টেশনে।

—ওখানে তোমার আবার কিসের কাজ পড়লো?

—অফিসের।

—তা বাড়ি থেকে যাবে, না অফিস থেকে?

—বাড়ি থেকে।

ডিনসমেড মাথা নাড়ে। কিছু বলে না।

বাড়িতে এসে ডিনসমেড ভাবতে থাকে, কি করবে? সামান্য একটা মৃত্যু ঘটালে তার ভাগ্য খুলে যাবে। সংসারের মুখে হাসি তার কাজ কারবার প্রথম দিকের মত আবার লাফিয়ে চলতে শুরু করে দেবে।

আর রবার্ট তো জীবনে অনেক ভোগ করেছে। বিলাশ ব্যাসনে দিন কাটিয়েছে। এবার নয় সে একটু কাটাক।

তবে রবার্টের মৃত্যুর সঙ্গে চাই তাব মেয়ে মেরীকে। ওকে এনে নিজের কাছে রাখতে হবে। তারপর মেরীর আঠারো বছর পূর্ণ হলে সেই অ্যাটাচি তার ভোগে আসবে। কিন্তু তাকে ধৈর্য ধরে ঐ দীর্ঘ আঠারো বছর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া, সে অন্য উপায় দেখছে না।

আবার ডিনসমেড ভাবে, টাকার জন্য বন্ধুকে হত্যা করবে? এটা রীতিমতন একটা অন্যায় কাজ হবে। তবু ঐ টাকা ভর্তি

অ্যাটাচির চিন্তা তাকে হিতাহিত জ্ঞান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এখন তার বিবেক বলতে যেন আর কিছুই নেই। থাকলেও অশুভ চিন্তার কাছে বশ হয়ে পশুত্বে পরিণত হয়েছে।

তারপর ডিনসমেড ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়। দেখা যাক্, ভাগ্য তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়। তবুও সে রবার্টের হত্যায় চিন্তায় এক পা এগোয় তো দশ পা পিছোয়। কিন্তু সেই অশুভ বুদ্ধি তাকে সাহস যোগাতে থাকে। আর সেই যেন তাকে অসুরের শক্তিতে বলিয়ান করে তোলে।

তার পরের দিন সকালে ডিনসমেড নির্দিষ্ট স্টেশনে গিয়ে বসে থাকে। তার আগে সে একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে নিয়েছে যার দাম এগারো টাকা পাঁচ পয়সা। আর সে বেশ ভালো করেই জানে, রবার্ট ফার্স্ট ক্লাসেই যাতায়াত করে থাকে।

ডিনসমেড সাজো সাজো বরে আসরে নেমে পড়েছে। এখন শুধু প্রতীক্ষা কখন রবার্ট আসে এবং বাকি কাজটা সে সমাধা করতে পারে।

ডিনসমেডের ধারণাই ঠিক হলো, কিন্তু হঠাৎ বাধ সাধলো বৃষ্টি, সহসা আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামলো। গাড়ি একবারে ফাঁকা বললেই চলে। মাত্র পাঁচ ছ'জন বসে আছে।

ডিনসমেড ভাবে, রবার্ট আবার আসবে তো? না আবার বৃষ্টি দেখে যাওয়া বাতিল করে দেবে। ফলে একটা আশা নিরাশার মাঝে সে দুলতে থাকে। অবশেষে তার ভাগ্যের সহায় হয়ে রবার্ট এলো।

রবার্টকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ডিনসমেড নিজের আড়াল করে অন্য একটা কামরায় উঠে দেখতে থাকে, রবার্ট কোন কামরায় ওঠে। উঠলো তার পাশের কামরায়। আর তাতে তার সুবিধেই হলো।

রবার্ট বরাবরই একটু আয়েসি ধরণের মানুষ। সে চোখ বুজে ঝিমোতে থাকে। কারণ রাতে তার বড় একটা ঘুম হয় নাতো।

নর্থ রোড স্টেশনে আসার আগেই ডিনসমেড রবার্টের কামরায় চুপিসারে চলে আসে। তা রবার্ট জানতেই পারে না। কারণ সে ঘুমে অচৈতন্য।

ওদিকে ডিনসমেড ওভার কোট আর ম্যাক্সি ক্যাপ দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছে। তার উপর চোখে সান গ্লাস। হাতে দস্তানা, যাতে আঙুলের ছাপ না ওঠে।

ওদিকে গাড়ি নর্থ রোড স্টেশনে প্রায় এসে গেছে। অথচ রবার্টের নামার কোন লক্ষণ নেই। সে অকাতরে ঘুমিয়ে চলেছে। তারপর হুইসিল দিয়ে যখন খানিকটা চলতে শুরু করেছে তখন রবার্ট ধড়ফড় করে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্টেশনের নাম পড়ে দরজার কাছে এগিয়ে যায়। ভাবে, নামবে কি নামবে না।

পরের স্টেশনে পর্যন্তই গাড়ি যাবে। ফলে তারা ছাড়া গাড়িতে আর মাত্র দু'জন রয়েছে, তার মধ্যে একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা। তার চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। তার সঙ্গে একটা বছর চারেকের একটা ছেলে। সম্ভবত নাতি এবং এদের মুখ দরজার পিছন দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে এ সুযোগটা ডিনসমেড রেখে নেয় এবং তার উপরে যেন একটা অশরীরি আত্মা ভর করে, তারপর নিজেই জানে না কখন সে রবার্টকে পিছন দিক দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে, ধাক্কা দিয়েই ডিনসমেড পেছন ফেরে ঐ ভদ্রমহিলা আর তার নাতির দিকে তাকায়। না তারা তাকে দেখতে পায়নি। ভদ্রমহিলা এখনো তার নাতির সঙ্গে খেলায় ব্যস্ত।

তা সত্ত্বেও ডিনসমেড হাত কাঁপতে থাকে, বিশেষ করে যে হাত দিয়ে রবার্টকে ধাক্কা মেরেছে, এবং তার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে আর এসে কি করলো।

ওদিকে এ সময় গাড়ি স্টেশনে ইন করতে যাচ্ছে। তা দেখে ডিনসমেড আর সীটে বসে থাকতে পারে না। তারপর সীট ছেড়ে উঠে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে আবার একটা ফাস্ট ক্লাসের টিকিট কেটে

একটা ভিড় দেখে কামরায় ওঠে। যাতে কেউ তাকে হুট করে চিনতে না পারে, এবং হিল রোড স্টেশনে পা দিয়ে সোজা দোকানে চলে আসে, সে বেশ ভালো করেই জানে, একটু পরেই জোন্সের ফোন আসবে।

তারপর দুপুরের দিকে জোন্সের ফোন এলো। বিস্ময়ে হতবাক হওয়ার মত ভাব করে ডিনসমেড বললো, শান্ত হও জোন্স। তোমায় এখন ভেঙে পড়লে চলবে না। দুর্ঘটনার উপর তো কারুর হাত নেই আর মেরীর উপর দৃষ্টি রাখো।

এরপর ডিনসমেড মিস জুলিয়েটের খবর দিয়ে মর্গে গিয়ে যা কিছু করার সে করলো এবং পরের দিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা হলে। আর সবই সুষ্ঠ ভাবে মিলে গেল। সবাই এক বাক্যে বললো, তুমিই রবার্টের সার্থক বন্ধু। তোমার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের দরকার।

—আমি আর রবার্টের জন্য কি করতে পারলাম। ডিনসমেড যেন দুঃখে মুষড়ে পড়েছে। এ আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।' তার চোখে জল এসে যায়। এ অশ্রু সত্যিকারের, আসলে তার মনের মধ্যে সূক্ষ্ম মনটা আছে সেটা তাকে কষাঘাতে জর্জারিত করে তুলেছে।

—এবার তুমি রবার্টের মেয়ের ভার নাও, একজন বলে।

—সেটা কি ঠিক হবে? ডিনসমেড আবার পর্যায়ে ফিরে যায় কারণ তার মধ্যে তো একটা শয়তান ভর করে আছে।

—কেন হবে না?

—জোন্স ওকে কোলে পিঠে মানুষ করেছে। সেই বাচ্চাকে নিয়ে গেলে ও কি করে থাকে। ডিনসমেড যেন বিনয়ের অবতার।

—তাহলে তো বাচ্চার ভবিষ্যত বলে একটা কথা আছে।

—দেখি, জোন্স যদি নেয়, ডিনসমেড শোকে ভেঙ্গে পড়া যেন এক পাথরের মূর্তি।

রবার্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের দিন ডিনসমেডের বার্জের বাড়িতে হাজির হয়। কারণ এখন সে তাকে তোয়াজ আত্তি করে করে হাতে রাখতে চায়। ওর কাছেই তো তার চাবি কাঠি রয়েছে।

এসো ডিনসমেড, বলে বার্জ তার সামনের গদী আঁটা চেয়ার তাকে বসতে বলে।

—কাল আপনি রবার্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যেতে পারেননি, সে কথা আজ আপনাকে জানাতে এসেছি।

—ভালো করেছো।

—তা আপনি খবর পেয়ে ছিলেন তো?

—হ্যাঁ। তখন আমি চার্চের জরুরী একটা মিটিং এ ব্যাস্ত ছিলাম। আর সে মিটিং বসেছিল এখানে।

—তাহলে তখন তো আর মিটিং ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

—আর সত্যি কথা বলতে কি, তখন ওখানে যাবার মত আমার মানসিকতাও ছিল না। বার্জের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে লিজা অকালে বিদায় নিল। তারপর রবার্ট। শুধু পড়ে রইলাম আমি।

—সত্যি, রবার্ট যে এভাবে চলে যাবে......ডিনসমেডের চোখ ছল ছল করতে থাকে।

—আমায় আর বেঁচে থাকতে আদৌ ইচ্ছে করছে না।

—ডিনসমেড, ও কথা আর মুখে আনবে না। তোমার এখন অনেক কর্তব্য। মেয়েকে এনে নিজের কাছে রাখো

—সেটা কি ভালো দেখাবে?

—কেন?

—আপনি থাকতে আমি।

—আমি অবিবাহিত মানুষ। তাছাড়া সংসারের প্রতি আমার আর কোন মোহ নেই। তাই আমার পক্ষে ও মেয়েকে মানুষ করা

আদৌ সম্ভব নয়।

—তা আমি অস্বীকার করতে পারি না।

—তাই তুমি আর আপত্তি করো না।

—মানে আপত্তি ঠিক নয়।......, ডিনসমেড ইতস্তত করতে থাকে।

—আর কোন কথা নয়। কালেই মেরীকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। তোমার বাচ্চাদের সঙ্গে ও বেশ হেসে মেলে থাকতে পারবে। সেই সঙ্গে বাবা মায়ের অভাবটা ভুলবে। তারপর বড় হলে দেখা যাবে, এসময় বাবা কার প্রয়োজনটা সবচেয়ে বেশী।

—সে কথাটা আমিও ভেবেছি।

—তবে ডিনসমেড, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

—নিশ্চয়ই করবেন।

—তোমার স্ত্রীর দিক দিয়ে......।

—না। বরং সুশানই ......।

—যাক্, মাথা দিয়ে একটা চিন্তা দূর হলো।

—কিন্তু...।

—তবে তো আর কোন কিন্তু নেই।

—তা ঠিকই।

—তাহলে?

—আমি ভাবছি, জোন্স আমার কাছে মেয়ে দিতে হয়তো আপত্তি তুলতে পারে, ডিনসমেড একটু দ্বিধান্বিত ভাবে।

—আপত্তি? ওর আবার কিসের আপত্তি?

—না মানে, বলছিলাম, ও হয়তো বলতে পারে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি...।

—তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু ওর কাছে মেয়েকে রাখা কিছুতেই চলতে পারে না। আর ও মেয়েকে মানুষ করবে কি করে? ওর শিক্ষা দীক্ষাই বা কি! তার উপর আবার লিজার

মেয়ে বলে কথা।

একটু থেমে বার্জ আবার বলে, মোট কথা, জোন্স যদি বাধা দেয় তাহলে তুমি ওর কোন কথা কানে তুলবে না। মেরীর ভবিষ্যত নিয়ে তো আর জুয়া খেলতে পারি না! প্রয়োজন বোধে কঠোর হবো।

—আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক, কিন্তু আমি আবার আর একটা কথা ভাবছিলাম।

—বলো।

—মিস জুলিয়েটে ব্যাবধানে যেমন আছে তেমন থাকলে কেমন হয়? ডিনসমেড নিজেকে নির্লোভ পমাণিত করতে চায়।

—তোমার কথা যে একবারে অযৌক্তিকে তা বলছি না। তবে এতে একদিকে যেমন তার মাইনে গুনতে হবে, তেমনি মেয়ে তোমাদের স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে, যা আমি আদৌ চাই না। আমি নিজে এর শিকার। আমার বাবা-মা যখন বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায় তখন আমি পাঁচ বছরের। এই চার্চের ফাদার আমায় মানুষ করেন। এই সময় আমি একটু স্নেহ ভালোবাসার জন্য কাঙাল হয়ে ঘুরতাম।

একটু থেমে বার্জ আবার বলে একদিনের ঘটনা আমার মনে আছে। তখন এক্সমাস। হেনরীর মা আমায় একটা কেক উপহার দিয়ে সস্নেহে আমায় বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন। তারপথ আমাকে কপালে যখন চুমু খেলেন আঃ, কি শান্তি! কি সুখ! অমন আনন্দ যেন জীবনে পাইনি।

বার্জের চোখ উদাস দেখাতে থাকে, তখন আমার বয়স সাত। সে বয়সের কথা অনেকেই ভুলে যায়। কিন্তু আমি ভুলে যেতে পারিনি। কারণ আমার জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তো বেশী নয়। তার মধ্যে থেকে বিশেষ বিশেষ ঘটনা বেছে নিয়ে স্মৃতির মণিকোঠরে সযত্নে সাজিয়ে রেখে কাঙালের মতন লাগল পালন করি।

—এসব কথার আর না বলা চলে না। আসলে ডিনসমেড তার কথার মাধ্যেমে বোঝাতে চাইছিল যে. মেরীর রাখার পিছনে তার এত লোভ বা মোহ নেই। তবু বন্ধুর প্রতি কর্তব্য অবিচল। তা সত্ত্বেও সে হট করে রাজি হয়ে যায়নি। হলে হয়তো বাজ´ মনে মনে অন্য কিছু ভাবতে পারে। যাক্, সে যে তার চোখকে ধুলো দিতে পেয়েছে তাই যথেষ্ট।

তারপর ডিনসমেড চেয়ার ছেড়ে উঠে বিনয়ের সঙ্গে বলে, তাহলে আপনি অনুমতি করুণ, আমি যাই।

—এসো। ভগবান তোমায় মঙ্গল করুণ।

ওদিকে ডিনসনেড তো জোন্সকে রাজি করাতে পারলো না। সে মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর সে তাকে বার্টে´র সাহায্যে করবে পাঠিয়ে মেয়ের নিজের কাছে আনতে সাহাস পায় না। পাছে জানাজানি হয়ে যায়।

তারপর ডিকসমেড ঠিক করে, এখানে আর নয়। তাকে এখান থেকে 'যে করে হোক পালিয়ে যেতে হবে। আর ধারে কাছেও নয়। তাকে লোকালয়ের বাইরে থাকতে হবে।

কিন্তু যাবে বললেই তো হলো না। টাকা কোথায়? তাব উপর বাটকে কিছু দিয়েছে। সে দেনা এখনো শোধ হয়নি। তাই নতুন করে কেউ আর তাকে ধার দেখে না। তাহলে উপায়?

ঠিক তখনই পিটার একটা বাড়ির খোঁজ আনলো। বললো, স্যার, একটা ভালো বাড়ির খোঁজ পেয়েছি।

—ভালো বাড়ি চাইনা, ডিনসমেড বলে। আমার মোটামুটি হলেই চলে যাবে। ভালো বাড়ির দামও ভালো।

—স্যার, ভালো হলেও দামে সস্তা।

—কত?

—যাট হাজার টাকা।

—একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে।

—এত সুন্দর বাংলা বাড়ি যে আপনি দেখলে চোখ ফেরাতে পারবেন না। অদূরে পাহাড়। চমৎকার জায়গা।

—তা বাড়িটা কোথায় ?

—গ্রীন উডে, পাছে ডিনসমেড অরাজি হয়, তাই পিটার সঙ্গে সঙ্গে ফের বলে। শহর থেকে মাত্র দশ মাসই পথ। গাড়িতে আর কতটুকুই বা সময় লাগে।

শহর থেকে দূরে, ডিনসমেড মনে মনে বলে ওঠে, এটাই সে চাইছিল। যাক্, ভগবান যেন তাকে এ সুযোগ করে দিয়েছে। তা নয় দিল, কিন্তু এত টাকা ? সে এত টাকা কোত্থেকে যোগাড় করবে ?

—স্যার, তিন চারটে ঘর। সামনে বাগান। ডিনসমেড যাতে 'না' বলতে পারে তার জন্য সে পেশাদারী কায়দায় বলে চলে।

—তা নয় বুঝলাম, কিন্তু দামটা যে কমাতে হবে, আর ডিনসমেড বেশ ভালো করেই জানে। দালালরা একটু বাড়িয়ে বলে। জানে যে কিনবে সে কম বলবে।

—স্যার, ষাট কিন্তু একবারে বেশী নয়।

—তবুও ওটা পঞ্চাশের মধ্যে করতে হবে।

—স্যার, বড্ড কম হয়ে যাচ্ছে !

—তাহলে'তো আমি নিরুপায়।

—দেখি কি করতে পারি !

—ঠিক আছে, তবে আমার তেমন তাড়া নেই, বলে ডিনসমেড বোঝাতে চাইলো। তার ও বাড়ির প্রতি যেন তেমন গরজ নেই।

তার দিন দুয়েক পরে এসে পিটার ডিনসমেডকে জানায়, স্যার, অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে পঞ্চাশে রাজি করাতে পেরেছি। সেই সঙ্গে আমার কমিশনও কিছুটা মার খেলো, নেহাত আপনি অনেক দিন ধরে বলছেন বলেই……।

'ন্যাকা। বাচ্চা ভোলানো গল্প বলতে এসেছে। ডিনসমেড মনে মনে ফোঁস করে উঠে। তারপর সে বলে, দেখি, এখন টাকাটা যোগাড় করতে হবে।

—যত তাড়াতাড়ি পারেন স্যার, তাই করুণ। কারণ নেবার জন্য কেউ কেউ ওৎ পেতে রয়েছে।

—ঠিক আছে।

পিটার চলে যেতে ডিনসমেড ভাবে, পঞ্চাশ হাজার টাকা তার চাই। অথচ তাকে এখন বেচলে পঞ্চাশ টাকাও বের হবে না। আর সেই মানুষকে কি না এত গুলো টাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। এমন কথা মানুষ বোধ হয় স্বপ্নেও দিনের বেলা ভাবতে পারে না। তাহলে উপায়?

অথচ এ বাড়ি না ছাড়লেও নয়, ডিনসমেড ভাবে। না ছাড়লে পরিচিত জনের প্রশ্নে সে বড়ই বিব্রত বোধ করবে। তাই তাকে একটা উপায় বার করতেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ডিনসমেডের রজারের কথা মনে পড়ে যায়। সে তাকে বাড়ি ছাড়ার জন্য নানা ভাবে চাপ দিয়ে চলেছে। তার ছেলে আসবে, আসুক গে। কিন্তু এত সহজে সে বাড়ি আবার ছাড়তেও চায় না। এত সস্তায় সে কোথায় থাকতে পারবে। এখন যে বাড়িতে আছে, সে বাড়ি ছাড়লে কম করে হাজার টাকায় বাড়ি ভাড়া হয়ে যাবে।

ডিনসমেড মনে মনে চাইছিল, রজার যেন তাকে এসে আবার বাড়ি ছাড়ার জন্য চাপ দেয়, আর বাস্তবে হলেও তাই।

রজার ডিনসমেডের কাছে এসে কাঁচু মাচু হয়ে বলে, মিঃ ডিনসমেড, এবার আমার অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।

ডিনসমেড বুঝেও না বোঝার মত ভান করে। বলে, কি ব্যাপারে বলুন তো?

—বাড়ি ছাড়ার প্রসঙ্গে।

—বাড়ি ছাড়ার? ডিনসমেড অবাক হবার ভান করে।

—হ্যাঁ, আর আমি একান্ত নিরুপায় হয়েই এ কথা আপনাকে বলছি।

—আমার পক্ষে এখন আদৌ সম্ভব নয়, ডিনসমেড রজারকে প্যাঁচে ফেলতে চায়। বরং আমি আপনাকে কয়েক টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিতে পারি, যা সেধে আজকালকার বাজারে কেউ বলে না। এবং এর বেশী আমি কিছু করতে নারাজ।

—আমি বাড়ির ভাড়া বাড়াবার জন্য আপনাকে বলতে আসিনি।

—তাহলে ?

—আমার ছেলের টেলিগ্রাম এসেছে।

—ও'।

—তাই আর আপনাকে একবারে সময় দিতে পারছি না। আপনিই বলুন, ছেলে এসে কোথায় উঠবে ?

—এটা একটা সমস্যা বই কি।

—তবেই বুঝুন আমার অবস্থাটা।

—একটা কাজ করলে হয় না ?

—কি কাজ ?

—আপনার ছেলে এসে এখানে কতদিন থাকবে ?

—তা ধরুন, বছর খানেক তো নিশ্চয়ই।

—তবে তো কোন সমস্যাই নয়।

—কেন ?

—তাকে অন্যত্র একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার পরিচিত একজন দালাল আছে। তাকে বললে একটা অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দেবে। আর এ লাইনে আছেও বহুদিন।

—নিজের বাড়ি থাকতে ছেলে এসে অন্যত্র উঠবে। না, না, এটা বড় খারাপ দেখাবে।

—উপায় কি বলুন। আর আপনি কি এক তলার দোকান গুলো তুলতে পারবেন ?

—ওরা এক একটা চিজ। কথায় কথায় আইন দেখায়।

—তাহলেই দেখুন দিন কাল কেমন।

—তাই তো আপনাকে একান্ত ভাবে অনুরোধ করছি।

—আমি আপনার অসুবিধের কথা বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনিই বলুন, আমি বউ বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে গিয়ে কোথায় দাঁড়াই। গাছ তলায় তো গিয়ে আর উঠতে পারি না।

—তা তো নিশ্চয়ই।

—আর আজকালকার দিনে নতুন ভাবে অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া করা মানে তো বুঝতে পারছেন……।

—তবু চেষ্টা করুণ।

—সে তো আপনি বলার পর থেকে চেষ্টা করে চলেছি। তবু কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছি না। ভাড়া তো আছেই, সেই সঙ্গে অ্যাডভান্স, সেলামি কত কি চাইছে।

—সবার লোভ বেড়ে গেছে। বলুন, আমি কি আপনার কাছ থেকে ও সব নিয়েছি?

—তা নেননি। তখন ইচ্ছে করলে নিতে পারতেন বই কি? তারপর রজার একটু ভেবে বলে, ঠিক আছে, আপনার তো ছ'মাসের ভাড়া বাকি, ও আর দিতে হবে না।

—তাতে আমার ক' টাকাই বা সুরাহা হবে। বড় জোর চার পাঁচশো টাকা। তাই আমার পক্ষে এমন বাড়ি ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

—মিঃ ভিনসমেড, প্লীজ ও কথা বলবেন না।

—উপায় নেই। তবে……।

—তবে কি?

—ছাড়তে পারি একটা শর্তে।

—শর্তে? তা শর্তটা কি?

—বাড়ি ছাড়তে হলে আমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে।

—পঞ্চাশ হাজার?

—হ্যাঁ, তার এক পয়সাও কম হলে চলবে না। কারণ আজকালকার দিনে অ্যাপার্টমেন্টের অনেক ভাড়া। তাই ও ভাড়ায় তো গিয়ে আর উঠতে পারবো না। তাই টাকাটা পেলে শহরে তো সম্ভব নয় গ্রামে একটা ছোট খাটো বাড়ি কেনা সম্ভব হলেও হতে পারে, যদিও এতে আমার ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধে হবে, শুধু আপনার মুখ চেয়েই এ কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হয়েছি।

এত টাকা আমায় মেরে ফেললেও বেরুবে না।

—মারার দরকার হবে না, আপনার এমনিতেই অনেক আছে।

—কে বললে। রজার একটু চমকে ডিনসমেডের দিকে তাকায়।

—কেউ বলেনি। আমি জানি।

—কি করে জানলেন?

—তা আপনি নিজেও জানেন।

—আমার এত টাকা আছে কি না তা আমি জানি না।

—মানুষ অনেক সময় টাকার হিসেব রাখতে পারে না, বিশেষ করে যখন টাকার পাহাড়ে চেপে বসে।

—আপনার কথার মানে আমি আদৌ বুঝতে পারছি না।

—পারবেন না? তাহলে একটু খুলেই বলি?

—বলবেন বই কি?

—তা আপনার ব্যবসা কেমন চলছে?

—ব্যবসা? রজার আঁতকে ওঠে।

—হ্যাঁ, আপনার ব্যবসা।

—আমার আবার কিসের ব্যবসা। স্বামী-স্ত্রীতে বাড়ির এক কোণে পড়ে থাকি।

—তা অবশ্য থাকেন ঠিকই। বড় শান্তি প্রিয় মানুষ।

—তাহলে?

—আর তার মাঝে মাঝেই অপ্রিয় কাজ গুলো সুষ্ঠ ভাবে করে চলেছেন, তাই না?

—আমি? রজার যেন আকাশ থেকে পড়লো। আপনি কি সব আজে বাজে বলে চলেছেন।

—আজে বাজে কথা আদৌ নয় এবং আমায় ঐ টাকাটা না দিলে সমস্ত ব্যাপারটা আমি পুলিশের কাছে ফাঁস করে দেবো।

—কিন্তু কি ফাঁস করবেন? রজার একটু জোরের সঙ্গে বলে ওঠে।

—ঠিক আছে, পরে দেখবেন আপনার কোকেনের ব্যবসার কথা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি।

—কোকেন ওসব আপনি বলছেন কি

—তার প্রমান চান? আমি প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না। সে আমার কাছে আছে।

রজার এ কথার আর জবাব দিতে পারে না। চুপ করে থাকে। জোঁকের মুখে যেন নুন পড়েছে।

আবার ডিনসমেড বলে ওঠে পিস্তল বার করলে নিজেই বিপদে পড়ে যাবেন। তখন আমি ইচ্ছে করেই চেঁচিয়ে উঠবো। আসলে আমি মরতে চাই। সংসারে ব্যবসা আর চালিয়ে উঠতে পারছিনা। মরলে বরং শান্তি পাবো। তবে আপনি নিশ্চয়ই আমায় বাড়ির মধ্যে হত্যা করতে চাইবেন না। তাহলে আপনি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবেন। আশা করি এ ভুল করবেন না।

তারপর ডিনসমেড চেয়ার ছেড়ে উঠে মাটির তলা দিয়ে একটা পুরনো বাক্সের মধ্যে থেকে একটা ছোট প্যাকেট বার করে, এই দেখুন, সেই প্রমাণ। এতে কোকেন ভর্তি আছে।

রজারের চোখ ছানা বড়া হয়ে যায়। সে হাত বাড়াতে ডিনসমেড বাধা দিয়ে বলে, উহুঁ, নিতে বৃথা চেষ্টা করবেন না। দূর থেকে দেখুন। আর এই দেখুন, পার্সেলে আপনার নাম ধাম, ঠিকানা সব লেখা রয়েছে।

এরপর ডিনসমেড রজারের ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, এসব নিশ্চয়ই আমার বানানো কথা নয়।

একটু থেমে ডিনসমেড আবার বলে; আমি ক' দিন ধরেই ভাবছিলাম, এসব ঘরে রাখা ঠিক নয়। পুলিশে জানিয়ে দেওয়া আমার একান্ত পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি।

—না, না, এমন কাজও করবেন না।

—করতে চাই না, যদি ঐ টাকাটা……

—এত টাকা আমি কি করে দেবো ?

—না দিতে পারলে বাধ্য হয়ে আমার পথ আমায় দেখতে হবে।

—মিঃ ডিনসমেড, একটু দয়া করুন।

—এতে দয়া মায়ার কোন প্রশ্ন নেই। আমি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে হাজারো বিপদে সম্মুখীন, আর আপনি তোফা আনন্দে গা ভাসিয়ে চলবেন তা কি কখনো হয়। আর আপনার না থাকলে তবু একটা কথা ছিল।

—ঠিক আছে, আমি আপনাকে দশ হাজার দিচ্ছি।

—পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সাও কমে হবে না, ডিনসমেড রজারকে পুরোপুরি বাগে পেয়েছে।

—পনেরো দিচ্ছি।

আমার ঐ এক কথা।

তারপর অনেক দরাদরি করার পর শেষে চল্লিশ হাজারে রফা হয় এবং ডিনসমেড জানায়, আমি ক্যাস চাই।

—তাই পাবেন।

আশা করি অন্যথা করতে সাহস পাবেন না। তাহলে কিন্তু আমার পথ খোলা থাকবে।

তারপর নিতান্ত ভালো ছেলের মত রজার ডিনসমেডের হাতে টাকাটা দিয়ে বলে, এই টাকার কথা যেন কেউ জানতে না পারে। এবং সেই সঙ্গে আমায়ও একটা কথা দিতে হবে যে, আমার ব্যবসায় কথা গোপন থাকবে।

—আমার দিক দিয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এবং কোনদিন ব্যাক মেইলও করতে আসবে না। আর করলে এ ওদিল তা করতে পারতাম। নইলে অসুবিধেয় পড়েছি বলেই কিছুটা নিরুপায় এই অপ্রিয় কাজ আমায় করতে হলো, যা এর আগে জীবনে করনি।

এরপর রজার বিদায় নিতে ডিনসমেড পিটারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে বলে, সে চল্লিশের বেশী যোগাড় করতে পারছে না। শেষে আরো হাজার তিনেক দিয়ে রফা হয়। ইতিমধ্যে ডিনসমেড সুশানকে বাড়িটা দেখিয়েছে। প্রথমটা সে গাঁইগুই করলেও পরে তার চাপে পড়ে রাজি হয়ে যায়। তারপর এই গ্রীণউডে আসে।

এর মাঝে বছর দশেক পার হয়ে গেছে। সোফিয়া বয়স ছয় বছর মেরী বছর দশেকের, আর আসল মেরীর নাম রাখা হয়েছে শার্লট। তার বয়স এখন সাড়ে আট। এবং সে দিব্যি ডিনসমেড এবং সুশানকে বাবা-মা বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে।

একদিন ডিনসমেড সুশানের কাছে গিয়ে বলে, সুশান, মেরীকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দাও তো। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ওকে নিয়ে যাবো। অনেক দিন ধরে বলছে।

—তাহলে শার্লট এবং জর্জকেও সঙ্গে নাও।

—ওরা গেলে বড় দুষ্টুমি করবে। তাছাড়া, আমি যাবো আর আসবো।

—কিন্তু ওরা কি এ কথা শুনবে। মেরী জামা-কাপড় পরাতে দেখলে আমায় হাজারো প্রশ্ন জুড়ে দেবে।

—তুমি ওদের বুঝিয়ে বলবে। ঠিক আছে, আমিই নয়…।

তারপর ডিনসমেড ওদের জন্য রঙীন বল কিনে নিয়ে আসবে বলে ভুলিয়ে মেরীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

তবে সুশানের ইচ্ছে ছিল, সবাই মিলে যায়। কিন্তু স্বামীর

অবস্থার কথা সে জানে আর সবাই যাওয়া মানে অনেক খরচ।

তারপর ঘুর পথে গাড়ি চালিয়ে, যা ডিনসমেড পরে অনেক বার করেছে, সেই ভাবে সে বার্জের বাড়ি হাজির হয়, গুড মর্নিং মিঃ বার্জ। মেরীকে নিয়ে এসেছি।

—বাঃ অনেক বড় হয়ে গেছে তো! বার্জ কোন রকম সন্দেহ করে না। বরং সস্নেহে মেরীকে বুকের মাঝে টেনে নেয়।

তারপর বার্জ মেরীকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে। যেমন, কোন স্কুলে পড়ছে, ছুটির পর বাড়ি এসে কি করে, কোন শখ আছে কি না ইত্যাদি।

ওদিকে ডিনসমেড তো ঘামছে, ভাবে, মেরী না আবার বেফাঁস কিছু বলে বসে। তাহলেই সে গেছে।

এরপর মেরী লনে গিয়ে খেলায় মেতে উঠলে ডিনসমেড যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে এবং তার একটা কথা মনে পড়ে যায়। সে বলে, মিঃ বার্জ, একটা কথা আপনাকে বলা দরকার।

—কি কথা? বার্জ কিছুটা উদগ্রীব।

—মেরী জানেই না যে, ওর বাবা-মা বেঁচে নেই।

—সে এক দিক দিয়ে ভালোই।

—ও আমাদেরই বাবা-মা বলে ডাকে।

—তাই ডাকুক।

—কিন্তু বড় হলে?

—তখন জানানো দরকার হবে ঠিকই, কিন্তু আগে ভাগে মেয়েটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি।

—আমি আপনার কথা মতই চলবো, এই ভাবে ডিনসমেড মাঝে মধ্যে বার্জের কাছে এসে দেখা করে যেত। অর্থাৎ বোঝাতে চাইতো। মেরীই রবার্টের সম্পত্তির অধিকারিণী। অথচ মুখে সে কিছু বলতো না যে, রবার্ট মেয়েটার জন্য কি করে গেল? উল্টে মুখে বলতো, এখন থেকে আমার দু'মেয়ে এক ছেলে।

এ কথা শুনে বার্জ খুশী হতো। বলতো ভগবান তোমার মঙ্গল বিধাণ করুণ।

তারপর ডিনসমেড ভক্তিভরে যীশুর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার ছ' চোখ দিয়ে জলে ভরিয়ে তুললো, যা দেখে বার্জ পুলকিত হয়ে উঠলো। বললো, তোমার মধ্যে ভক্তি ভাব বড়ই আনন্দ বোধ করলাম।

একথার কিন্তু জবাব ডিনসমেড দিলে না। তারপর অস্পষ্ট ভাবে বললো আমি যাই। ভাবটা এমন ঈশ্বর ভক্তিতে সে যেন গদগদ।

'যাই' বলতে নেই এসো।

—আমার অন্যায় হয়ে গেছে, ডিনসমেড যেন বিনয়ের অবতার।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে।

—ওদিকে শার্লট বড় হতে থাকলেও ডিনসমেডের ঘুম যেতে থাকে, ভাবে, শার্লট যদি সব জানতে পারে, তাহলে সে এক কানা কড়িও পাবে না। আরো যখন জানবে, এরা তার মা-বাবা কেউ নয় তখন? তার শরীর দিক দিকে কোন চিন্তা নেই। শত হলেও নিজের মেয়ে, এতটা প্রতারণা হয়তো করবে না। সুতরাং শার্লটকে সরিয়ে দেওয়া সব চেয়ে উপযুক্ত কাজ হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ডিনসমেডের একটা সুযোগ পেয়ে গেল। একদিন শার্লটের জুতোর পেরেক বেরিয়ে তার পাকে একবারে ক্ষত বিক্ষত করে তুললো। তা দেখে তার মাথায় চিন্তা এলো, আরসেনিক চুপি সারে পেরেকে দিয়ে রাখতে পারলে ঐ বিষ আস্তে আস্তে শরীরে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। আর আরসেনিক পেতেও তার কোন অসুবিধে হবে না। বার্টের এক বন্ধু ল্যাবোরেটরিতে কাজ করে। প্রথমটা সে দিতে অস্বীকার করায় সে তাকে ভয় দেখায়, বলে, তুমি আগের বার আরসেনিক দিয়েছো। তা

দিয়ে অনেক কু-কাজ হয়েছে এখন না দিলে তোমায় ফাঁসিয়ে দেবো, তখন সে ভয় পেয়ে আরসেনিক দিতে বাধ্য হয়।

প্রতিটি পেরেকে বেশ ভালো করেই আরসেনিক দিচ্ছিল, আর আর দিনকে শাল'টও বেশ নিস্তেজ হয়ে আসছিল, তারপরেই তা টমের চোখে ধরা পড়ে যায় এবং পোয়ারো তাকে নরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলো।

ডিনসমেড তার কাহিনী শেষ করে আবার এক গ্লাস জল চায় তার সারা শরীরে অসহ্য ব্যাথা। যেন আর সহ্য করতে পারছে না তবু ডিনসমেড ক্লান্ত চোখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বলে টম খুঁদে শয়তানটা যে আপনার চর তা আমি আদৌ বুঝতে পারিনি। শেষে আপনি আমার সঙ্গে শত্রুতা করলেন।

ডিনসমেডকে আরো ক্লান্ত দেখাতে থাকে। সে নির্জীব চোখ দুটো তুলে বলে, শাল'ট নিষ্পাপ। দয়া করে ওকে বাঁচান। তবে ওর আয়ু বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে। তবু একবার চেষ্টা করুণ। আমি পাপী-মহা পাপী। এবং……।

ডিনসমেড বাকি কথাটা শেষ করতে পারে না। তার আগেই টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়ে।

পোয়ারো ডিনসমেডের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তরুণ পুলিশ অফিসার টমসনের দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ টমসন, মিঃ ডিনসমেড বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর টেপটা বন্ধ করে দিন।

—ইয়েস স্যার, তারপর টমসন টেপটা বন্ধ করে পোয়ারোর হাতটা জড়িয়ে ধরে, এ অসাধ্য সাধন আপনি ছাড়া কেউই পারতো না। সত্যি, আপনি জিনিয়াস।

পোয়ারো টমসনের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, মিঃ টমসন, এবার আপনাকে একটা অনুরোধ করবো।

—অনুরোধ কেন স্যার, আদেশ বলুন।

—দেখুন, মিঃ ডিনসমেড পাপ করেছেন এবং তার শাস্তি কি হবে তা কতকটা স্পষ্ট। কিন্তু শার্লট তো কোন দোষ করেনি। আর সে বেশ কিছু টাকা-পয়সার অধিকারিনী হচ্ছে।

একটু থেমে পোয়ারে আবার বলে, তাই আপনার কাছে অনুরোধ শার্লটকে আপনি গ্রহণ করুণ। ও ডাক্তার তত্ত্বাবধানে বেশ ভালোই আছে। আর সংসারটাকে বাঁচান।

—মিঃ পোয়ারো, আমি আপনার কথা রাখতে চেষ্টা করবো

—থ্যাঙ্ক ইউ। পোয়ারো টমসমকে উষ্ণ অভিনন্দন জানায়।

তারপর পোয়ারো পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলো টেপের সুইজটা অফ করেছে কি না। ঠিক আছে দেখে এরপর চার্লসের দিকে তাকিয়ে বললো, চলো চার্লস, এবার যাওয়া যাক্।

—হ্যাঁ, তারপর চার্লস রাস্তায় এসে বলে। আমার প্রেমিকাকে তুমি টমসনের হাতে তুলে দিলে।

—মেরী ও তো ফেলনা নয়। পোয়ারো হেসে গাড়ি স্টার্ট দেয়।

—বন্ধু, তার চেয়ে আই বুড়ো থাকাই ভালো চার্লস মিটিমিটি হাসলো।

—হুটস লাইফ এ গুড বয়। পোয়ারো হাসতে থাকে।

সমাপ্ত